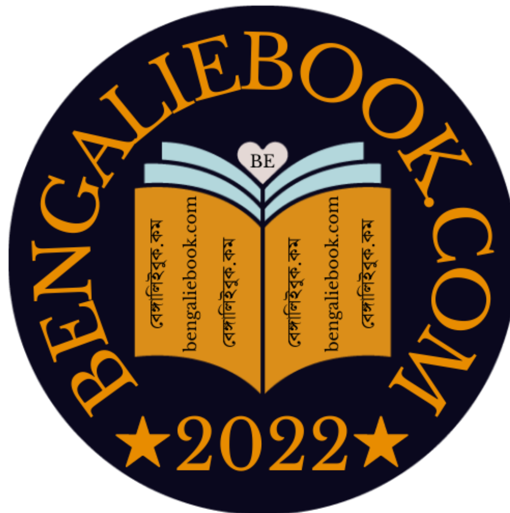
পৃথিবীর সেরা ভৌতিক গল্প

অনীশ দাস অপু



সূচিপত্র

অনুসরণ

আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু পাগল হয়ে যাচ্ছে এমন ভাবনায়ই কেমন গা ছমছমে। আমার প্রিয় বান্ধবী লারার অবস্থা দেখে তেমনটিই মনে হলো। ও আমার কাছে ওর সমস্ত গোপন কথা শেয়ার করে। যেসব কথা অন্য কেউ জানে না। এমন গোপন কথা যা বুকের রক্ত হিম করে দেয়! তারপর আমি জানতে পারলাম কণ্ঠগুলোর কথা। এখন আমার সত্যি দুশ্চিন্তা হচ্ছে....

লারা দীর্ঘদিন কথাটি আমার কাছে গোপন রেখেছিল। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম ওর কিছু একটা হয়েছে। অনেক দিন ধরেই দেখছি সব সময়। অন্ধকার করে রাখে মুখ। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পরিষ্কার। প্রশ্ন করলে কিছু হয়নি বলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু ও যে বড় ধরনের কোনো সমস্যায় পড়েছে। তা আচার-আচরণ দেখে বোঝা যায়। লারাকে শেষ কবে হাসতে দেখেছি মনে পড়ে না আমার। সেদিন ইংরেজির ক্লাসে ওকে চেহারা আরও ম্লান করে ঢুকতে দেখলাম। আমার পাশের ডেস্কে বসল। তারপর ভীষণ করুণ মুখ করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। আমাকে গ্রাহ্যই করল না।

খুব রাগ হলো আমার। নোট খাতা থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে লিখলাম, কী রে চেহারাটা অমন করে রেখেছিস কেন? মনে হচ্ছে তোর কেউ মরেছে।

কাগজটা লারার ডেস্কে রেখে কনুই দিয়ে মৃদু পুঁতো দিলাম। লাফিয়ে উঠল। ইঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা দেখালাম। লেখাটা পড়ল ও। বুকটা ধক করে উঠল আমার।

ঠিক ওই সময় আমাদের ইংরেজির টিচার মি. ডাডলি ডাক দিলেন আমাকে। এডগার অ্যালান পোর দ্য র‍্যাভেন আবৃত্তি করে শোনাতে বলছেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। শুরু করলাম আবৃত্তি। পোর এই কবিতাটি বেশ প্রিয় আমার। কিন্তু আজ কেন জানি গাটা শিউরে উঠল কবিতা পড়ার সময়।

প্রথম স্তবক পড়ার পর স্যার আরেকজনকে দ্বিতীয় স্তবক পড়তে বললেন। আমি বসে পড়লাম ডেস্কে। তাকালাম লারার দিকে। আমাকে একটা কাগজ এগিয়ে দিল ও স্যারের চোখ বাঁচিয়ে।

ভাঁজ খুলে মেলে ধরলাম কাগজটি। একটি মাত্র বাক্য লেখা : ভয়ানক একটি দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে।

সরাসরি চাইলাম লারার দিকে। ওর মায়াবী চোখে ফুটে আছে ভয়। আবার চিরকুটের দিকে নজর ফেরালাম। আবার লেখাটা পড়লাম। কোনো প্রশ্ন বা অনুমান নয়, লারা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে। বুঝতে পারলাম না এ লেখার মানে কী।

আরেকটা কাগজ ছিঁড়ে লিখলাম, তোমার মাথা ঠিক আছে তো? কাগজটা মুড়ে চালান করে দিলাম লারার ডেস্কে।

লেখাটা পড়ে ঠোঁট কামড়াল লারা। সাথে সাথে আরেকটা কাগজে দ্রুত কী যেন লিখে ফেলল। তারপর ওটা ঠেলে দিল আমার ডেস্কে। আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

কাঁপা হাতে কাগজটা খুললাম আমি। দেখতেই পাবে লেখা চিরকুটে।

সেদিন লারার সাথে স্কুলে আর কথা হলো না। ওকে খুঁজে পেলাম না কোথাও। আরেক বন্ধুর সাথে ফিরে এলাম বাড়ি। রাতে একবার ভাবলাম ফোন করি লারাকে। কিন্তু ও আমাকে বারবার এড়িয়ে চলছে মনে পড়তেই রাগ হলো। চলে গেল ফোন করার ইচ্ছে।

পরদিন সকালে দেখা হয়ে গেল লারার সাথে ইংরেজি ক্লাসে ঢোকার সময়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। শূন্য দৃষ্টি চোখে। একটু পরে ইংরেজির টিচার এলেন। তবে ডাডলি স্যার নন, অন্য আরেকজন।

আমার পেছনে বসেছে লারা। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ডাডলি স্যার আর তার স্ত্রী কাল রাতে কার অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। দুজনেই মারাত্মক আহত। শুনেছি স্যার অনেক দিন ক্লাস নিতে পারবেন না।

ডাডলি স্যারের জন্য খুব কষ্ট হলো আমার। মাত্র গত বছর বিয়ে করেছেন ভদ্রলোক। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হিম একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম লারার দিকে। ওর চোখ ঝকঝক করে জ্বলছে দামি পাথরের মতো। বাঁকা হাসি ঠোঁটে। দেখলে তো আমি মিথ্যা বলিনি, ফিসফিস করল লারা।

ওর ঝকঝকে চোখের চাউনি সহ্য হলো না আমার, নামিয়ে নিলাম চোখ । ভাবতে কষ্ট হলো এই আমার বাল্যবন্ধু লারা। যার সাথে কেজি থেকে পড়ছি স্কুলে। স্যারের জন্য ওর একটুও কষ্ট হচ্ছে না? সেই কথাটা মনে পড়ে গেল আবার। কাল রাতেই না লারা চিরকুটে অ্যাক্সিডেন্টের কথা লিখেছিল? হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি।

সারাটা ক্লাসে একবারও লারার দিকে চাইতে পারলাম না চোখ তুলে। ঘণ্টা পড়তেই ওর আগে বেরিয়ে পড়লাম ক্লাস থেকে। আমার মনে তখন। একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে যে করেই হোক লারা অ্যাক্সিডেন্টের কথা। আগেভাগে জেনে ফেলেছিল। সেদিন আর অন্য ক্লাসও করতে ইচ্ছে করল না। এতটাই অস্বস্তিবোধ করছিলাম আমি। লারাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারলাম না। বাসে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, দৌড়াতে দৌড়াতে এল ও। ওকে দেখে কেটে পড়ার তাল করছিলাম, হাত তুলে থামিয়ে দিল।

দাঁড়াও, চেঁচাল লারা। কথা আছে তোমার সাথে।

দাঁড়িয়ে থাকলাম। হাঁপাচ্ছে তারা। ঘাম ফুটেছে মুখে। তোমাকে ক্লাসে খুঁজে না পেয়ে ভাবলাম বাস স্টপেজে যাই, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লারা। বাসায় যাচ্ছ?

হ্যাঁ, ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলাম আমি।

আজ রাতে কোথাও বেরুচ্ছ না তো? জানতে চাইল লারা।

কোথাও বেরুচ্ছি না। কেন?

না বেরুনোই ভালো। আমাকে লাইন থেকে বের করে বলল, আজ রাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটবে।

অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কথা বলার সময় কেঁপে গেল গলা। কে লাগাবে আগুন–তুমি?

লারার মুখটা হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল, যেন ভেতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

ওরা আমাকে শুধু বলেছে আগুন লাগবে, হিসিয়ে উঠল ও। কে লাগাবে জানি না। চট করে রাগ উঠে গেল মাথায়। ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। কী বলছ, লারা? ওর ঠাণ্ডা ঝকঝকে চোখে চোখ রাখলাম আমি। এসব ভয়ঙ্কর কথা কে বলে তোমাকে?

লারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে, আঁকি মেরে মুক্ত করল নিজেকে। তারপর দৌড় দিল রাস্তার দিকে। ফিরেও চাইল না। বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ ভাবলাম কী করা উচিত আমার। বাবা-মাকে বলে দেব নাকি স্কুলের প্রিন্সিপাল। স্যারকে জানাব? কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস না করে আমার কথা?

সে রাতে এগারোটা পর্যন্ত থাকলাম টেবিলে। আমার ভাই সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাইনি। সোশাল স্টাডিজের ওপর একটা নোট লিখলাম। নিচ তলায়, ড্রইং রুম থেকে টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেলাম। ব্যাপার কী জানার জন্য এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। টিভিতে খবর হচ্ছে। যা দেখলাম তাতে হিম হয়ে গেল বুক।

ভাই যে সিনেমা হলে মুভি দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে সেই প্রেক্ষাগৃহেই আগুন ধরে গেছে। টিভির এগারোটার খবরে সেই ঘটনাই বিস্তৃত দেখাচ্ছে।

খবর দেখে অসুস্থ, বমি বমি ভাবটা আবার ফিরে এল। আরেকবার ঘটনাটা ঘটেছে। যে করেই হোক লারা আগে জানতে পেরেছে অগ্নিকাণ্ডের কথা। ও বলেছিল আজ রাতে কোথাও আগুন লাগবে।

তক্ষুনি ফোন করলাম লারার বাড়িতে। ওর মা বললেন হঠাৎ করে লারার জ্বর এসেছে। জ্বরে কী সব আবোল তাবোল বকছে। আমি লারার মাকে দুএকটা সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে রেখে দিলাম ফোন।

পরদিন স্কুলে এল না লারা। স্কুলের সবাই উত্তেজিত হয়ে সিনেমা হল এর অগ্নিকাণ্ডের কথা বলছিল। আমাদের স্কুলের একটি ছেলে জনতার হুড়োহুড়িতে আহত হয়েছে। তবে সিনেমা হল-এর খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হল কর্মচারীরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে নিভিয়ে ফেলেছে আগুন। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা সম্ভব হয়নি।

ক্লাসটা আমার কাটল অদ্ভুত ঘঘারের মাঝে। খুব ইচ্ছে করছিল লারার গোপন কথাটা বলে দিই কাউকে। কিন্তু আদৌ কি কেউ বিশ্বাস করবে এ কথা? শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম মাকে জানাব।

বাসায় ঢুকতে না ঢুকতেই উদ্বিগ্ন মুখে মা বলল, লারার মা ফোন করেছিলেন। লারার অবস্থা খুবই খারাপ। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লারা নাকি বারবার তোর কথা বলছিল।

কথাটা শুনে ছ্যাৎ করে উঠল বুক। লারার জন্য যা খুশি করতে পারতাম আমি। কিন্তু এখন ভয় করছে ওর কথা শুনে।

লারাদের সাথে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে। তাই মা-ই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। রাস্তায় কোনো কথা বললাম না দুজনে। সারাক্ষণ ভাবছিলাম লারা কি ওর গোপন কথাগুলো বলার জন্যই আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছে? এরপর কী করব আমি?

লারার কেবিনে ঢুকলাম। টের পেলাম বুকের ভেতর দমাদম পিটছে হৃৎপিন্ড। লারার চেহারা থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ। তবে চোখ জোড়া জ্বলছে। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলাম মণির ভেতরে লাল টকটকে দুটি বিন্দু রুবির মতো জ্বলজ্বল করছে।

আমাকে দেখে ফ্যাকাসে হাসল লারা। আমার মা ওর দিকে এগিয়ে গেল। কেমন আছ, মা, বলতে বলতে। লারা দুর্বল গলায় বলল, ডেভের সাথে একটু কথা বলব, আন্টি। আপনার যদি...।

লারার মা মেয়ের শিয়রে বসেছিলেন। কাঁদছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, চলুন, মিসেস উইনস্টন। আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। লারাটা তখন থেকে ডেভ, ডেভ করছে।

মা কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। আমি লারার মাথার কাছে বসলাম। লারা আমার মাথাটা ধরল দুহাত দিয়ে, টেনে নিল ওর মুখের ওপর।

ওরা বলেছে আমি আর বাঁচব না, ফিসফিস করল লারা।

ডাক্তাররা বলেছেন? ভীরু গলায় জানতে চাইলাম আমি, ওর চোখের দিকে চাইতে ভয় লাগছে।

না, কণ্ঠগুলো, বলল লারা। কণ্ঠগুলো বলেছে আমি মারা যাব... খুব শীঘ্রি।

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে আমার, ইচ্ছে করল এক ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু লারা আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওকে এভাবে রেখে যাই কী করে? ওকে আমার সাহায্য করা দরকার।

কোনো কণ্ঠ তুমি শুনতে পাওনি, লারা, ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। আর চিন্তা করিও না। শীঘ্রি ভালো হয়ে উঠবে তুমি।

সিধে হয়ে বসলাম আমি। লারার ম্লান চেহারায় যন্ত্রণাকাতর হাসির সাথে ফুটে আছে ভয়ার্ত একটা ভাব।

আমি পাগল নই, ফিসফিস করল লারা। ওরা সারাক্ষণ আমার সাথে কথা বলে। কণ্ঠগুলো কথা বলে।

হঠাৎ আমার ঘাড় চেপে ধরল লারা, ওর মাথার কাছে নিয়ে এল মাথা। হিসিয়ে উঠল, শোন!

চিৎকার করে উঠলাম আমি। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। ওর দিকে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, দেখি তৃপ্তির হাসি হেসে চোখ বুজল লারা। কণ্ঠগুলো আমাকে বলেছে আমি এখানে যেন বসে থাকি, বিদায় জানাই লারাকে। কারণ ওর সাথে আমার আর দেখা হবে না। আমার ইচ্ছে করল দৌড়ে পালাই। তাহলে সব কিছুর হাত থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু কেউ যেন মেঝের সাথে আমার পা পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে। নড়তে পারলাম না এক চুল।

.

ভুল ভেবেছি আমি। ওই কণ্ঠগুলো আমার সাথেই আছে। গত দুই মাস ধরে কথা বলছে আমার সঙ্গে। ভয় পাচ্ছি আমি। কারণ ওরা যা বলছে বাস্তবে ঠিক তেমনটি ঘটে চলেছে। ইদানিং ওরা একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছে। বোঝাতে চেষ্টা করছে অ্যাক্সিডেন্টের শিকার কে হবে। কিন্তু আমি বুঝে গেছি কে হবে ওদের পরবর্তী শিকার।

-জে.বি. স্টাম্পার

আতশবাজির রাত

পান্ডা সেভেন, তুমি কি একবার ওক কটেজে যেতে পারবে? ওখানকার একজন বাসিন্দা নালিশ করছেন তাকে কিছু বাচ্চাকাচ্চা নাকি খুব জ্বালাতন করছে।

রজার।

কনেস্টবল ওয়ারলেস তার রেডিওটি পুলিশ কারের প্যাসেঞ্জার সিটে ফেলে দিল। চালু করল ইঞ্জিন। সে এতক্ষণ বড় রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে কিছু জরুরি কাগজপত্রে চোখ বুলাচ্ছিল। ভোরবেলার শিফটে খুব একটা কোলাহল থাকে না, অন্তত এখন পর্যন্ত তেমন কিছু চোখে পড়েনি, তাই সে গন্তব্যহীনভাবে এদিক সেদিক গাড়ি চালিয়ে বিরক্তই হচ্ছিল। আর এখন, যে মুহূর্তে সে গাড়ি থামিয়ে, কাগজপত্র বের করে কলমটা হাতে নিয়েছে, বেজে উঠল রেডিও।

ওক কটেজ হাফএকর লেনে। জায়গাটা ভালোই চেনা আছে ওয়ালেসের। ওদিকে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার আগে কৃষিকাজ হতো। বেশ কিছু কুটির তৈরি করা হয়েছিল। তবে সে সব কটেজের বেশিরভাগ ভেঙে কৃষিজমিতে আধুনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। দুএকটি যে ভগ্নদশা নিয়ে এখনও টিকে রয়েছে তারই একটি ওক কটেজ। ওক মিডো নামে মস্ত একটা মাঠের পাশেই জরাজীর্ণ কুটিরখানা।

গাড়ি চালাতে চালাতে ওয়ালেসের চোখে পড়ল পোলাপান লাকড়ি জোগাড় করছে। এক মিডোতে জ্বালানি কাঠের অভাব নেই। আর পাঁচ নভেম্বর এক সপ্তাহ পরেই। বাচ্চাদেরকে দেখা গেল সব জায়গায়। কেউ লাকড়ি আনছে, কেউ বা পুরানো কার্ড বোর্ডের বাক্স সংগ্রহে ব্যস্ত। এসব জিনিসপত্রের বিশাল স্তূপ গড়ে তুলছে তারা মাঠের মাঝখানে।

হাফএকর লেনে মোড় নিল ওয়ালেস। পাশ কাটাল আধুনিক স্থাপত্যের কয়েকটি বাড়িঘর। সবুজ রঙের বিরাট ঝোঁপের ধারে থামাল গাড়ি। এ ঝোঁপটি বিরাট ঝোঁপের ধারে থামাল গাড়ি। এ ঝোঁপটি ওক কটেজকে পথচারীদের নজর থেকে আড়াল করে রেখেছে। সে কাঠের পুরানো একটি গেট খুলল কাঁচকোচ শব্দে এবং নিজেকে আবিষ্কার করল অন্য এক ভুবনে।

সামনের বাগানের ঘাস কোমর ছুঁয়েছে, তাতে আগাছা ভর্তি। ঝোঁপঝাড়গুলো বাড়িটিকে বাইরের পৃথিবী থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, এমনকী গাড়ি ঘোড়ার শব্দও শোনা যায় দূরাগত এবং ক্ষীণ।

শান্তিময় এলাকা, মনে মনে বলল পুলিশম্যান, ভাঙা পাথর বেছানো পথ ধরে কদম বাড়াল। দরজার কড়া নাড়াল। বহুদিন রঙ করা হয়নি দরজায়।

এক মুহূর্ত চুপচাপ, তারপর খসখস আওয়াজ। কেউ হেঁটে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। এ সেকেন্ড পরে ফটকের সেই ক্যাচক্যাচ শব্দ তুলে অল্প ফাঁক হলো কপাট।

ডাইনি। প্রথম দর্শনে তাই মনে হলো কনেস্টবলের। তার সামনে দাঁড়ানো বৃদ্ধা খুব একটা লম্বা নন, জরাগ্রস্ত চেহারার, তবে যেভাবে ঝুঁকে আছেন এবং অসংখ্য বলিরেখায় কুঞ্চিত মুখ দেখে ছেলেবেলার ছবির বইয়ের ডাইনির সঙ্গে একদম মিলে গেল। এবং রূপকথার ডাইনির মতো এরও পরনে কালো পোশাক।

ওহ, আসুন, অফিসার। বৃদ্ধা পেছনে সরে নিয়ে পুরোপুরি মেলে ধরলেন দরজা। গলার স্বরও, যেমনটি আশা করেছিল ওয়ালেস, খনখনে এবং কর্কশ।

ধন্যবাদ, বাড়িতে ঢুকল ওয়ালেস।

আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে আসবেন ভাবিনি, ওকে নিয়ে বাসিগন্ধযুক্ত হলওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন তিনি। বাড়ির পেছন দিকের একটি কামরায় প্রবেশ করলেন। ওদেরকে আপনি ধরতে পারবেন।

ওদেরকে ধরতে পারব?

পোলাপানগুলো, জবাব দিলেন বৃদ্ধা। আমি তো ফোনে বলেছি। স্থানীয় বাচ্চাকাচ্চারা যখন তখন এসে আমার পেছনের বাগানে হামলা করে, বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওরা ওখানে খেলা করুক তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওরা বোনফায়ারের জন্য কাঠকুটো সংগ্রহ করতে লেগেছে।

গাছপালা কেটে ফেলছে? জিজ্ঞেস করল ওয়ালেস। মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা।

আমার পুরানো গোলাঘরের সমস্ত লাকড়ি ওরা নিয়ে যাচ্ছে। জবাব দিলেন তিনি। ওই যে দেখুন। তিনি কাঠের তৈরি বিরাট একটি কাঠামোর দিকে ইঙ্গিত করলেন আঙুল তুলে। এ ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গোলাঘরের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে গাছপালা আর লম্বা ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে।

কান খাড়া করলেই ওদের কথা শুনতে পাবেন। আগুন জ্বালাবার জন্য ওরা ওখানে ঢুকে লাকড়ি নিয়ে যাচ্ছে। তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। যা লাকড়ি লাগে নিয়ে যাক না কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন গোলাবাড়িটি বিপজ্জনক বলে। ওটা বেশ কয়েক বছর ধরেই ভেঙে পড়ছে। পুরো ঘরটা যদি ওদের মাথার ওপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে তাহলে আমি নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না।

আপনি চাইছেন ওদেরকে যেন আমি কষে একটা ধমক দিই? বলল ওয়ালেস।

যদি পারেন তো খুব ভালো হয়, প্রত্যুত্তর এল।

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে?

বৃদ্ধা কিচেনে ঢুকে খিড়কির দোর খুললেন। ওয়ালেস ঝোঁপঝাড়ে ভরা বাগানে উঁকি দিল।

দেখবেন! ঝাড়তে উল্টে যেন পড়ে না যান!

ওয়ালেস দরজা থেকে অর্ধেকটা শরীর বের করেছে, এমন সময় প্রতিবন্ধকতাটি চোখে পড়ল। মুখ টিপে হাসল সে। বৃদ্ধাকে প্রথম দর্শনের অনুভূতির সঙ্গে ঝাড়ুর সংযোগটি বেশ খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। ঝাড়ুর হাতলটি লম্বা কাঠের, শলাগুলো রশি দিয়ে বাঁধা।

ধন্যবাদ, সে ঝাড় ডিঙিয়ে ঝোঁপঝাড়ের জগতে পা বাড়াল। রেডিওর ভলুম কমিয়ে দিল একদম। গোলাঘরের দিকে এগোতে বাচ্চাদের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। হো হো হিহি হাসির শব্দ। হঠাৎ কান ফাটানো শব্দে লাকড়ির বড় একটা স্তূপ দুড়ুম করে পড়ল মাটিতে।

এটা দিয়ে দারুণ আগুন জ্বালানো যাবে। আমরা এটাকে...

ওয়ালেস গোলাবাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ওরা পাঁচজন। তার দিকে পেছন ফিরে আছে। কারোরই বয়স দশ এগারোর বেশি হবে না। ওদের সমস্ত মনোযোগ ষষ্ঠ ছেলেটির দিকে, সে লাকড়ির একটি স্তূপ বাঁধছে রশি দিয়ে।

হচ্ছেটা কী এখানে? হাউ করে উঠল ওয়ালেস।

চরকির মতো ঘুরল বাচ্চাগুলো এবং উর্দিধারী ওয়ালেসকে দেখে জায়গায় জমে গেল। সব কটার চেহারায় অপরাধীর ছাপ। কাঠ বিছানো মেঝেতে পা ফেলে ওদের দিকে এগিয়ে গেল ওয়ালেস। তাকাল ছাদের দিকে। নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক অবস্থা। বড় বড় বিমগুলো ঝুলছে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

তো? কঠোর গলায় বলল ওয়ালেস। এখানে কী করছ তোমরা?

আমরা কাঠকুটো জোগাড় করছিলাম, মিস্টার, বলল একটা বাচ্চা।

তোমরা অনুপ্রবেশ করেছ, বলল ওয়ালেস। আশা করল অনুপ্রবেশ কথার অর্থ বাচ্চাগুলো বুঝতে পারবে। অবশ্য অনুপ্রবেশ নিয়ে বাচ্চাদের কখনো মাথা ব্যথা থাকে না, গোলাবাড়িটি খুবই বিপজ্জনক দশায় রয়েছে তা বুঝিয়ে বললেও এরা তা গ্রাহ্য

করবে কিনা সন্দেহ। সে কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। হয়তো ওর অগ্নিদৃষ্টি দেখে ওরা ভয় পাবে।

হঠাৎ করেই বুদ্ধিটি মাথায় এল ওয়ালেসের। যদিও সন্দেহ জাগল মনে এতে কাজ হবে কিনা ভেবে। তার কথা ওরা বিশ্বাস নাও করতে পারে। কারণ আজকালকার বাচ্চারা কম বয়সেই পেকে যাচ্ছে।

তোমাদের জায়গায় আমি হলে এ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতাম না, গম্ভীর গলায় বলল সে।

ওরা কথা শুনে আগ্রহের ছাপ পড়ল বাচ্চাগুলোর চোখে মুখে।

কেন ঘেঁষতেন না? একটু আগে যে ছেলেটি কথা বলেছিল সে জিজ্ঞেস করল।

ওই বৃদ্ধা মহিলা, বাড়ির দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল ওয়ালেস। উনি কে তোমরা নিশ্চয় জানো, জানো না?

উনি কে? সমস্বরে উচ্চারিত হলো প্রশ্নটি।

উনি একজন ডাইনি, সবার দিকে কটমটিয়ে তাকাল ওয়ালেস দেখতে কারও চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে ওঠে কিনা। নাহ, সেরকম কোনো লক্ষণ তো লক্ষ করা যাচ্ছে না। বেশ, বেশ। তিনি পছন্দ করেন না তাঁর বাগানে কেউ আসুক। তাই তোমাদেরকে আমি সাবধান করে দিতে এসেছি। তিনি বলেছেন, আবার যদি তিনি তোমাদেরকে এদিকে আসতে দেখেন... থেমে গিয়ে মাথা নাড়ল সে। ঈশ্বর জানেন কী ঘটবে?

ডাইনি বলে কিছু নেই, যে ছেলেটি লাকড়ির বোঝা রশি দিয়ে বাঁধছিল সে চ্যালেঞ্জের সুরে বলল।

বিশ্বাসীদের দলে কেউ না কেউ অবিশ্বাসী থাকেই, ভাবল ওয়ালেস। ভাবছে কী জবাব দেয়া যায়। তবে তার সমস্যার সমাধান করে দিল বিশ্বাসীদের একজন।

অবশ্যই ডাইনি আছে, বলল একটি ছেলে। আমার ভাই ডাইনিদের নিয়ে লেখা বই পড়েছে এবং গত রোববার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে এই ইংল্যান্ডেই ডাইনি আছে।

তাই নাকি? চ্যালেঞ্জারের গলার স্বরে সন্দেহ।

তোমার বন্ধু ঠিকই বলেছে, বলল ওয়ালেস। কাজেই তোমাদের এখানে আবার আসা উচিত হবে না।

আপনি ওকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না? জানতে চাইল চ্যালেঞ্জার। ডাইনি হিসেবে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিলেন?

ওঁকে গ্রেপ্তার করতে যাব আমি? বলল ওয়ালেস। তাহলে তিনি হয়তো আমার গাড়িটাকে ব্যাঙ বা অন্য কিছু বানিয়ে দেবেন।

সবাই চুপ হয়ে গেল। তাহলে যাও সবাই, বলল ওয়ালেস। কেটে পড়ো এখন।

গোলাঘর থেকে সারি বেঁধে বেরিয়ে গেল ছেলের দল।

তোমাদেরকে বলেছিলাম, একজনকে বলতে শুনল ওয়ালেস। ওই ঝাড়টা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল মহিলা ডাইনি। কিন্তু তখন তোমরা আমরা কথা বিশ্বাস করনি। এখন?

আপন মনে হাসল পুলিশম্যান, পা বাড়াল বৃদ্ধার বাড়ির দিকে। চলে গেছে ওরা? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

হ্যাঁ, জবাব দিল ওয়ালেস। মনে হয় না আর আপনাকে জ্বালাতন করবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, বললেন বৃদ্ধা। এক কাপ চা দিই? সঙ্গে এক পিস কেক?

চা খেতে কোনো আপত্তি নেই আমার।

.

চা আর কেক খেয়ে আধঘন্টা পরে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওয়ালেস। বৃদ্ধাকে কথা দিল ফোন করে খোঁজখবর নেবে জানতে ছেলেপিলেরা তাঁকে আবার বিরক্ত করছে কিনা। ভাবল ওদেরকে কী বলে ভাগিয়ে দিয়েছে যদি জানতেন বৃদ্ধা তাহলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হতো!

সে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করল রেডিওতে।

ওক কটেজ থেকে বাচ্চাগুলোকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, বাড়ির বাসিন্দার সঙ্গে কথা হয়েছে।

.

নভেম্বরের পাঁচ তারিখ বিকেলের শিফটে ডিউটি পড়ল ওয়ালেসের। বেলা তিনটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। বিশেষ এই দিনটিতে এরকম শিফটে কাজ করতে মোটেই পছন্দ করে না সে। আজকের দিনটাতে সবাই বোন ফায়ার নিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠবে, যথেচ্ছভাবে আতশবাজি জ্বালাবে... গত বছর এক পাগলা দুধের বোতলে পেট্রল ভরে

বোনফায়ার করতে গিয়ে কেলেংকারির একশেষ করেছিল। ট্রেল ভর্তি বোতল বিস্ফোরিত হয়ে সেবার চারজন লোক আহত হয়।

রাতে নটা নাগাদ টহল দিতে দিতে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওয়ালেস। সে চারটে বোনায়ারের আগুন নেভাতে গিয়েছিল। দমকল বাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে আগুন নেভায়। ওয়ালেসের ইউনিফর্ম থেকে এখন বিশ্রী ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। আগুন জ্বালানো হয়েছিল বাড়িঘরের খুব কাছে। একটি বাড়িতে আগুন ধরলে আর দেখতে হতো না। পাশাপাশি সবগুলো বাড়িকে ছোবল দিত সর্বনাশা আগুনের জিভ। তাকে লোকজন নালিশ করেছে পোলাপান নাকি আতশবাজি জ্বালিয়ে তাদের লেটারবক্সে ছুঁড়ে মেরেছে।

বড় রাস্তার পাশে গাড়িটি দাঁড় করিয়ে একটি সিগারেট ধরাল ওয়ালেস। এমন সময় কড়মড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও।

পান্ডা সেভেন?

বলো, ক্লান্ত গলায় সাড়া দিল ওয়ালেস।

একবার ওক কটেজে যেতে পারবে? একজন ফোন করে বলল ওখানে নাকি কী একটা গোলমাল হয়েছে।

রজার।

দ্রুত ওক কটেজের উদ্দেশে গাড়ি ছোটাল ওয়ালেস। ভাবছে বৃদ্ধা মহিলা ঠিক আছেন কিনা। ছেলের দলকে সেদিন বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেয়ার পরে সে বার কয়েক ও বাড়িতে গেছে। প্রতিবারই চা এবং কেক সহযোগে আপ্যায়িত হয়েছে ওয়ালেস। বৃদ্ধা জানিয়েছেন দুষ্টু ছেলের দল সেদিনের পরে তাঁকে আর বিরক্ত করেনি।

ওক কটেজের বাইরে গাড়ি থামাল ওয়ালেস। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল উৎকর্ণ হয়ে। নাহ্, অস্বাভাবিক কিছু শোনা গেল না। শুধু ওক মিডো বা বড় ওই মাঠটি থেকে বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে। তারা বোনায়ার আনজাম করছে।

কটেজের পথ ধরে হেঁটে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল ওয়ালেস। হয়তো বৃদ্ধা এমন কিছু শুনেছেন যেজন্য পুলিশে ফোন করেছিলেন। ওয়ালেসকে দেখলে খুশিই হবেন তিনি। আর এ মুহূর্তে এক কাপ চা খেতে পেলে মন্দ হয় না।

কিন্তু দরজায় কড়া নাড়ার পরেও কোনো সাড়া মিলল না। ওয়ালেস বাড়ির পেছন দিকটাতে চলে এল। খিড়কির দুয়ার খোলা এবং পেছনের ঘরে আলো জ্বলছে।

জানালার আলোয় সে দেখতে পেল পেছনের বাগানের ঘাসগুলো সব দোমড়ানো মোচড়ানো। টর্চ জ্বেলে নিয়ে ট্রেইল ধরে এগোল ওয়ালেস। দেখে মনে হচ্ছে একদল

বুনো জন্তু দাপিয়ে বেড়িয়েছে ঝোঁপের জঙ্গলে, সব লন্ডভন্ড করে ছেড়েছে। মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে আছে বেশ কিছু ঝোঁপঝাড়।

ট্রেইলের সমাপ্তি ঘটেছে একটি মস্ত ঝোঁপের ধারে। ঝোঁপ পার হতেই ওয়ালেস দেখে সে ওক মিডোতে হাজির হয়ে গেছে। দাউদাউ জ্বলছে বোনায়ার বা বহ্নুৎসব। দূর থেকে কতগুলো কালো কালো ছায়ামূর্তি দেখা গেল আগুনটাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ছোটাছুটি করছে। কালো আকাশে হুউশ করে উড়ে গেল একটা হাওয়াই রকেট, আলোর ঝর্ণাধারা ছড়িয়ে দিল।

ওয়ালেস সামনে কদম বাড়াতে গিয়ে কীসে যেন হোঁচট খেল।

টর্চের আলোয় একটি মনুষ্য মূর্তি দেখতে পেল ওয়ালেস। যেনতেনভাবে তৈরি মূর্তি। মুখটা আঁকা হয়েছে কাঠকয়লা দিয়ে।

ওরা এটাকে পোড়াবে না?

অ্যাই, মিস্টার, ওর পাশ থেকে একটা বাচ্চা কণ্ঠ তীক্ষ্ণ সুরে বলে উঠল। ওয়ালেস তাকিয়ে দেখে এ ছেলেটিকে সে গোলাঘরে দেখেছিল। দারুণ, না?

হ্যাঁ, দারুণ বানিয়েছ, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ওয়ালেস। তোমরা এই মূর্তিটাকে পোড়াবে না?

আমরা এর চেয়েও ভাল জিনিস পেয়ে গেছি। ওই দেখুন।

বিশাল অগ্নিকুণ্ডের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ওয়ালেস। দাউ দাউ অগ্নিশিখার মাঝে কোনো মতে একটা মানুষের কাঠামো বোঝা যায়। আগুনের ছোবল খেয়ে ওটা যেন নড়াচড়াও করছে।

এখন আর চিন্তার কিছু নেই, ওয়ালেসের পাশে দাঁড়ানো বাচ্চাটি ব্যগ্র কণ্ঠে বলল। আমরা এখন নিরাপদ। আমার ভাইয়ের বইতে পড়েছি কী করতে হবে– শুধু জোন অব আর্কের মতো...

জোন অব আর্ক?

ওই বিরাট কাঠের ঘোঁজে?

ওয়ালেস আগুনের কাছে এগিয়ে গেল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল অগ্নিশিখা মূর্তিটাকে নড়াচড়া করাচ্ছে কিন্তু এখন কাছে এসে দেখতে পাচ্ছে ওটা সত্যি নড়ছে, তীব্র আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে কিন্তু এ হতে পারে

— ও অসুস্থ বোধ করল, ঝিমঝিম করছে মাথা।

গভীর দম নিল ওয়ালেস ঝিমঝিমানি থেকে রক্ষা পেতে কিন্তু গা ভীষণ গুলিয়ে উঠল মাংস পোড়ার গন্ধে।

অগ্নিশিখার ক্রমাগত পটপট আওয়াজ ছাপিয়ে কানে এল বাচ্চাগুলোর গানের ছন্দে বলা কথাগুলো।

আমরা ডাইনিটাকে পুড়িয়ে মেরেছি, আমরা ডাইনিটাকে পুড়িয়ে মেরেছি...

–সেন্ট জন বার্ড

ইচ্ছাপূরণ

রাতে ঠাণ্ডা ছিল না। ভিজে আবহাওয়াও নয়। তবু লেক্সনাম ভিলার ছোট্ট বৈঠকখানার পর্দাগুলো টানা ছিল। আগুনও জ্বলছিল বেশ উজ্জ্বলভাবে। দাবা খেলতে বসেছিলেন বাবা আর ছেলে। বাবা মি. হোয়াইট দাবা খেলার ব্যাপারে নানারকম মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা প্রায়ই ভাবতেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজাটিকে এমন এক জায়গায় চাললেন যে তাঁর স্ত্রী মিসেস হোয়াইটও কথা না বলে থাকতে পারলেন না। সাদা চুলের বুড়িটি এতক্ষণ আগুনের পাশে একমনে সেলাই করে যাচ্ছিলেন।

খুব দেরি হয়ে গেলেও মি. হোয়াইট বুঝলেন তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। তিনি বলে উঠলেন, কীসের একটা শব্দ হলো না? তিনি চাইছিলেন তাঁর ভুল যেন ছেলে দেখতে না পায়।

ছেলে হার্বার্ট মনোযোগ দিয়ে ছকটি দেখতে দেখতে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি। তারপর হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, কিস্তি।

মি. হোয়াইট দাবার ছকের উপর হাতটা বাড়িয়ে রেখে বললেন, মনে হয় না তিনি আজ রাতে আসবেন।

হার্বার্ট শুধু উত্তরে বলল, কিস্তিমাত।

মি. হোয়াইট হঠাৎ যেন রেগে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, এত দূরে থাকার কোনো মানে হয়! জঘন্য পাঁকে ভরা, পোডড়া জায়গা অনেক দেখেছি বাবা, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। ফুটপাতগুলো খানায় খন্দে ভরা রাস্তায় যেন জলের স্রোত বইছে। জানি না লোকেরা কী ভাবে। মনে হয় তাদের কিছু এসে যায় না। কেন না রাস্তায় মাত্র দুটো বাড়িই তো থাকার মতো।

স্ত্রী মিসেস হোয়াইট সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললেন, মন খারাপ কোরো না। পরের গেমে তুমিও জিততে পারো।

মা ছেলের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। সেদিকে চোখ পড়ল মি. হোয়াইটের। তিনি চুপ করে গেলেন। অপরাধীর মতো মুখ করে হাসার চেষ্টা করলেন। তার পাতলা ধূসর দাড়ির মধ্যে সেই হাসি মিলিয়ে গেল ।

গেট খোলার শব্দ হলো জোরে। দরজার দিকে এগিয়ে আসছে ভারী পদধ্বনি। ওই যে তিনি এলেন। বলল হার্বার্ট হোয়াইট।

মি. হোয়াইট তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, দরজা খুলে দিলেন এবং অতিথির আসতে কষ্ট হয়েছে বলে দুঃখপ্রকাশ করতে লাগলেন। মেহমানও স্বীকার করলেন তার একটু কষ্ট

হয়েছে। মি. হোয়াইট লম্বা, মোটাসোটা ছোট ছোট চোখ এবং লাল মুখ একজন লোককে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলেন। আস্তে করে কাশলেন মিসেস হোয়াইট।

মি. হোয়াইট বললেন, ইনিই সার্জেন্ট মেজর মরিস।

সার্জেন্ট মেজর করমর্দন পর্ব সেরে বসে পড়লেন আগুনের পাশে একটা চেয়ারে। হুইস্কি এবং গ্লাস বার করলেন মি. হোয়াইট। তামার কেটলিটা আগুনের ওপর। মরিসের দৃষ্টি এ সবের দিকেই।

তৃতীয় গ্লাস হাতে নিয়ে সার্জেন্ট মেজরের চোখ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর চওড়া কাঁধ চেয়ারে ছড়ানো। তিনি বলে চলছিলেন অদ্ভুত সব দৃশ্যের কথা। তার দুঃসাহসী কাজের কথা, যুদ্ধ, প্লেগ এবং অদ্ভুত সব মানুষ নিয়েও তার গল্প চলল।

মি. হোয়াইট স্ত্রী আর পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, একুশ বছর হয়ে গেল। যখন মরিস চলে যায় তখনও সদ্য যুবক। আর আজ ওকে দেখ।

তারপর য়েগ করলেন, আমি নিজে একবার ভারতে যেতে চাই। নিজের চোখে সবকিছু দেখব আর কি।

সার্জেন্ট মেজর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, বেশ তো আছেন এখানে। তিনি খালি গ্লাসটা মুখ থেকে নামালেন। হালকা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

মি. হোয়াইট বললেন, আমি ওইসব পুরানো মন্দির, ফকির আর যাদুকরদের দেখতে চাই। আচ্ছা মরিস, আপনি সেদিন বানরের থাবা না কী যেন একটা জিনিসের কথা বলছিলেন না?

মরিস তাড়াতাড়ি বললেন, কিছু না। ওটা শোনার মতো কিছু নয়।

মিসেস হোয়াইট আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন, বানরের থাবা?

সার্জেন্ট মেজর বললেন, আপনারা একে ভোজবাজি বলতে পারেন।

তিনজন শ্রোতা সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। মরিস অন্যমনস্কভাবে খালি গ্লাসটাই মুখে তুলে ধরে আবার সেটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। খালি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলেন মি. হোয়াইট।

সার্জেন্ট মেজর পকেট হাতড়াতে লাগলেন। বললেন, একটা ছোট্ট সাধারণ থাবা। শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে।

তিনি পকেট থেকে জিনিসটি বার করলেন। রাখলেন সামনে। মিসেস হোয়াইট একটু পিছিয়ে গেলেন ভয়ে। কিন্তু ওঁর ছেলে হাতে নিল ওটা। দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ছেলের হাত থেকে থাবাটি নিলেন মি. হোয়াইট। ভালো করে দেখলেন, তারপর বললেন, এর বিশেষত্বটা কী? টেবিলের উপর রাখলেন থাবাটি।

একজন বুড়ো ফকির এই থাবাটিকে মন্ত্র পড়ে জাগিয়ে তোলেন। ছিলেন খুব ধার্মিক। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন ভাগ্যই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা একে আটকাতে চায়, তারা শুধু দুঃখকেই ডেকে আনে। তিনি থাবাটিকে মন্ত্রপূত করেছিলেন, থাবাটি তিনজন মানুষের তিনটি ইচ্ছাপূরণ করবে।

এইসব কথা শুনে ওদের মুখে হালকা হাসি ফুটল।

হার্বার্ট বলল, আচ্ছা, আপনি আপনার তিনটে ইচ্ছের কথা বলেননি?

প্রগলভ তরুণের দিকে যেভাবে মধ্যবয়স্করা তাকায়, ঠিক সেভাবেই মরিস তাকালেন হার্বার্টের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। তাঁর ব্রণে ভরা মুখটি সাদা দেখাল।

মিসেস হোয়াইট জানতে চাইলেন, আপনার তিনটে ইচ্ছেই কি পূরণ হয়েছিল?

হয়েছিল, জবাব দিলেন সার্জেন্ট মেজর। শক্ত দাঁতে গ্লাসটি তিনি ঠক ঠক করে ঠুকলেন।

আর কেউ কি কিছু চেয়েছিল? বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন।

একজন তার তিনটে ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছিল। সার্জেন্ট মেজর উত্তর দিলেন। প্রথম দুটি ইচ্ছে কী ছিল জানি না। তৃতীয়টিতে সে চেয়েছিল তার মৃত্যু। তারপর থাবাটি চলে আসে আমার হাতে।

মরিসের গলার গম্ভীর স্বরে পরিবেশ হয়ে উঠল থমথমে। সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে মি. হোয়াইট বললেন, মরিস, এটির তো আপনার আর দরকার নেই তাহলে আর এটিকে সঙ্গে রেখেছেন কেন?

মরিস মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললেন, নিছক শখ বলতে পারেন। ভেবেছিলাম এটাকে বিক্রি করে দেব। কিন্তু বিক্রি হবে বলে মনে হয় না। অপকার যা করার তা ইতিমধ্যে থাবাটি করে ফেলেছে। তাছাড়া কেউ এটা কিনতেও চাইবে না। কারণ সবার ধারণা এটা একটা গল্পকথা। কেউ হয়তো অন্য কিছু ভাবে। কিন্তু তারাও চায় আগে পরখ করে দেখতে। তারপর টাকার কথা।

মি. হোয়াইট মরিসের দিকে তাকালেন। আপনি তো আপনার আরও তিনটে ইচ্ছের কথা বলতে পারেন? সেগুলো কি পূরণ হবে?

মরিস বললেন, আমি জানি না, সত্যি জানি না।

তিনি থাবাটি হাতে নিলেন। দু আঙুলে টিপে ধরে দোলাতে লাগলেন সেটিকে। তারপর হঠাৎ ছুঁড়ে দিলেন আগুনের ওপর। হোয়াইট ঝুঁকে পড়ে থাবাটি টেনে নিলেন।

এটা পুড়ে গেলেই ভালো, শান্ত আর গম্ভীর গলায় বললেন মরিস।

মরিস, আপনার তো আর থাবাটির দরকার নেই। তাহলে এটা আমার কাছেই থাক, মি. হোয়াইট বললেন।

মরিস বললেন, এ জিনিস আপনি রেখে দিতে পারেন। তবে তারপর যা ঘটবে সেজন্য আমাকে যেন দোষ দেবেন না। তাই বলি, বুদ্ধিমান লোকের মতো থাবাটিকে ফের আগুনেই ফেলে দিন।

হোয়াইট মাথা নাড়লেন। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তার নতুন সম্পত্তিটিকে। তারপর বললেন, আচ্ছা বলুন তো কীভাবে ইচ্ছের কথা বলতে হয়।

থাবাটিকে ডান হাত তুলে ধরে তারপর ইচ্ছের কথা জোরে বলবেন, সার্জেন্ট মেজর বললেন, ফের বলছি এর পরিণাম কিন্তু খারাপ হতে পারে।

আরব্য রজনীর গল্পের মতো শোনাচ্ছে, বললেন মিসেস হোয়াইট। তিনি উঠে পড়লেন। রাতের খাবারের জোগাড় যন্ত্র করতে হবে। একটু হেসে বললেন, তুমি যেন আমার জন্য চার জোড়া হাত চেয়ে বোসো না।

মি. হোয়াইট পকেট থেকে থাবাটি বার করলেন। সার্জেন্ট মেজর তাঁর হাতটি ধরে ফেললেন চট করে। কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, যদি কিছু চাইতেই হয়, তাহলে বরং ভালো কিছু চান। তিনি যেন সবাইকে সাবধান করে দিতে চাইছিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে তিনজনেই হেসে উঠলেন।

মি. হোয়াইট ফের তার পকেটে পুরে ফেললেন থাবাটি। এরপর সবাই বসলেন খাবার টেবিলে। খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগল। থাবাটির কথা প্রায় ভুলেই গেলেন সবাই। তিনজন শ্রোতা ভারতে মরিসের সৈনিক জীবনের দুর্ধর্ষ সব ঘটনার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

খাওয়া শেষে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মরিস। তাঁকে শেষ ট্রেনটি ধরতে হবে।

হার্বার্ট বলল, উনি যেসব গল্প বলছিলেন তার চেয়ে বোধ হয় এই বানরের থাবার গল্পটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা দিয়ে তোমার খুব একটা লাভ হবে না বাবা।

মিসেস হোয়াইট বললেন, এই জন্য তুমি কি ওকে কিছু দিয়েছ?

সামান্য কিছু, তিনি একটু বাড়িয়ে বললেন, মরিস নিতে চাননি। আমি জোর করেই দিলাম। উনি আবার আমাকে বলেছেন ওটাকে ফেলে দিতে।

হাবার্ট হালকা গলায় বলল, কেন আমরা তো বড়লোক হয়ে যাব। চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সুখের শেষ থাকবে না। বাবা, তুমি বরং রাজা হতে চাও। তাহলে দেখবে তোমাকে আর মায়ের কথা মতো ওঠ-বস করতে হবে না।

রাগের ভান করে মিসেস হোয়াইট ঢাকনা হাতে নিয়ে ছেলের দিকে তেড়ে গেলেন। হাবার্টি টেবিলের অন্যদিকে গিয়ে লুকালো।

মি. হোয়াইট তাঁর পকেট থেকে থাবাটি বের করলেন। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলেন জিনিসটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, এর কাছে যে কী চাইব তাই বুঝতে পারছি না।

হার্বার্ট বলল, বাড়িটার দেনা শোধ হলেই তো তুমি খুশি হও, তাই না? তাহলে এক কাজ করো। দুশো পাউন্ড চাও। ওতেই কাজ মিটে যাবে।

মি. হোয়াইট থাবাটি ডান হাতে নিয়ে উপরে তুলে ধরলেন। হার্বার্টি গম্ভীর মুখ করে পিয়ানোর ধারে বসে পড়ল। বেশ কয়েকটা সুর তুলল। এরই মধ্যে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে একবার চোখ টিপল।

মি. হোয়াইট স্পষ্ট গলায় বললেন, আমার দুশো পাউন্ড চাই। তারপর তিনি ভয়ার্ত চিৎকার দিলেন।

মিসেস হোয়াইট আর হাবাটি দৌড়ে গেলেন তাঁর কাছে।

ভীষণ ভয় পাওয়া গলায় হোয়াইট সাহেব বললেন, নড়ে উঠেছিল ওটা। মেঝেয় পড়ে আছে থাবাটি। ওটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেন, যখন আমি ওই কথাগুলো বললাম তখন থাবাটি আমার হাতের মধ্যে সাপের মতো কিলবিল করে উঠল।

হার্বার্ট থাবাটি তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল। তারপর বলল, কই, তোমার টাকা কই? আমি হলফ করে বলতে পারি ওই টাকা আর আসবে না।

মিসেস হোয়াইট উদ্বেগের চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি বললেন, থাবা আবার নড়বে কেন? ও তোমার কল্পনা।

মি. হোয়াইট মাথা নাড়লেন। বললেন, যাকগে, বাদ দাও। এতে তো কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি কিন্তু চমকে গিয়েছিলাম।

আগুনের ধারে তারা আবার বসলেন। বাবা ও ছেলের মুখে পাইপ। বাইরে জোরে বাতাস বইছিল। ওপরতলার একটা দরজায় জোর শব্দ হচ্ছিল।

মি. হোয়াইটের চোখে ভয় ফুটে উঠল। একটা অস্বাভাবিক নীরবতা এবং অবসাদ যেন সবাইকে গিলে ফেলল। শেষে হোয়াইট দম্পতি উঠে পড়লেন। তাদের শোবার সময় হয়ে গেছে।

হাবার্ট তাদের শুভরাত্রি জানাল। বলল, মনে হচ্ছে তোমাদের বিছানার মাঝখানে একটা বড় থলের মধ্যে তোমরা টাকাটা পাবে। আর বাবা, তুমি যখন ওই টাকাটা পকেটে পুরবে, তখন দেখবে ওয়ার্ডরোবের ওপর থেকে একজোড়া ভয়ঙ্কর চোখ তোমার ওপর নজর রাখছে।

দুই

শীতের সকালের ঝলমলে রোদ টেবিলের ওপর খেলা করছে। ব্রেকফাস্টে বসেছেন ওঁরা তিনজন। হার্বার্ট গতরাত্রের ঘটনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল। আলমারির তাকের ওপর অবহেলায় পড়ে আছে নোংরা, কোঁচকানো সেই থাবাটি। যেন নির্দোষ, নিষ্ঠুণ একটা জিনিস।

মিসেস হোয়াইট বললেন, অবসর নেয়া সব সৈনিকই সমান। আর আমরাও বোকার মতো বসে বসে আজগুবি গল্প শুনলাম। আজকের দিনে ইচ্ছা পূরণের ঘটনা ঘটে?

হালকা গলায় হার্বার্ট বলল, হয়তো আকাশ থেকেই বাবার মাথার ওপর টাকাগুলো খসে পড়বে।

মি. হোয়াইট বললেন, মরিস বলেছিলেন ঘটনাগুলো এত স্বাভাবিকভাবে ঘটে যে তোমরা ব্যাপারগুলোকে ইচ্ছে করলে দৈবের মতো কোনো ঘটনা নামনে করতেও পারো।

হার্বার্ট টেবিলে ছেড়ে উঠে পড়ল, আমি ফেরার আগে যেন টাকাটা খরচ করে ফেল না। ভয় হয় টাকাটা পাছে তোমাকে অন্য মানুষ করে। তোলে। তখন কিন্তু তোমাকে আর বাবা বলে ডাকতে পারব না!

মিসেস হোয়াইট হাসলেন। ছেলেকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তারপর ব্রেকফাস্টের টেবিলে ফিরে এলেন। স্বামীর বিশ্বাসপ্রবণতা নিয়ে হাসিঠাট্টায় নিজেকে খুব হালকা

লাগছিল তাঁর। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ল ডাকপিয়ন। তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ডাকপিয়ন দর্জির দোকানের বিল দিয়ে গেল।

.

সেদিন ডিনারে বসে মিসেস হোয়াইট বললেন, তোমার ছেলে যখন ফিরবে তখন দেখবে সে আরও কত মজার মজার কথা বলবে। ভারি দুষ্টু।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মি. হোয়াইট বললেন, তা হয়তো বলবে। তবে কসম খেয়ে বলছি ওটা আমার হাতের মধ্যে নড়াচড়া করছিল।

তোমার মনে হয়েছিল ওটা নড়ছে, নরম গলায় বললেন মিসেস হোয়াইট।

আমি বলছি ওটা নড়ছিল। ভাবাভাবির ব্যাপার নয়। এটা ঠিক

মাঝপথে কথা থামিয়ে দিলেন তিনি। তারপর বললেন, কী হলো? অমন করে কী দেখছ?

মিসেস হোয়াইট উত্তর দিলেন না। তিনি বাইরে একটি লোকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। খুব রহস্যজনকভাবে ভদ্রলোক ঘোরাফেরা করছিলেন। বাড়িটার দিকে তিনি এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন মনস্থির করতে পারছিলেন না কী করবেন।

আগন্তুকের পোশাক পরিচ্ছদ খুব চমৎকার। মাথায় পশমের টুপি, চকচকে, নতুন। বার তিনেক ভদ্রলোক গেটের সামনে থামলেন। তারপর আবার হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। চতুর্থবার তিনি গেটের ওপর হাত রেখে দাঁড়ালেন। এবং হঠাৎ কী মনে করে গেট খুলে ফেললেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন সামনের দিকে।

মিসেস হোয়াইটের হাত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছনে চলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রনের দড়ি খুলে ফেললেন। চেয়ারের গদির তলায় ঢুকিয়ে দিলেন সেটা। ভদ্রলোককে ঘরে নিয়ে এলেন। মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক খুব অস্বস্তিতে ভুগছেন। একবার তিনি আড়চোখে মিসেস হোয়াইটের দিকে তাকালেন। মিসেস হোয়াইট তাঁর অগোছালো ঘর এবং তাঁর স্বামীর কোটটির জন্য বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। সাধারণত বাগানে কাজ করার সময় কোটটি মি. হোয়াইট পরে থাকেন। কিন্তু এ কথা যেন ভদ্রলোকের কানে যাচ্ছিল না। মিসেস হোয়াইট ভাবছিলেন, ভদ্রলোক হয়তো এবার তাঁর আসার কারণ জানাবেন। কিন্তু তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর এক সময় টেনে টেনে বললেন, আমাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে। ভদ্রলোক একটু নিচু হলেন, তারপর তাঁর ট্রাউজার থেকে একটা আঁশ তুলতে তুলতে বললেন, আমি আসছি ম অ্যান্ড মেগিন্স থেকে।

মিসেস হোয়াইট চমকে উঠলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তিনি বললেন, কী ব্যাপার? হার্বার্টির কিছু হয়েছে? দয়া করে বলুন কী হয়েছে?

মি. হোয়াইট বললেন, শোনো, শোনো, চেয়ারে বোসো। আবোল তাবোল ভাবছ কেন?

তারপর আগন্তুকের দিকে তাকালেন, আপনি নিশ্চয় আমাদের জন্য কোনো খারাপ নিয়ে আসেননি।

আগন্তুক বললেন, আমি খুব দুঃখিত–

হার্বার্টির কী কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন মিসেস হোয়াইট।

আগন্তুক মাথা নাড়লেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন, বড় একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু এখন আর তার কোনো কষ্টই নেই।

যাক বাঁচা গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এর জন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ–হঠাৎ মিসেস হোয়াইট থমকে গেলেন।

আগন্তুকের কথাটির মানে তিনি যেন হঠাৎ বুঝতে পারলেন। তিনি আবার তাকালেন ভদ্রলোকের মুখের দিকে। তাঁর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস হোয়াইট বুঝে গেলেন আসলে কী ঘটেছে।

তাঁর নিঃশাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। স্বামীর দিকে ফিরলেন তিনি। কাঁপা কাঁপা হাতটা রাখলেন স্বামীর হাতের উপর। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

অনেকক্ষণ পর আগন্তুক আস্তে আস্তে বললেন, তাকে যন্ত্র পিষে ফেলেছে।

মি. হোয়াইট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তার হাতের মধ্যে স্ত্রীর হাত। তিনি তাঁর স্ত্রীর হাতের ওপর অল্প অল্প চাপ দিচ্ছিলেন। ঠিক চল্লিশ বছর আগে তাদের পূর্বরাগের দিনগুলোর মতো।

এক সময় আগন্তুকের দিকে আস্তে আস্তে ফিরে তিনি বললেন, আমাদের ওই একটিই মাত্র ছেলে। ওর কী খবর নিয়ে এসেছেন আপনি।

আগন্তুক কাশলেন, উঠে দাঁড়ালেন তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন জানালার কাছে। বললেন, আপনাদের এই নিদারুণ ক্ষতিতে কোম্পানি আপনাদেরকে গভীর সহানুভূতি জানিয়েছে। আশা করি বুঝতে পারছেন আমি এদের একজন কর্মচারী মাত্র। আমি এসেছি শুধু ওদের নির্দেশ পালন করতে।

প্রত্যুত্তরে কেউ কিছু বললেন না। মিসেস হোয়াইটের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। দৃষ্টি স্থির। তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শোনা যাচ্ছিল না। আর মি. হোয়াইট ভাবছিলেন, সার্জেন্ট মেজরের কথাগুলো হয়তো এইভাবেই ফলতে শুরু করল।

ভদ্রলোক বলে বললেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ম. অ্যান্ড মেগিন্স সব দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো দায়িত্বই নেই। কিন্তু আপনাদের পুত্রের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ তারা আপনাদের কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে চেয়েছেন।

মি. হোয়াইটের শিথিল হাত থেকে তাঁর স্ত্রীর হাত ছুটে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চোখ মুখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে। তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে। কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন, কত?

দুশো পাউন্ড।

মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু সে চিৎকার মি. হোয়াইটের কানে গেল না। তাঁর মুখে হাসির রেখা। তিনি অন্ধের মতো হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তিন

দুমাইল দুরের নতুন বড় গোরস্থানে প্রিয় পুত্রকে সমাহিত করে হোয়াইট দম্পতি বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িটি এখন শোকের ছায়া আর নির্জনতায় ভরা। ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে তাঁরা যেন কিছুই বুঝতে উঠতে পারছিলেন না। তাঁদের মনে হচ্ছিল, হয়তো আরও কিছু ঘটবে। তাঁদের এই পাষাণভার হালকা হয়ে যাবে। এই বয়সে ওই ভার আর তারা বইতে পারছিলেন না। তাঁদের মনে হচ্ছিল হয়তো আরও কিছু ঘটবে। তাঁদের এই পাষাণভার হালকা হয়ে যাবে। এই বয়সে ওই ভার আর তাঁরা। বইতে পারছিলেন না।

কিন্তু দিন গেল । আশা করতে করতে এক সময় তাঁরা যেন সব কিছু ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিলেন। তাঁদের এই আশাহীন আত্মসমর্পণ অনেকে উদাসীনতা মনে করল । অনেক সময় তারা নিজেদের মধ্যেও কথা বলতেন না। কারণ তাঁদের কথা বলার আর কিছু ছিল না। তাঁদের দিনগুলো ছিল দীর্ঘ ক্লান্তিতে ভরা।

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন রাত্রে হঠাৎ মি. হোয়াইটের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়িয়ে বুঝতে পারলেন বিছানায় তিনি একা। ঘরে আলো জ্বলছে না। জানালার ধার থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসছিল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তারপর নরম গলায় বললেন, বিছানায় এসো। তোমার ঠান্ডা লাগবে।

কত আর ঠান্ডা লাগবে, মিসেস হোয়াইট বললেন, ফের ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

কান্নার শব্দ আর মি. হোয়াইটের কানে গেল না। গরম বিছানায় তাঁর চোখ জোড়া যেন জড়িয়ে আসছিল। তার তন্দ্রা এসে গেল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। মিসেস

হোয়াইট পাগলের মতো চিৎকার করে বলছেন, বানরের থাবা! বানরের থাবা!

মি. হোয়াইট চমকে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে ভয়। বললেন, কোথায় বানরের থাবা? কী হলো?

মিসেস হোয়াইট টলমল পায়ে তাঁর দিকে ছুটে এলেন। শান্ত গলায় বললেন, আমি সেটা চাই। তুমি নষ্ট করে ফেলনি তো?

বৈঠকখানায় রেখেছি, তাকের ওপর। কিন্তু কেন? তার গলার বিস্ময়।

মিসেস হোয়াইট কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি হেসে উঠলেন। নিচু হয়ে স্বামীর গালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন।

প্রলাপের মতো বললেন, আমার কেবল এখনই মনে পড়ল। আগে কেন মনে পড়েনি? হা গো, তোমার কেন আগে এ কথা মনে হয়নি?

কীসের কথা তুমি বলছ? তিনি প্রশ্ন করলেন।

কেন বাকি দুটি ইচ্ছের কথা? আমাদের তো কেবল একটি ইচ্ছে পূরণ । হয়েছে।

মি. হোয়াইট রেগে বললেন, যা হয়েছে, তা-ই কি যথেষ্ট নয়?

না, জোর গলায় বললেন মিসেস হোয়াইট । আমাদের আরো একটা। ইচ্ছে রয়েছে। নিচে যাও। থাবাটা নিয়ে এসো। আর সেটা হাতে নিয়ে বলো, আমাদের বাছা আবার বেঁচে উঠুক।

মি. হোয়াইট বিছানায় উঠে বসলেন। চাদরটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, ওহ গড, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

নিয়ে এসো ওটা। শিগগির নিয়ে এসো। হাতে নিয়ে তোমার ইচ্ছের কথা বলো। আহারে বাছা আমার, বললেন মিসেস হোয়াইট।

মি. হোয়াইট দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরালেন। গলায় জোর পেলেন না। তবু তিনি বললেন, বিছানায় চলে এসো। তুমি কী বলছ নিজেই বুঝতে পারছ না।

আমাদের প্রথম ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয়টা পূরণ হবে না কেন? যেন ঘোরের মধ্যে বললেন মিসেস হোয়াইট।

মি. হোয়াইট শুধু বলতে পারলেন, ওটা ঘটে গেছে কাকতালীয়ভাবে।

যাও ওটা নিয়ে এসো, তোমার ইচ্ছের কথা বলো, চিৎকার করে বললেন মিসেস হোয়াইট। স্বামীকে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

মি. হোয়াইট অন্ধকারে নিচে নামলেন। হাতড়ে হাতড়ে পৌঁছে গেলেন বৈঠকখানায়। তারপর সেই তাকে। থাবাটি সেখানেই ছিল। তাঁর ভীষণ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল ঘর থেকে বেরুবার আগেই হয়তো দুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে তাঁর ছেলে সামনে এসে হাজির হবে। তিনি কাঁপছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন দরজায় যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। ভ্রুতে ঘাম জমেছে। টেবিলের চারদিকে ঘুরে দেয়াল ধরে ধরে তিনি বাইরে এলেন। হাতে সেই অস্বস্তিকর জিনিসটা।

তিনি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর স্ত্রীর মুখের চেহারাই যেন পালটে গেল । মি. হোয়াইটের চোখেমুখে ভয়। তিনি দেখলেন তার স্ত্রী অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে থাবাটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

মিসেস হোয়াইট শক্ত গলায় বললেন, তোমার ইচ্ছার কথাটা বলো।

এটা ঠিক হচ্ছে না, বোকর মতো কাজ হচ্ছে, কথাটা যেন মি. হোয়াইটের গলায় আটকে গেল।

বলো তুমি, ফের বললেন মিসেস হোয়াইট।

মি. হোয়াইট হাতখানা তুলে ধরলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, আমার ছেলে আবার বেঁচে উঠুক।

থাবাটা মেঝেতে পড়ে গেল। ভয়ে শিউরে উঠে মি. হোয়াইট থাবাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একসময় কাঁপতে কাঁপতে তিনি চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন। আর তাঁর স্ত্রী জ্বলন্ত এক জোড়া চোখ নিয়ে জানালার এক ধারে এসে দাঁড়ালেন। টেনে খুলে নিলেন পর্দাটা।

মি. হোয়াইট বসে রইলেন। ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন স্ত্রীর আবছা চেহারার দিকে। মিসেস হোয়াইটের দৃষ্টি জানালার বাইরে। বাতির আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটা ভৌতিক ছায়া পড়ছিল সিলিং আর ছাদের ওপর। হঠাৎ দপ করে বাতিটা নিভে গেল। মি. হোয়াইট হাঁফ ছেড়ে বাচলেন।

না, থাবাটা এবারে আর কাজ দিল না। তিনি বিছানায় ফিরে এলেন। দুএক মিনিট পরে ধীর পায়ে বিছানায় এলেন মিসেস হোয়াইটও। পাশে শুয়ে পড়লেন উদাসীনভাবে।

কেউ কোনো কথা বলছিলেন না। নীরবে তারা ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনে যাচ্ছিলেন। সিঁড়িতে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হলো। একটা ইঁদুর কিচমিচ করতে করতে দেওয়াল ধরে ছুটল। অন্ধকারটা যেন বুকে চেপে বসেছিল। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর মনে সাহস আনতে বিছানা থেকে নেমে মি. হোয়াইট দেশলাইয়ের বাক্সটা নিলেন। জ্বালাতে গিয়ে কাঠিটা নিভে গেল। আর একটা কাঠি জ্বালাতে যাচ্ছেন ঠিক তখন ঠক ঠক করে একটা শব্দ হলো। শব্দটা হলো খুব আস্তে। এত আস্তে যে কষ্ট করে শুনতে হয়। শব্দটা আসছিল ফ্রন্ট ডোর থেকে।

দেশলাইটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। তিনি পাথরের মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় শব্দ হলো আর একবার। তিনি পিছু ফিরলেন। দৌড়ে চলে এলেন ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফের আওয়াজ হলো। ঠক ঠক। সেই শব্দ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল।

চমকে উঠে মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে উঠলেন, কীসের শব্দ?

একটা ইঁদুর। সিঁড়িতে আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল, কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন মি. হোয়াইট।

মিসেস হোয়াইট বিছানার ওপর উঠে বসলেন। কান খাড়া। বেশ জোরে ঠকঠক করে শব্দ হলো। সারা বাড়ি গমগম করে উঠল সেই শব্দে।

আমার হার্বার্ট! আমার হার্বার্ট এসেছে, চিৎকার করে উঠলেন মিসেস হোয়াইট।

তিনি দৌড়ে চলে গেলেন দরজার দিকে। তাঁর সামনে তাঁর স্বামী। মি. হোয়াইট স্ত্রীর হাতটা জোর করে ধরে রইলেন।

খসখসে চাপা গলায় বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

যন্ত্রের মতো হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে বললেন, আমার বাছা, আমার হার্বার্ট এসেছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম– দু মাইল পথ পার হতে তো একটু দেরি হবেই। হ্যাঁ গো, তুমি কেন আমাকে মিছিমিছি ধরে রেখেছ। আমাকে যেতে দাও লক্ষ্মীটি। দরজাটা খুলতে দাও।

ঈশ্বরের দোহাই, ওকে তুমি আসতে দিও না, ঠক ঠক করে কেঁপে উঠলেন মি. হোয়াইট।

তুমি তোমার ছেলেকে ভয় পাচ্ছ! হার্বার্ট, আমি আসছি। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও।

দরজায় আর একবার ঘা পড়ল। আরও একবার। মিসেস হোয়াইট হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। তারপর ছুটলেন। মি. হোয়াইট সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। বলতে লাগলেন, দোহাই, তুমি যেও না, ফিরে এসো। শিকল খোলার খড় খড় শব্দ কানে এলো তার। নিচের শক্ত খিলটাও আস্তে আস্তে খুলে গেল। তারপর মিসেস হোয়াইটের ক্লান্ত, হাঁফ ধরা গলা ভেসে এলো- ওপরের খিলটার নাগাল পাচ্ছি না। তুমি এসো তো একবার।

তখন মি. হোয়াইট হামাগুড়ি দিয়ে পাগলের মতো মেঝেতে থাবাটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বাইরে যে আছে, সে ঘরে ঢোকার আগেই থাবাটিকে খুঁজে পেতে হবে।

সারা বাড়িতে ঠক ঠক শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল। মিসেস হোয়াইট টানতে টানতে একটা চেয়ার আনলেন। দরজার সামনে রাখলেন। খিলটা কাঁচ করে খুলে গেল। আর ঠিক সেই

সময়েই থাবাটি হাতে ঠেকল মি. হোয়াইটের। তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন তার তৃতীয় ও শেষ ইচ্ছার কথা।

হঠাৎ থেমে গেল সেই শব্দ। শুধু রয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি। মি. হোয়াইট শুনতে পেলেন চেয়ার সরানোর শব্দ। শুনলেন দরজাটা খুলে গেল। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে।

হতাশায় দুঃখে হাহাকার করে উঠলেন মিসেস হোয়াইট। মি. হোয়াইট দৌড়ে গেলেন স্ত্রীর পাশে। তারপর আস্তে আস্তে গেট খুলে বাইরে এলেন। শব্দহীন, জনমানবশূন্য রাস্তায় শুধু জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আলো। আর কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই।

–ডব্লু. ডব্লু জ্যাকবস

উইলিয়াম উইলসন

উইলিয়াম উইলসন নামেই এখন আমাকে চিনে রাখুন। আসল নামটা বলব না। আমার সামনেই রয়েছে এক দিস্তে সাদা কাগজ। আসল নামের কালি দিয়ে কাগজগুলোকে আর নোংরা করতে চাই না। যে নাম শুনলে আমার জাত ভাইরা শিউরে ওঠে, ঘৃণায় মুখ বেঁকায়– সে নাম আপনাকে শুনতে হবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক কুৎসিত কদাকার কাজ করে বেরিয়েছি, অনেক অপবাদ হজম করেছি, অনেকের সর্বনাশ করেছি। কেউ আমাকে আর চায় না। আমার মত একঘরে এখন আর কেউ নেই। এত কুকর্মও কেউ করেনি। দুনিয়ার মানুষের সামনে আমি তো এখন মরেই রয়েছি। আমার মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা শূন্যে মিশেছে; এখন যেন একটা ঘন কালো বিষণ্ণ মেঘ ঝুলছে সামনে; হতাশার এই মেঘের বুঝি আর শেষ নেই; আমার সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে আড়াল করে রেখেছে এই ভ্রূকুটি কুটিল কৃষ্ণকায় মেঘ। নিঃসীম নিরাশার এ-রকম দমিয়ে দেওয়া চেহারা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

শেষের বছরগুলোর ইতিহাস লিখতে বসিনি। লিখতে পারব কিনা, সেটাও একটা প্রশ্ন। অকথ্য কষ্ট পেয়েছি শেষের দিকে ভাষা দিয়ে সে দুর্ভোগ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। অপরাধের পর অপরাধ করে গেছি– সে-সবের কোনো ক্ষমাও হয় না। আর তার পরেই ঝুঁকে পড়লাম চরম লাম্পট্যের দিকে। কিভাবে তা ঘটল, শুধু সেইটুকুই লিখব বলেই আজ আমি বসেছি কাগজ-কলম নিয়ে।

মানুষ একটু একটু করে খারাপ হয়। আমি হলাম আচমকা। যা কিছু ভাল ব্যাপার ছিল আমার মধ্যে, সমস্তই টুপ করে খোলসের মতোই খসে পড়ে গেল। অল্প-অল্প খারাপ কাজ করে যাচ্ছিলাম এই ঘটনার আগে; দুম করে শয়তান-শিরোমণি হয়ে যেতেই যেন বিশাল এক লাফ মেরে পৌঁছে। গেলাম নরকের রক্ত-জল করা উপত্যকায়, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম একবারই বিশেষ সেই ঘটনাটাই গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। একটু ধৈর্য ধরুন।

আমি জানি, মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে, তখন তার করাল ছায়া পড়ে আগেই। সেই ছায়া পড়েছে আমার ওপর। মন মেজাজ তাই ঝিমিয়ে পড়েছে। নারকীয় সেই উপত্যকার মধ্যে আমি যখন দিশেহারা, তখন পাঁচজনের অনুকম্পা চেয়েছিলাম আকুলভাবে; এক ফোঁটা সহানুভূতি আদায়ের জন্যে নানা ছল চাতুরি করে জাতভাইদের বোঝাতে চেয়েছিলাম, অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা আমাকে টেনে এনেছে এই অবস্থায় আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই; এ-সব ঘটনার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই- এমন ধারণাটাও ঢোকাতে চেয়েছিলাম জাতভাইদের মগজের মধ্যে। ভুল করেছি ঠিকই, ঘটনা পরম্পরার গোলাম হয়ে গিয়ে নরক-কুণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছি কিন্তু সবাই মিলে হাত লাগিয়ে যদি আমাকে টেনে তোলে, তাহলে আবার সুখের মুখ দেখতে পাবো, ভুলের মরীচিকা মিলিয়ে যাবে সত্যিকারের মরুদ্যানে পৌঁছে যাব।

প্রলোভনই মানুষকে অধঃপাতে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার মতো অধঃপতন আর কারও হয়নি। এত কষ্টও কেউ পায়নি। ঠিক যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি। তিল তিল করে মরছি।

অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যে বিভীষিকা। আর রহস্যকে কল্পনা করা যায় না– আমি সেই অবিশ্বাস্য আতঙ্ক আর প্রহেলিকার বলি হতে চলেছি নিরতিসীম নিষ্করুণভাবে!

আমি যে জাতের মানুষদের মধ্যে জন্মেছি, কল্পনাশক্তির বাড়াবাড়ি আর ঝট করে ক্ষেপে ওঠার দুর্নাম তাদের আছে। ছেলেবেলা থেকেই বংশের নাম রেখেছি এই দুই ব্যাপারেই। আমার দুর্বার কল্পনা বাগ মানে না। কিছুতেই; ঠিক তেমনি মাথায় রক্ত চড়ে যায় যখন তখন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুর্বার হয়ে উঠেছে এই বদ দোষগুলো। তাতে বন্ধুবান্ধবদের অশান্তি বাড়িয়েছি, নিজেরও ক্ষতি করেছি। আমার ইচ্ছের ওপর কারো ইচ্ছেকে মাথা তুলতে দিইনি, অদ্ভুত খেয়াল খুশি নিয়ে মেতে থেকেছি, প্রচন্ড ঝোঁকের মাথায় অনেক কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছি। আমার বাবা আর মা-এর মন এবং শরীর তেমন মজবুত নয়; তাই কিছুতেই রাশ টেনে ধরতে পারেননি আমার দুর্দান্তপনার।

খারাপ কাজে আমার প্রবণতা দিনে দিনে লক্ষমুখ নাগের মতো ফনা মেলে ধরেছে– তাঁরা সামাল দিতে পারেননি নিজেদের ধাত কমজোরি বলে। চেষ্টা যে করেননি, তা নয়। কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যে জোর ছিল না। বজ্জাত ঘোড়াকে লাগাম পরাতে গেলে কায়দা জানা দরকার। ওঁনারা তা জানতেন না। ভুল করেছিলেন বলেই আমাকে ঢিট করতে তো পারলেনই না– উল্টো জিতে গিয়ে আমি আরও উদ্দাম হয়ে উঠলাম। তখন থেকেই কিন্তু আমার ওপর আর কারও কথা বলার সাহস হয়নি। আমি যা বলব, তাই হবে। আমি যা

চাই, তাই দিতে হবে। যে বয়েসে ছেলেমেয়েরা বাবা মা-এর চোখে তাকাতে পারত না – সেই বয়স থেকেই আমি হয়ে গেলাম বাড়ির সর্বেসর্বা। আমিই সব। আমার ওপর আর কেউ নেই।

স্কুলের কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা বিরাট বাড়ি। রাণী এলিজাবেথের আমলের প্রাসাদ। ইংল্যান্ডের একটা ছায়ামায়ায় ভরা কুহেলী ঘেরা গ্রাম। সেখানকার গাছপালাগুলো দৈত্যদানবের মতো আকাশছোঁয়া আর ভয়ানক; হাড়গোড় বের করে যেন দাঁত খিঁচিয়েই চলেছে সবসময়ে। সেখানকার সব কটা ইমরাতই বড় বেশি প্রাচীন। স্বপ্ন দেখছি বলে মনে হয়। মনের জ্বালা জুড়িয়ে আসে। এই মুহূর্তে ছায়াস্নিগ্ধ পথগুলো শান্তির ছায়া ফেলছে আমার মনের মধ্যে। পথের দুপাশে ঘন গাছের সারি। ঠান্ডা হাওয়ায় যেন গা জুড়িয়ে আসে। নাকে ভেসে আসছে ঝোঁপঝাড়ের সোঁদা গন্ধ হাজার হাজার ফুলের সৌরভে মনে ঘনাচ্ছে আবেশ। দূরে বাজছে গির্জের ঘণ্টা। গুরুগম্ভীর নিনাদ রোমাঞ্চকর আনন্দের শিহরণ তুলছে। আমার অণু-পরমাণুতে। আমি বিভোর হয়ে যেন স্বপনের ঘোরে দেখছি ঘণ্টায় ঘন্টায় সময়ের বাজনা বাজিয়ে গথিক ভাস্কর্যের বিশাল ওই গির্জে সজাগ প্রহরা দিয়ে চলেছে ধূসর পরিবেশে ঘুমন্ত প্রাসাদের পর প্রাসাদকে।

মনে পড়েছে স্কুলের ছোট ঘটনাগুলো। এত কষ্টে আছি যে খুঁটিয়ে সব কথা বলতে পারব না। সে ক্ষমতা আর নেই। তবে হ্যাঁ, তখন যে ব্যাপারগুলোকে তুচ্ছ আর হাস্যকর মনে

হয়েছিল, পরে বুঝেছিলাম, সেগুলো আমোঘ নিয়তির পূর্ব ছায়া। নিষ্ঠুর নিয়তির সেই ছায়াভাস এখন আমার দিকদিগন্ত জুড়ে রয়েছে। আমি শেষ হতে চলেছি।

আগেই বলেছি, স্কুল বাড়িটা রীতিমতো বুড়ো। ছিরিছাদের বালাই নেই বাড়ির নকশার মধ্যে। মাঠময়দানের কিন্তু অভাব নেই। নেচেকুঁদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়ি আর মাঠ-টাঠগুলোকে ঘিরে রেখেছে খুব উঁচু একটা নিরেট ইটের পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় চুন-সুরকি বালির পুরু পলস্তারা। সেই পলস্তারায় গাঁথা রয়েছে খোঁচা খোঁচা ভাঙা কাঁচ। পুরো তল্লাটটা কেল্লার মতো করে তৈরি। আমাদের কাছে মনে হতো ঠিক যেন একটা পেল্লায় কয়েদখানা। এবং পাঁচিলের ভেতরের অঞ্চল টুকুই ছিল আমাদের জগৎ। হপ্তায় তিনবার দেখতে পেতাম পাচিলের বাইরের জগত্টাকে।

শনিবার বিকেলে দুজন মাতব্বরের সঙ্গে দল বেঁধে হন হন করে হাঁটতে যেতাম আশপাশের মাঠে। রবিবারে বেরোতাম দুবার একইভাবে মাতব্বর দুজন চরাতে নিয়ে যেত স্কুলের সব্বাইকে।

একবার বেরোতাম সকালে মাঠে-মাঠে চর্কিপাক দিতে; আর একবার বেরোতাম সন্ধ্যানাগাদ তখন যেতাম গাঁয়ের একমাত্র গির্জের উপাসনায় অংশ নিতে। গির্জার পুরোহিত ছিলেন আমাদেরই স্কুলের অধ্যক্ষ।

গ্যালারীতে বসে অনেক দূর থেকে দেখতাম তিনি পায়ে পায়ে উঠছেন বেদীর ওপর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম সেদিকে। কিরকম জানি সব গোলমাল হয়ে যেত মাথার ভেতরটা। দেবদূতের মতো ওঁর চেহারাটা দেখে মনে হতো যেন দেবলোক থেকে নেমে এলেন এইমাত্র। কিন্তু ভাবতেও পারতাম না দেবসুন্দর এই মানুষটাই বেত নাচিয়ে অমন নির্দয় ভাবে কি ভাবে শাসন করেন আমাদের স্কুলে পৌঁছেই।

চীনের প্রাচীরের মতো টানা লম্বা বিশাল এই পাঁচিলের এক জায়গায় যেন ভুরু কুঁচকে কপালে অজস্র ভাঁজ ফেলে কটমট করে আমাদের দিকে চেয়ে থাকত পাঁচিলের চাইতেও প্রকান্ড একটা ফটক। ফটক না বলে তাকে লোহার পাত আর বন্টু আঁটা একটা বিকট দৈত্য বলা উচিত। কাঁটাওলা দৈত্য বললে আরও ভাল হয়। কেননা, তার সারা গা থেকে ঠেলে বেরিয়ে থাকত খোঁচা খোঁচা বল্লমের ফলা। ভয়ঙ্কর চেহারার এই ফটকটাকে দেখলেই বুক গুর গুর করে উঠত আমার।

সপ্তাহে তিনবার আমাদের কুচকাওয়াজ করে বের করার জন্যে, তিনবার একই ভাবে ঢোকাবার জন্যে। সেই সময়ে বিশাল কজাগুলোর প্রতিটার কাঁচ কাঁচ আওয়াজ কান পেতে শুনতাম আমি। অদ্ভুত সেই আওয়াজে আমার গা শিরশির করত ঠিকই — তবুও কান খাড়া করে থাকতাম। কেন জানি মনে হতো, কাঁচ কাঁচানিগুলো আসলে কদাকার ওই গেট-দানবের মনের কথা অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে প্রতিটা বিশ্রী শব্দের মধ্যে।

বেজায় বুড়ো স্কুল বাড়িটার কোথাও যে কোনো ছন্দ ছিল না। পুরো স্কুল চৌহদ্দিটাই ঠিক এরকম ছন্দহীন, বেখাপ্পা, এলোমেলো। এরই মধ্যে। তিন-চারটে বড়-সড় মাঠকে আমরা খেলার মাঠ বানিয়ে নিয়েছিলাম। খুব মিহি কাঁকর দিয়ে সমতল করে রাখা হয়েছিল মাঠগুলোকে। আশ মিটিয়ে লাফ ঝপ করতাম এখানেই। অন্য কোথাও নয়।

খেলার মাঠগুলো ছিল স্কুল-বাড়ির পেছন দিকে। কাঁকর ছাড়া আর কিছুর বালাই সেখানে ছিল না। গাছ বা বেঞ্চি তো নয়ই। সে তুলনায় বেশ সাজানো-গোছানো ছিল বাড়ির সামনের দিকটা। বাস্কের মধ্যে থাকত ফুলগাছ, ঝোঁপঝাড়গুলোও কেটে ছেটে কায়দা করে রাখা হয়েছিল। কালেভদ্রে এখান দিয়ে যেতাম আমরা।

যেমন–ধরুন, স্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার সময়ে, অথবা স্কুলের পাঠ চুকিয়ে একেবারে চলে যাওয়ার সময়ে, অথবা কারও বাবা-মা কিম্বা বন্ধুবান্ধব এলে। ছুটিছাটার সময়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময়ে খুশির প্রাণ গড়ের মাঠ হয়ে যেত এক টুকরো সাজানো এই বাগানটার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

মাঠ-ঘাট, পাঁচিল আর ফটককে কিন্তু টেক্কা দিয়েছে খোদ বাড়িটা। আদ্দিকালের এই বাড়ির আগাপাশতলা আজও একটা বিরাট রহস্য হয়ে রয়ে গেছে আমার কাছে। মোট পাঁচটা বছর কাটিয়েছি এই বাড়িতে। পাঁচ বছরেও ভালভাবে চিনে উঠতে পারিনি ঠিক কোন চুলোয় আছে আমার নিজের ঘর, অথবা আরও আঠারো জন ছেলের ঘর। বিদঘুঁটে এই বাড়ি যার। পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে, তার মাথায় গোলমাল ছিল নিশ্চয়। নইলে

এত সিঁড়ি বানাতে গেলেন কেন? একটা ঘর থেকে বেরোতে গেলে, অথবা অন্য একটা ঘরে ঢুকতে গেলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা না করলেই নয়। গলিপথেরও অন্ত নেই। বুড়ো বাড়ির শাখা-প্রশাখার যেমন শেষ নেই, অলিগলিরও তেমনি গোনাগাঁথা নেই।

কে যে কখন কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, কোথায় শুরু হয়ে কোথায় শেষ হচ্ছে– তা পাঁচ বছরেও হিসেবের মধ্যে আনতে পারিনি বলেই আজও মনে হয় আদি অন্তহীন অসীমকে কেউ যদি কল্পনায় আনতে চান বুড়ো বিটকেল স্কুল-বাড়িটায় ঢুকে যেন একবার পথ হারিয়ে আসেন। যেমন পথ হারাতাম আমি বহুবার বহুবার!

বটবৃক্ষের মতন সুপ্রাচীন এই স্কুল-ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ঘর ছিল একটাই– স্কুল-ঘর। আমার তো মনে হয়, তামাম দুনিয়া ঘুড়লেও এতবড় স্কুল-ঘর আর পাওয়া যাবে না। শুধু বড় বলেই নয়- পেল্লায় এই ঘরখানাকে কোনোকালেই ভুলতে পারব না এর হাড়-হিম করা চেহারার জন্যে। ঘরটা খু-উ-উ-ব লম্বা, বেজায় সরু এবং দারুণ নিচু। একটা মাত্র ওক কাঠের কড়িকাঠ ঠেকিয়ে রেখেছে মাথার ওপরকার ছাদ।

দুপাশের গথিক জানালাগুলো দেখলেই মনে পড়ে যায় সেকালের অসভ্য বর্বর গথ মানুষদের কথা –যাদের নাম থেকে এসেছে গথিক শব্দটা। টানা লম্বা এই তেপান্তর-সম ঘর অনেক দূরে যেখানে একটি মাত্র মোড় নিয়েছে, ঠিক সেইখানে আছে একটা চৌকোনা ঘেরা জায়গা– তার এক-একটা দিক আট থেকে দশ ফুট তো বটেই। পবিত্র

এই ঘেরাটোপে বসে গুরুগিরি করার সময়ে চেলাদের সামনে বেত আছড়াতেন আমাদের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ডক্টর ব্রান্সবি। ঘেরাটোপের দরজাটাও বিদঘুঁটে –যেমন বিরাট, তেমনি কদাকার। এ-দরজা যখনই খুলে যেত, বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠত আমাদের সবার। দূর থেকে অবশ্য রীতিমতো সমীহ করে চলতাম গুরুমশায়ের এই পবিত্র জায়গাটাকে।

ভীষণ ভয় হতো প্রায় এই রকমই আরও দুটো ঘেরা জায়গা দেখলে। যে দুজন মাতব্বর আমাদের মার্চ করিয়ে চরাতে নিয়ে যেত মাঠে-ঘাটে, তারা বসত এইখানে। অধ্যক্ষর ঘেরাটোপের অনেক দূরে দূরে এই দুটো ঘেরা জায়গায় একটায় বসত ইংরেজি শেখানোর মাস্টার, আর একটায় অঙ্ক শেখানোর মাস্টার। মাস্টার না বলে রাখাল বলাই উচিত এদের মাঠে চরানোর সময় সেরকমই মনে হতো আমাদের।

টানা লম্বা ঘরখানার বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে রাশিরাশি বেঞ্চি, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড – ভাঙাচোরা এবং বইয়ের পাহাড়। একদিকে বিরাট একটা বালতি ভর্তি জল, আর একটা মান্ধাতার আমলের দানবিক আকৃতির ঘুড়ি। বেঞ্চিগুলোর সারা গায়ে ছুরি দিয়ে খোদাই করা কিম্ভুতকিমাকার ছবি আর অদ্ভুত অদ্ভুত নামধাম নিয়ে গবেষণা করতে করতেই সময় কেটে যেত আমাদের।

এ ঘর থেকেও অলিগলি বেরিয়েছে অসংখ্য –প্রতিটির ভেতরেই পোকায় খাওয়া, রঙজলা বই আর বেঞ্চি। ঝাঁকে ঝাঁকে কত ছেলে এসেছে। এখানে টেবিলে বেঞ্চিতে খোদাই

করে গেছে তাদের কীর্তিকাহিনী। বিকট লম্বা এই ঘরের প্রতিটি ধুলোর কণা যেন তাদের আজও মনে রেখেছে, মনে রাখবে ভবিষ্যতে...

অতিকায় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এইরকম একটা বিদ্যে অর্জন করবার জায়গায় আমার সময় কেটে যেত হু-হুঁ করে। পালাই-পালাই ইচ্ছেটা একেবারেই ছিল না মনের মধ্যে। দিনগুলোকে একঘেয়ে মনে হত না কখনোই, অথবা মেজাজও কখনো খিঁচড়ে থাকত না। এইভাবেই হৈ-চৈ করে এসে পড়লাম তৃতীয় বছরে । ছেলেমানুষের মগজে খেয়াল খুশির শেষ হয় না বলেই দিনগুলো উড়ে যেত প্রজাপতির মতো পাখনা মেলে।

বাইরের জগতের হাসি হররার দরকার হতো না মনটাকে ফুর্তির সায়রে ডুবিয়ে রাখার জন্যে। এটা ঠিক যে স্কুলের জীবনে হাজারো বৈচিত্র্যের ঠাঁই নেই। কিন্তু আমি ওই বয়সেই এমন পেকে উঠেছিলাম যে রোজই কিছু না কিছু আনন্দের খোরাক জুটিয়ে নিতাম। তাছাড়া, অপরাধ করার প্রবণতা তখন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছিল আমার চলনে-বলনে চাউনিতে।

আমার সেই দিনগুলোর স্মৃতি সেই কারণেই এত জ্বলজ্বল করছে মনের অ্যালবামে। ছোট বয়সের সব কথা বড় বয়সে অক্ষরে অক্ষরে সচরাচর কারও মনে থাকে না, জড়িয়ে মুড়িয়ে একটা আবছা বাল্যস্মৃতি হয়ে থেকে যায় এবং তা আরো অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে চুল-দাড়ি পাকার সঙ্গে সঙ্গে। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। কারণ আমি ছিলাম সৃষ্টিছাড়া। ছিলাম অকালপক্ক।

কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, রাত নামলেই বিছানায় ঢুকে পড়ার হুটোপাটি, মেপেজপে আবৃত্তি করা, হাফ-হলিডে, খেলার মাঠে দামালপণা, সঙ্গীদের নিয়ে ষড়যন্ত্র — ঘটনাগুলো নেহাতই একঘেয়ে আর পাঁচজনের কাছে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে মনে রাখার কোনো কারণ নেই–মনেও থাকে না– স্মৃতির খাতায় সব একাকার ধূসর ধোঁয়াটে হয়ে যায়। আমি কিন্তু সব কিছুই মনে রেখেছি আজও। কেননা, রোজকার এই সব ঘটনার মধ্যেই মিশিয়ে রেখেছি আমার আবেগ, উত্তেজনা, উন্মাদনাকে। বৈচিত্র্যকে আমি আবিষ্কার করেছি প্রতি মুহূর্তে। গলা টিপে শেষ করে দিয়েছি একঘেয়েমির।

আমার এই অফুরন্ত উৎসাহই আমাকে আরও আঠারোটা ছেলের মধ্যমণি করে তুলেছিল। আমার কথাবার্তা, চালচলনই বুঝিয়ে দিত, কেউকেটা আমি নই। বয়সে যারা আমার চাইতে বড়, একটু একটু করে তারাও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছিল আমার চরিত্রটাকে– তাই ঘাটাতে চাইত না। শুধু একজন ছাড়া।

এই একজন স্কুলেরই একটি ছেলে। তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা আমার নেই। অথচ আমার যা নাম, তারও তাই নাম। মায়ের পদবীটা পর্যন্ত। হেঁজিপেঁজি ঘরে জন্ম নয় আমার — সাধারণ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতো নামই পাইনি বাবা আর মায়ের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও নামের এই মিলটা এমনই পিলে চমকানো যে ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না। এই সব ভেবেই এই কাহিনীতে উইলিয়াম উইলসন নামে আমার পরিচয় দিয়েছি–মনগড়া ঠিকই–তবে আসল নামটা থেকে খুব একটা দূরে নয়।

যা খুশি করব কে বাধা দেবে আমাকে–আমার এই স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা থেকেই এসেছে দাপুটে স্বভাবটা। স্কুলের অন্য কোনো ছেলে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পেত না– রুখে দাঁড়াতো কেবল একজনেই–আশ্চর্যভাবে যার নামে আমার পুরো নাম। কি পড়াশুনায়, কি খেলাধুলায়–আমার জবরদস্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে প্রত্যেকে– এই ছেলেটি ছাড়া। পদে পদে আমার যা-খুশি হুকুমকে ঘোড়াই কেয়ার করেছে।

হ্যাঁ, সে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে–কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে টেক্কা মারতে যায়নি আমাকে। সবার সামনে অপদস্থ করে বাহাদুরি নিতেও কখনো যায়নি। আর শুধু এই একটা কারণেই আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা থেকেছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক – লাঠালাঠির সম্পর্ক নয়।

উইলসনের বিদ্রোহটা তাই আমার কাছে বড় গোলমেলে ঠেকেছিল। ও যে আমার থেকে সব দিক দিয়েই বড়, তা বুঝতাম বলেই মনে মনে ভয় করতাম। গোটা স্কুলে আমার সমান-সমান হওয়ার ক্ষমতা যে শুধু ওরই আছে, এমনকি আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও ওর আছে– তো শুধু নজরে এনেছিলাম আমিই –স্কুলে বোকাপাঁঠা বন্ধুগুলো তা খেয়ালই করেনি।

আমার সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, আমাকে বাধা দিয়েছে, আমার বহু ষড়যন্ত্র ভন্ডুল করে দিয়েছে কিন্তু কখনোই তা পাঁচজনের সামনে করেনি। আমি দেখেছি, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে আমারই মতো বেপরোয়া, আমার মতনই তার মনবল্গাছেঁড়া বাঁধনহারা। তার খেয়াল খুশির চরমতা আমাকেও চমকে দিয়েছে বারে বারে। অবাকও হয়েছি আমার ওপর ওর একটা চাপা স্নেহ দেখে। সে আমাকে অপমান করেছে, মনে ঘা দিয়েছে, নানা রকমভাবে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করেছে কিন্তু আমার ওপর চাপা স্নেহের ভাবটা সর্বক্ষেত্রেই ফুটে ফুটে বেরিয়েছে। একই সঙ্গে লড়েছে, আবার আগলেও রেখেছে- শায়েস্তা করেছে, আবার জ্বালা জুড়িয়েও দিয়েছে। ওর এই লুকোচুরি খেলাটাই আমার কাছে বিরাট রহস্য হয়ে উঠেছিল। ভেবে পাইনি এটা কী ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চনা।

স্কুলের সকলে কিন্তু ধরে নিয়েছিল আমরা যমজ ভাই। একে তো দুজনেরই নাম হুবহু এক, তার ওপরে ঠিক একই দিনে দুজনেই ভর্তি হয়েছি এই স্কুলে। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম আরও একটা চক্ষুস্থির করার মতো ঘটনা। একই দিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছি আমরা দুজনে– ১৮১৩ সালের জানুয়ারি মাসের বিশেষ একটি দিনে!

আমার পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই উইলসন। অথচ একটা দিনের জন্যেও দুচক্ষের বালি মনে করতে পারিনি। এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন ঝগড়া হয়নি দুজনের মধ্যে। অথচ কথাবার্তা বন্ধ থাকেনি একটা মুহূর্তের জন্যেও। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে গো-হারান হেরেছি আমি কিন্তু ও টিটকিরি দেয়নি– নীরবে নিঃশব্দে শুধু বুঝিয়ে দিয়েছে

শুধু আমাকেই আমি ওর যোগ্য পাল্লাদার নই কোনো মতেই। রেষারেষি ছিল বটে দুজনের মধ্যে কিন্তু শত্রুতা ছিল না।

মতো সে মেজাজী, দাপুটে, দুর্দান্ত অথচ কখনোই আমার ঘাড় মুচড়ে মাথা নিচু করতে যায়নি। এসব কারণেই ওকে মনে মনে ভয় করতাম, সমীহ করতাম, ওর সম্বন্ধে অগাধ কৌতূহলে ফেটে পড়তাম। সব মিলিয়ে স্কুল জীবনে আমরা দুজনে ছিলাম একটা প্রচন্ড জুটি। প্রবল প্রতাপের মানিকজোড়।

অথচ আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে কখনোই ছাড়েনি আমার এই হুবহু জোড়া-টি। চোট দিয়ে গেছে স্রেফ মজা করার ভঙ্গিমাতে –কিন্তু দাগা দিয়েছে মনের একদম ভেতরে। শত্রুতার ছিটেফোঁটাও থাকত না এসব গাড়োয়ালি ঠাট্টা ইয়ার্কির মধ্যে। আমি কিন্তু পাল্টা ঘা মারতে পারতাম না। ঠিক ওরই কায়দায়। আগেভাগে আঁচ করে নিত উইলসন।

যত রেখে ঢেকেই ফন্দি আঁটি না কেন– ওর তা অজানা থাকত না কখনো। জন্মসূত্রে কিছু ত্রুটি আছে আমার শরীরের গঠনে ও তা জানত। এগুলোকে নিয়ে মস্করা করাটা ঠিক নয়। কেউ তা করত না। কিন্তু ও ঠিক এসব ব্যাপারেই বেশি উৎসাহ দেখাত- যেমন, চাপা ফিসফিসানির স্বরে কথা বলা আমার স্বভাব। আমার গলার দোষও বলতে পারেন। উইলসন ঠিক এভাবে, চাপা ফিসফিসানির সুরে কথা বলে যেত আমার সঙ্গে।

শুধু এই নয়, আমাকে খোঁচা মারা আরও অনেক পন্থা উদ্ভাবন করেছিল এই উইলসন। ঠিক আমার মতো কেউ হাঁটুক, কথা বলুক- এটা সহ্য করতে পারতাম না কোনদিন। বিশেষ বিশেষ কিছু শব্দ অন্য কেউ বললে আমার পিত্তি জ্বলে যেত। এগুলো ছিল আমার একেবারেই নিজস্ব। উইলসন অনায়াসে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করত, একই ভঙ্গিতে হাঁটত, একইভাবে কথা বলত। নাম যার এক, একই দিনে যার একই স্কুলে আগমন, সে যদি এভাবে আমাকে নকল করে যায় দিনের পর দিন মাথা কি ঠিক রাখা যায়?

তখনও জানতাম না –দুজনের বয়সও এক। শুধু দেখতাম, মাথায় দুজনেই সমান ঢ্যাঙা, মুখের চেহারাও বলতে গেলে একই রকম– কথাও বলত আমার কথা বলার ঢঙে চাপা ফিসফিসানির সুরে । ও জানত, এসব ব্যাপারই আমার অপছন্দ, রেগে যাচ্ছি মনে মনে তা সত্ত্বেও খুব সূক্ষ্মভাবে খোঁচা মেরে যেত আমার মনের একদম মধ্যিখানে। তাইতেই ওর তৃপ্তি। তাইতেই ওর শান্তি।

আমি যে ধরনের জামাকাপড় পরতাম, সেগুলোকে পর্যন্ত নকল করত এই উইলসন। হুবহু আমি হয়ে হাঁটত, হাসত। কথা বলত আমারই ভাঙা গলার অনুকরণে। কাহাতক এই ব্যঙ্গ সহ্য করা যায়?

অথচ একে ঠিক ব্যঙ্গও বলা যায় না। ও তো পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার নকল সাজতে যায়নি। শুধু আমাকে গোপনে বুঝিয়ে দিয়েছে অনায়াসেই ও আমার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে আমাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে।

ব্যাপারে জিতে গিয়ে সবার সামনে নিজেকে জাহির করতে চায়নি– জয়ের পুরস্কার ছিল ওর কাছে পরম তাচ্ছিল্যের ব্যাপার-কিন্তু আড়ালে আমাকে ঘা মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে, পদে পদে এভাবেই ও জয়ের মুকুট পরে যাবে আমাকে একধাপ নিচে নামিয়ে রাখবে। তখন দেখেছি ওর ঠোঁটের কোণে অতি মিহি এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাসি। আমার মনের ভেতরে ভয়ানক বিষ ছোবল মেরে মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে ও যে কী আনন্দ পেত তা বলে বোঝাতে পারব না।

আগেই বলেছি আমার সব কাজে বাগড়া দিলেও এই উইলসনই কিন্তু আমাকে বিপদ-আপদ থেকে আগলেও রাখত। যত দিন গেছে, ততই দেখেছি, ওর এই উপদেশ দেওয়ার ঝোঁকটা বেড়েই চলেছে। উপদেশগুলোও হতো নিখাদ বয়েসের অনুপাতে সব দিক দিয়েই অদ্ভুতভাবে অনেক জ্ঞান আর বুদ্ধি মাথার মধ্যে ঠেসে রেখে দিয়েছিল উইলসন।

তখন জ্ঞানবুদ্ধির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিত আমার ওপর। আজ বুঝতে পারছি, ওর সেই ধারালো বুদ্ধির কথামতো যদি জীবনটাকে চালাতাম, তাহলে এত ভোগান্তিতে পড়তে হতো না। অনেক সুখে থাকতাম।

যাহোক উইলসনের এই খবরদারি শেষ পর্যন্ত চরমে উঠল। আর আমি মুখ বুজে সয়ে যেতে পারলাম না। মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে গেছি রোজই। মুখের ওপরেই বলে

দিয়েছি, ঔদ্ধত্য সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। স্কুল জীবনের প্রথম দিকে মোটামুটি একটা বনিবনা ছিল দুজনের মধ্যে আগেই তা বলেছি।

কিন্তু শেষের দিকে ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠল সম্পর্ক। ধীর স্থিরভাবে ও যতই খবরদারি চালিয়ে গেছে আমার ওপর, ততই বিদ্বেষ জমাট হয়েছে আমার মনের মধ্যে। ধীরে ধীরে বিদ্বেষের বিষ ঘৃণার রূপ নিয়েছে। মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করেছি উইলসনকে। ও তা লক্ষ্য করেছে বিশেষ একটা ঘটনার সময়ে এবং তার পর থেকেই এড়িয়ে থেকেছে আমাকে, অথবা এড়িয়ে থাকার অভিনয় করে গেছে।

যতদূর মনে পড়ে, প্রায় এই সময়েই, একবার কি একটা ব্যাপারে ভয়ানক কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। রেগে গেলে আমি কোনোদিনই মাথা ঠিক রাখতে পারি না সেদিনও পারিনি। কিন্তু রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম উইলসনকেও মাথা গরম করে ফেলতে দেখে। আর ঠিক তখনি ও যেভাবে যে ভাষায় আমার সঙ্গে ঝড়ের বেগে কথা চালিয়ে গেছিল, তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পেয়েছিলাম আমার একদম ছেলেবেলার দিনগুলোর। ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলাম আসলে এই কারণেই।

ভুলে যাওয়া দিনগুলোয় আমি ঠিক যেরকম ছিলাম, যেভাবে হাত-পা ড়তাম, যেভাবে গলাবাজি করতাম, যেভাবে চোখ পাকাতাম-হুঁবহু সেই ভাবে উইলসনকেও তর্জন গর্জন করতে দেখে আমি হকচকিয়ে গেছিলাম। ছোট্ট বয়সের আমিকেই দেখেছিলাম আমার সামনে পাল্লা দিয়ে যে দাঁত কিড়মিড়িয়ে যাচ্ছে আমারই সঙ্গে! আশ্চর্য! অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য!

বিশাল কিম্ভুতকিমাকার বাড়িটায় শাখা-প্রশাখা ছিল অগুন্তি — আগেই বলেছি। চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দেওয়া একটা মহীরুহ বললেই চলে। এক-একটা শাখা আবার মহলের পর মহল জুড়ে এগিয়েই গেছে দূর হতে দূরে। ঘরের পর ঘর। যাতায়াতের রাস্তাও ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে। অদরকারী কোণ আর ফাঁকগুলোকেও কাজে লাগিয়েছিলেন মিতব্যয়ী অধ্যক্ষ। প্রতিটায় তৈরি করেছিলেন একটা করে খুপরি-ঘর। এই রকমই একটা পায়রার খোপে থাকত উইলসন। একাই থাকত। এসব ঘরে একজনের বেশি থাকা সম্ভব ছিল না।

আমি তখন পঞ্চম বছরে পড়ছি। এই সময়েই একদিন তুমুল বচসা হয়ে গেছিল উইলসনের সঙ্গে। মাথায় আগুন ধরে যায় আমার। স্থির থাকতে পারেনি উইলসন নিজেও। ঘটনাটা একটু আগেই বলেছি। রাত ঘনাতেই আমি ঠিক করলাম উইলসনের ঘরে হানা দেব। স্কুলের সব্বাই তখন ঘুমিয়ে কাদা। মটকা মেরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর উঠে পড়লাম।

একটি মাত্র ল্যাম্প হাতে নিয়ে অলিগলির গোলকধাঁধা পেরিয়ে পা টিপে টিপে চললাম আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘরের দিকে। অনেক সয়েছি–এবার এক হাত নেবই নেব। ফন্দিটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল অনেকদিন ধরেই। সাহসে কুলিয়ে ওঠেনি এতদিন। সেই রাতে মন শক্ত করলাম। বিদ্বেষ-বিষ আমার মধ্যে কতখানি জমেছে, তা ওর জানা

দরকার। ছোবল মেরে মেরে অনেক বিষ ঢেলেছে আমার মনের মধ্যে তার কিছুটা উগরে দেবই। এবং তা ভয়ানক ভাবে।

খুপরি ঘরের সামনে পৌঁছে ল্যাম্পটা রাখলাম বাইরে। কাগজের ঢাকা দিয়ে রাখলাম ওপরে। তারপর ঠিক বেড়ালের মতো এতটুকু শব্দ না করে ঢুকলাম ঘরের ভেতরে।

একটা পা সামনে ফেলেই কান খাড়া করে শুনেছিলাম ধীর স্থির শান্ত ভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ফেলছে উইলসন। বুঝলাম, ঘুমোচ্ছে অঘোরে। তাই বেরিয়ে এলাম বাইরে। ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে এগোলাম ওর খাটের দিকে। পর্দা ঝুলছিল বিছানার চারপাশে। ফন্দিমাফিক একহাতে বাতি ধরে, আর এক হাতে একটু একটু করে সরালাম পর্দা। বাতির জোরালো আলো গিয়ে পড়ল ওর ঘুমন্ত মুখের ওপর– একই সঙ্গে আমার চাহনিও আটকে গেল ওর মুখে।

যা দেখলাম, তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন বরফের মতো কনকনে ঠান্ডায় মুহূর্তের মধ্যে অসাড় হয়ে গেল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ঘন ঘন উঠতে আর নামতে লাগল বুকের খাঁচা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল দুটো হাঁটু। নামহীন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল আমার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে নিমেষের মধ্যে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। খাবি খাচ্ছিলাম। সেই অবস্থাতেই বাতিটা আরও একটু নামিয়ে এনেছিলাম ঘুমন্ত মুখখানার আরও কাছে।

সারা মুখ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সুস্পষ্ট রেখাগুলোর দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলাম... আর চেয়েছিলাম। মুখাবয়বের পরতে পরতে এই যে এই দাগ আর রেখা– এগুলো কি সত্যিই উইলিয়াম উইলসনের? এত কাছ থেকে চোখের ভুল হতে পারে না।

স্পষ্ট দেখছি, দাগ আর বিশেষ বিশেষ রেখাগুলো সবই জ্বলজ্বল করছে। ওর মুখ জুড়ে– তবুও ঘোরের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন ভুল দেখছি- এই দাগ আর এই রেখা, চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোঁ বোঁ করতে লাগল মাথা। তবুও চেয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে–চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছি।

এ আমি কি দেখছি! লক্ষ লক্ষ উদ্ভট চিন্তা তালগোল পাকিয়ে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিল মগজের কোষে কোষে। কখনো না...কখনো এই মুখ, এই সব চিহ্ন উইলিয়াম উইলসনের হতে পারে না। জেগে থেকে পদে পদে আমাকে অনুকরণ করার পরিণামই কি এহেন রূপান্তর!

এক নাম! এক উচ্চতা! মুখের আদল একই রকম! একই দিনে স্কুলে ভর্তি হওয়া! তারপর থেকেই চিনে জোঁকের মতো আমার মতোই হতে চেয়েছে; আমার চলাফেরা, আমার কথা বলা, আমার স্বভাবচরিত্র, আমার গলার স্বর হুবহু নকল করে গেছে শাণিত স্নেহের হাসি হেসে। ও যা হতে চেয়েছে, ঘুমন্ত অবস্থায় অবিকল তাই হয়ে গেছে! কিন্তু তাও কি সম্ভব? জাগ্রত অবস্থায় মন প্রাণ দিয়ে কারও সব কিছু নকল করে গেলেই কি ঘুমন্ত অবস্থায় নকলটা আসল হয়ে যেতে পারে? পার্থিব দুনিয়ায় কি এমনটা হতে পারে?

নাকি, আমি নিজেই পাগল হয়ে গেছি! অপার্থিব বিভীষিকা দেখছি বলেও তো মনে হয় না!

বিষম ত্রাসে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল আমার সারা শরীর। বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে পেরিয়ে এলাম চৌকাঠ এবং আর একটা মিনিটও দেরি না করে তৎক্ষণাৎ চম্পট দিলাম স্কুল থেকে জীবনে আর ফিরে যাইনি সেখানে।

.

কয়েকটা মাস স্রেফ শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম বাবা আর মায়ের কাছে। সীমাহীন আলসেমি আমাকে কুঁড়ের বাদশা করে তুলেছিল এই সময়ে। তারপর ভর্তি হলাম ইটন শিক্ষামন্দিরে। ডক্টর ব্রান্সবির স্কুলের ছুঁচফোঁটানো স্মৃতিগুলো তদ্দিনে ফিকে হয়ে এসেছে। অথবা বলা যায়, স্মৃতিগুলোকে কল্পনার বাড়াবাড়ি বলেই ধরে নিয়েছি।

গোড়াতেই বলেছি, মনে মনে তিলকে তাল করে নেওয়ার প্রবণতা আমার রক্তেই রয়েছে। নিশুতি রাতে ল্যাম্পের আলোয় যা দেখেছি, তাকে কল্পনাশক্তি দিয়ে নিশ্চয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়ে অযথা ভয়ে মরেছি। দুঃসহ স্মৃতিগুলোর যেটুকু রেশ মনের মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে রয়ে গেছিল –ইটনে বেপরোয়া জীবযাপন করার ফলে তা একেবারেই ধুয়ে মুছে গেল।

তিন-তিনটে বছর যেন ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেল আমার জীবনের খাতা থেকে। উচ্ছৃঙ্খলতা কাকে বলে, তা দেখিয়ে দিয়েছি এই তিনটে বছরে। ডুবে থেকেছি পাপ কাজের পাকে। তাতে লাভ কিছুই হয়নি– ক্ষতি ছাড়া শরীরেও ভাঙন ধরেছিল একটু একটু করে।

শেষের দিকে একটা গোপন আড্ডায় জমায়েত করলাম আমার খারাপ কাজের সঙ্গীদের। আচ্ছা বসল আমারই ঘরে গভীর রাতে। তাসের। জুয়োয় মেতে উঠলাম, মদের নেশায় চুর চুর হলাম। শিরায় উপশিরায় রক্তের মধ্যে যখন তুফান জেগেছে, উন্মাদের অট্টহাসি হেসে ঘরের চার দেওয়ালে প্রায় চৌচির করে দিয়ে আরও মদ, আরও মদ করে চেঁচাচ্ছি ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক শব্দে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল একজন ভৃত্য –এক্ষুনি আমাকে আসতে হবে নিচের হলঘরে দেখা করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক–তার আর তর সইছে না।

আচমকা বাধা পাওয়ায় মোটেই অবাক হইনি–বরং মজা পেয়েছিলাম। মদিরার প্রলয়-নাচান যখন মগজের প্রতিটি কোষকে বেদম বেহেড করে তুলেছে, ঠিক সেই সময়ে কে এই উটকো উৎপাত, তা দেখবার জন্যে তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেছিলাম ঘর থেকে।

টিমটিম করে একটা মাত্র বাতি জ্বলছিল বাইরের গলিপথে। সে আলোয় একহাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। তবে ঘুলঘুলি দিয়ে আসছিল ভোরের আলো। সেই দেখেই বুঝলাম, মদ খেয়ে আর তাস খেলে রাত ভোর করে দিয়েছি।

নিভুনিভু আলোয় হলঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম একজন যুবককে। উচ্চতায় সে আমার মতনই। পরনে যে হালফ্যাশনের সাদা রঙের ফ্রক কোট রয়েছে, সেটাও হুবহু আমার গায়ের ফ্রক-কোটের মতনই। আধো অন্ধকারে শুধু এইটুকুই দেখেছিলাম। তার মুখ দেখতে পাইনি। কেননা, আলো পড়ছিল না মুখে।

আমাকে দেখেই সে এস্তে ছুটে এল আমার দিকে। অধীর ভাবে খামচে ধরল আমার বাহু। কানের কাছে মুখটা এনে বলল চাপা, ভাঙা গলায় –উইলিয়াম উইলসন।

পলকের মধ্যে নেশা ছুটে গেল আমার।

আগন্তুক সেই মুহূর্তে তার তর্জনী তুলে ধরেছে আমার চোখের সামনে। ব্রেনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে তার চাপা শাসানি। কিন্তু এ যে সেই গলা, সেই সুর, সেই উচ্চারণ। কেটে কেটে প্রতিটি অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে কথা বলার এই ঢঙ তো ভোলবার নয়। চোখের সামনে আঙুল নেড়ে বাহু খামচে ধরে আমার ঘোর কাটিয়ে দেওয়ার এই পন্থা তো আগেও ঘটেছে। আজ থেকে তিন বছর আগে!

অনেক উদ্দামতার তলায় চাপা পড়া অতি-ক্ষীণ স্মৃতিগুলো অকস্মাৎ আশ্চর্য রোশনাই ছড়িয়ে ভেসে উঠল আমার মনে। চকিতের জন্যে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিঃসাড়

হয়ে গেছিল আমার সব কটা ইন্দ্রিয়। পরক্ষণেই ধাতস্থ হলাম বটে কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলাম না। বাতাসের বেগে উধাও হয়ে গেছে আমার হুঁশ ফেরার আগেই।

ঘটনাটা প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল আমাকে। মদে আচ্ছন্ন ছিলাম ঠিকই, পাগলা ঘোড়ার মতোই আমার কল্পনাশক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে, তবে যা দেখেছি আর যা শুনেছি তা ভুল নয়। চোখ বা কানের বিভ্রম নয়।

কে এই উইলিয়াম উইলসন? আমি যেদিন ডক্টর ব্রান্সবির স্কুল ছেড়ে চম্পট দিইতার পরের দিনই উইলসনও স্কুল ছেড়ে বাড়ি চলে গেছিল ফ্যামিলিতে একটা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে। এইটুকু খবরই শুধু রাখতাম। তারপর সে কোন চুলোয় আছে, কী করে বেড়াচ্ছে– কিসসু খবর পাইনি। রাখবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু সেদিন রাতভোরে আমি যখন নরক-গুলজার করে চলেছি– ঠিক সেই সময়ে ধূমকেতুর মতো এসে অতীত দিনগুলোর মতো আমার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেই চকিতে আবার উধাও হয়ে গেল কেন?

চকিত-ধাক্কা হলেও, নড়ে গেছিল আমার মনের ভিত পর্যন্ত। ইটনের শিক্ষায়তন ছেড়ে দিলাম এর পরেই গেলাম অক্সফোর্ডে। আমার কোনো

অভিলাষেই অন্তরায় হননি আমার দুর্বলচিত্ত বাবা আর মা। সেবারেও হতে পারলেন না। উল্টো থাকা-খাওয়ার মাসিক ব্যবস্থা করে দিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের আমীর-ওমরাদের

উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশে গোল্লায় যাওয়ার পথ এই ভাবেই তৈরি করে দিলেন আমার জনক এবং জননী।

চুটিয়ে কাজে লাগালাম সব কটা সুযোগ-সুবিধেকে। গ্রেট ব্রিটেনের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেলেল্লাপনা হয়নি- যা আমি করে গেছি অক্সফোর্ডে। নষ্টামির নানান ফন্দি রোজই গড়িয়ে উঠত আমার কু-মগজে এবং তার প্রতিটিতে ইন্ধন জুগিয়ে গেছে আমার নারকীয় সহচরেরা।

টাকা-পয়সা উড়িয়েছি খোলামকুচির মতো একটার পর একটা পাপ কাজ করে গেছি মনের আশ মিটিয়ে। সে সবের ফিরিস্তি দিয়ে পাঠকের পরিচ্ছন্ন রুচিবোধকে আঘাত দিতে চাই না।

শুধু এইটুকু বলব যে, এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতেই পঙ্কিল জীবন যাপনের নরক-আনন্দকে আরও তুঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তাসের হাত-সাফাই জুয়োর ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলাম আমি। উকট আনন্দ পেতাম এই নোংরামিতে– সেই সঙ্গে ঝমঝমিয়ে টাকার স্রোত ঢুকে যেত আমার সব কটা পকেটে। টাকার তো আমার অভাব ছিল না।

আমাকে গুড়ের কলসী মনে করে যে নির্বোধগুলো ভনভনিয়ে ঘুরত আমার চারপাশে, তাসের জুয়োয় জোচ্চুরি করে তাদেরকেই দোহন করতাম। এইভাবেই দিনে দিনে উঁচু

হচ্ছিল আমার টাকার পাহাড়। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলাম জোচ্চুরি খেলায় এবং আবিষ্কার করেছিলাম বহুবিধ কসরৎ।

তাসের ভেল্কী আর নানান পাপাচারে পোক্ত হতে হতেই কেটে গেল দুটো বছর। তারপর ইউনিভার্সিটিতে এল সম্ভ্রান্ত এক যুবাপুরুষ। তার নাম লর্ড গ্লেনডিনিঙ। দেদার টাকার মালিক গুনে গেঁথেও নাকি শেষ করা যায় না। এই খবর কানে আসতেই চনমনে হয়ে উঠল আমার লোভী সত্ত্বা। নতুন কুবেরকে কায়দায় আনবার ফন্দিফিকিরে ব্যস্ত হলো মগজ। বার কয়েক টেনে আনলাম তাকে আমার তাসের জুয়োয়।

জুয়ারী কৌশল বিস্তার করে প্রতিবারেই কিছু টাকা জিতিয়েও দিলাম । জুয়া-শিল্পে চৌকস শিল্পীরা এইভাবেই শিকারকে ফাঁদে ফেলে। তারপর যখন দেখলাম জুয়োর নেশা বেশ জমেছে এবং তাস খেলে টাকা উপায় করার শিল্পে নিজেকে বড় শিল্পী বলে মনে করছে গ্লেনডিনিঙ, তখন একটা ছোট্ট পার্টির আয়োজন করলাম আমারই এক বন্ধু মিস্টার প্রেসটন-এর বাড়িতে। সেখানে যে শেষকালে তাসখেলা হবে, তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিলাম না। এমনকি মিস্টার প্রেসটন আমার হরিহর আত্মা বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁকে অন্ধকারেই রেখে দিলাম।

সবাই জানল, পার্টিতে শুধু খাওয়া-দাওয়া হবে, একটু-আধটু হৈ-হল্লা ফুর্তি হবে তার বেশি কিছু না সাত-আট জন কলেজ-বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলাম বটে কিন্তু তাদেরও কেউ জানল না আমার মূল অভিপ্রায়।

শুধু আমিই জানতাম আমার ক্রুর অভিসন্ধির আগাগোড়া। টাকার কুমীর গ্লেনডিনিঙকে ভেঙে চুরমার করে দেব এই খেলায়।

খানাপিনা শেষ হওয়ার পর আকণ্ঠ মদিরা-সেবন করলাম প্রত্যেকেই । মাথার মধ্যে রিমঝিম রিমঝিম বাদ্যি শুরু হয়ে যেতেই তাসের নেশা মাথাচাড়া দিল গ্লেনডিনিঙ-এর মগজে। আলগা কথার মধ্য দিয়ে জুয়োর প্রসঙ্গটা আমিই এনে ছিলাম মদের আড্ডায়। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টাকার কুমীর। শুরু হয়ে গেল সর্বনাশা খেলা।

শুরু হয়েছিল সবাইকে নিয়েই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ছলচাতুরির জাল বিছিয়ে আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করালাম শুধ গ্লেনডিনিঙ-কেই। দেখলাম, ওর সারা মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মদের নেশা আর খেলার উত্তেজনায়। পর-পর কয়েক দান খেলে গেলাম ঠান্ডা মাথায়। প্রতিবারেই বাজি হারল গ্লেনডিনিঙ এবং গনগনে হয়ে উঠল গোটা মুখ। জেতার নেশায় ও তখন আত্মহারা।

ওষুধ ধরেছে বুঝলাম এবং আর খেলতে চাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল ধনকুবের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি বেঁকে বসলাম খেলব না কিছুতেই। হেরে যাওয়ার এই ঝোঁক কাটিয়ে ওঠা উচিত গ্লেনডিনিঙের।

ও কিন্তু তার স্বরে বাজি ধরল দ্বিগুণ। আর সবাই অবাক হলেও আমি হলাম না। আমি তো জানি, এ-রোগের এই পরিণতিই হয়। যতই নিঃস্ব হতে চলেছে, ততই রাগ চেপে যাচ্ছে গ্লেনডিনিঙের। যেন নিমরাজী হয়ে তাস ভাগ করলাম। খেলা শুরু করলাম। শেষও করলাম। গো-হারান হেরে গেল গ্লেনডিনিঙ। এবং সেই প্রথম অবাক হলাম ওর মুখের রক্তরাঙা ভাবটা লক্ষ্য করে। একী নিছক মদের রক্তোচ্ছ্বাস, না, ফতুর হওয়ার পূর্বাভাস? আবার তাস সরিয়ে নিলাম কিন্তু গোঁ ধরে বসল ধনকুবের-নন্দন। খেলতেই হবে। এবার আরও দ্বিগুণ বাজি। ঘরশুদ্ধ সবাই হতভম্ব। আমি নিজেও একটু হকচকিয়ে গেলাম গ্লেনডিনিঙের মুখের অকস্মাৎ পান্ডুরাভা লক্ষ্য করে। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে মুখখানা। ও যে প্রচন্ড বড়লোক, এ খবর নিয়েই তো জালে জড়িয়েছি এত অল্পে ভেঙে পড়বে, তা জানতাম না। এ-খেলাও শেষ হলো আমার হাতের কারসাজি মতোই। সমস্ত রক্ত নেমে গেল গ্লেনডিনিঙের মুখ থেকে।

ঘর নিস্তব্দ। প্রত্যেকেই নিশ্চুপ। ভর্ৎসনা মিশোনো জোড়া জোড়া চোখ নিবদ্ধ আমার ওপর। অসহ্য উদ্বেগ চেপে বসেছে আমার বুকের মধ্যে। দুঃসহ এই বোঝা ক্ষণিকের জন্যে লঘু হয়ে গেল আচম্বিতে ঘরের ভাবি দরজার পাল্লা দুটো দু-হাট হয়ে খুলে যাওয়ায়।

দমকা হাওয়ায় একই সঙ্গে নিভে গেল ঘরের সব কটা মোমবাতি। নিভবার মুখেই দেখতে পেলাম খোলা দরজা দিয়ে মূর্তিমান প্রহেলিকার মতোই ঝড়ের বেগে ঘরে আবির্ভূত হয়েছে এক লোক। মাথায় সে আমার সমান। আমার আলখাল্লার মতনই

একটা আলখাল্লা দিয়ে ঘিরে রয়েছে অবয়ব। মোমবাতিগুলো ততক্ষণে নিভে গেছে। সলতেগুলোয় মরা আগুন লেগে রয়েছে। সেই আলোতেই নিবিড় তিমির ঘরের মধ্যে চেপে বসতে পারছে না। তাই ঠাহর করেছিলাম আমাদের ঠিক মধ্যিখানে এসে খাড়া হয়ে রয়েছে অন্ধকারের আগন্তুক। নিতান্ত অসভ্যের মতো এহেন অনধিকার প্রবেশের জবাবদিহি চাইবার আগেই শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর।

এ-সেই কণ্ঠস্বর যার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। এ-সেই নিচু খাদের অতি-সুস্পষ্ট চাপা ফিসফিসানি যার প্রতিটি অনুরণন কাঁপালিকের মন্ত্রোচ্চারণের অমোঘ প্রতিক্রিয়ার মতনই হাড় হিম করে দিল আমার। কেটে কেটে অন্তরের গহনতম অন্দরেও বসে গেল এই কটি কথা!

জেন্টলমেন, অসৌজন্যের জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এই অভব্য আচরণ করতে বাধ্য হয়েছি শুধু একটা কর্তব্য পালনের জন্যে। আপনারা জানেন না, কেউই জানেন না – আজ রাতের খেলার নায়কের সত্যিকারের চরিত্রটা কি। অত্যন্ত বিনীতভাবে শুধু এই তথ্যটি পরিবেশন করার জন্যেই আমার আগমন। অনুগ্রহ করে এবং অবসরমতো আপনারা উইলিয়াম উইলসনের বা আস্তিনের ভেতরকার আস্তর পরীক্ষা করে দেখবেন। এমব্রয়ডারী করা আলোয়ানের মধ্যে লুকানো পকেটগুলো দেখতেও ভুলবেন না। চললাম।

ঘূর্ণিঝড়ের মতোই নিমেষে উধাও হয়ে গেল ক্ষণিকের অতিথি। স্তম্ভিত করে গেল ঘরশুদ্ধ সবাইকে। তারপরেই অবশ্য উচ্চনিনাদী সোরগোলে ফেটে পড়ল ছোট কামরা-খানা। দপ দপ করে জ্বলে উঠল সব কটা মোমবাতি। আমি যখন নিঃসীম আতঙ্কে জবুথবু হয়ে বসে ওরা তখন তল্লাসি চালিয়ে যাচ্ছে আমার কোটের বা আস্তিনের ভেতরের আস্তরে। সেখানকার চোরা পকেট থেকে বের করে ফেলেছে নকল তাস। আলোয়ানের ফুলের কারুকাজের গায়ে গায়ে লুকানো খুপরিগুলো থেকেও বেরিয়েছে জুয়াচোরের জন্য বিশেষ ধরনের তৈরি সব কটা তাস।

নিঃশব্দ সেই ধিক্কারের চাইতে বুঝি গালিগালাজ অনেক সহনীয় ছিল।

হেঁট হয়ে নিজের পায়ের কাছ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান পশুর লোমের আলখাল্লাটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে দিতে দিতে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন গৃহস্বামী মিস্টার প্রেসটন মি. উইলসন, আপনার এই সম্পত্তিটাও নিয়ে যান– জানি না এর ভেতরে আরও কটা খুপরি বানিয়ে রেখেছেন। দয়া করে আপনি অক্সফোর্ড ত্যাগ করবেন কালকেই, এবং তার আগে, এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন এই ঘর থেকে।

কাঁটছাঁট কথায় এই ভাবে গলাধাক্কা দেওয়ার জবাবটা আমি মুখের ওপরেই ছুঁড়ে দিতাম, যদি না আর একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার আমার নজরে আসত। মিস্টার প্রেসটন যে-আলখাল্লাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন ওঁর পায়ের কাছ থেকে, ঠিক ওরকম একটা আলখাল্লা তো আমার হাতেই রয়েছে। হুবহু এক! আমি যে অত্যন্ত খরুচে আর খুঁতখুঁতে স্বভাবের, তা

নিশ্চয় এই কাহিনী পড়ে বোঝা যাচ্ছে। আমার মগজখানাও তত উর্বর কল্পনা আর বিচিত্র খামখেয়ালিপনার একটা মস্ত কারখানা। অতিশয় দুপ্রাপ্য পশুর লোম থেকে তৈরি আশ্চর্য ডিজাইনের এই আলখাল্লা তৈরি হয়েছিল শুধু আমারই ফরমাশ অনুযায়ী। বলাবাহুল্য এ-জিনিসের কপি আর কোথাও থাকতে পারে না। অথচ রাতের আগন্তুক যেখানে এসে দাঁড়িয়ে বচনসুধা শুনিয়ে গেল –ঠিক সেইখান থেকেই অবিকল সেইরকম একটা আলখাল্লা। তুলে বাড়িয়ে ধরেছেন মিঃ প্রেসটন।

পরপর এতগুলো হাড়-হিম করা কান্ড ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি আমি। ঘরের কাউকে দেখতেও দিলাম না যে ঠিক ওইরকম আলখাল্লা ইতিপূর্বেই অন্যমনস্কভাবে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছি আমি। নীরবে দু-নম্বর আলখাল্লাটা মিঃ প্রেসটনের হাত থেকে টেনে নিয়ে চাপা দিলাম আমার নিজের আলখাল্লাটাকে এবং মুচকি হেসে বেপরোয়া ভঙ্গিমায় গটগট করে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। পরের দিনই ভোরের আলো ফোটবার আগেই অক্সফোর্ড ত্যাগ করলাম চিরতরে এবং বেরিয়ে পড়লাম মহাদেশ সফরে।

পালালাম কিন্তু বৃথাই। বিভীষিকার উল্কি-আঁকা আমার হৃদয় সেইদিন থেকে ভয়-তরাসে হয়ে থেকেছে প্রতিটি পল-অনুপল-বিপল। যেখানেই গেছি, সেখানেই ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি রূপে হাজির হয়েছে এই উইলিয়াম উইলসন। প্রতিবারেই নাক গলিয়েছে আমার ব্যাপারে –নাটকীয়ভাবে বানচাল করে দিয়েছে আমার সমস্ত পরিকল্পনা। রহস্যময় এই সত্তা আমারই প্রতিচ্ছায়া হয়ে ঘুরছে আমার পেছন পেছন এবং কাজ হাসিলের ঠিক

মুহূর্তটিতে উল্কাবেগে উপস্থিত হয়ে চুনকালি দিয়ে গেছে আমার মুখে। আমার অপকর্ম নিয়ে যত মাথাব্যথা যেন শুধু ওরই। প্যারিসে পা দিতে না দিতেই হাড় জ্বালিয়েছে।

একটার পর একটা বছর গেছে, কিন্তু নিদারুণ বিরক্তিজনক উইলিয়াম উইলসন নিস্কৃতি দেয়নি আমাকে। সীমা পরিসীমা নেই তার শয়তানির, তার নিরন্তর ধূর্ততার। পালিয়ে গেছি রোমে– সেখানেও সে রেহাই দেয়নি আমাকে। কুটিল ইচ্ছাপূরণের ঠিক মুহূর্তটিতে বিনা নোটিসে আচমকা আবির্ভূত হয়ে লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে আমার পরিকল্পনা! জাল পেতেছি বার্লিনে–ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে শয়তান শিরোমণি এই উইলিয়াম উইলসন।

ঠিক একই ভাবে আমার সাজানো খুঁটি বাঁচিয়ে দিয়েছে মস্কোতে। এ হেন পিশাচকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে ঘৃণা করেছি, ভয়ও পেয়েছি। জঘন্য পোকামাকড়কেও মানুষ বুঝি এত ঘেন্না এত ভয় করে না। কখন কোন্ মুহূর্তে করাল সেই অপচ্ছায়া দেখা দেবে এই ভয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়েছি কিন্তু বৃথা-বৃথা-বৃথা! সে আমার পেছন ছাড়েনি!

মনকে শুধিয়েছি বহুবার কে এই উইলিয়াম উইলসন? কোথায় তার প্রকৃত নিবাস? কি উদ্দেশ্য নিয়ে মুহূর্মুহূ হানা দিয়ে যাচ্ছে আমার প্রতিটি কুকর্মে? কোনো জবাবই পাইনি। খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছি আমার ওপর তার খবরদারির অভিনব পদ্ধতিগুলোকে। লক্ষ্য করেছি যখনই আমি ভয়ানক ভাবে ফেঁসে যাওয়ার মতো খারাপ কাজ করে চলছি ঠিক তখনই সে না বাগড়া দিলে কিন্তু কুখ্যাতির অতলে তলিয়ে যেতাম নির্ঘাৎ।

এটাও লক্ষ্য করেছি– খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি– হুবহু আমার মতনই জামাকাপড় পড়ে এলেও কোনোবারেই সে আমাকে তার মুখ দেখায়নি। হতে পারে, আলো পড়েনি তার মুখে। কিন্তু প্রতিবারেই কী কৌশলে তার মুখাবয়ব ঢেকে রেখে দিয়েছিল আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে সেটাও তো একটা অতলান্ত প্রহেলিকা। :

ইটনে তর্জনী তুলে শাসিয়ে গেছে কিন্তু মুখ দেখায়নি; অক্সফোর্ডে আমার মান ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেছে সেখানেও তার অতর্কিত আর্বিভাবের পূর্ব মুহূর্তে নিভে গেছে সব কটা মোমবাতি যেন এক দানবিক ফুকারে; রোমে সে যেন স্বয়ং বস্ত্র হয়ে নেমে এসে ধ্বংস করে গেছে আমার উচ্চকাঙ্ক্ষা, প্যারিসে নিতে দেয়নি প্রতিশোধ, নেপলসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমার কপট প্রেমের খেলা, মিশরে টেনে ধরেছে আমার লালসার লাগাম। কিন্তু কোনোবারেই সে তাকে চেনবার সুযোগ দেয়নি। এত বড় ধুরন্ধর প্রতিভাটা যে আমার স্কুল জীবনের পরম প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়াম উইলসন স্বয়ং একবারও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার ক্ষীণতম সুযোগও সে আমাকে দেয়নি।

যাক সে কথা। এবার আসা যাক ঘটনাবহুল এই নাটকের শেষ পর্বে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু লিখে গেলাম আমার ওপর উইলিয়াম উইলসনের বাদশাহী প্রতাপের আঁকালো বর্ণনা। তার দাপটে ভয়ে কেঁচো হয়ে যেতাম প্রতিবার। তার শুভ্র সুন্দর চরিত্র, তার হিমালয় সম প্রজ্ঞা, তার সর্বত্র উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা এবং সর্ববিষয়ে তার

অবিশ্বাস্য পারদর্শিতা আমাকে লৌহ-মুরের মতোই ঘা মেরে মেরে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে প্রতিবার। আমার অস্থিমজ্জায় অপরিসীম আতঙ্ক সঞ্চার করে দিয়ে গেছিল সে তার দুর্দম শক্তি দিয়ে আর সীমাহীন দুর্বলতা নিয়ে আমি কেবলই নুয়ে পড়েছি। তার উদ্ধত আকৃতির সামনে, হজম করেছি তার দর্পিত শাসানি।

বেশি সঙ্কুচিত হয়েছি ততই সে হামলে পড়েছে। তিল তিল করে পরিত্রাণের একটা ক্ষীণ সম্ভাবনাকে সযত্নে লালন করে গেছি মনের মধ্যে। এর ঠিক উল্টোটা ঘটালেই তো হয়! নিজেকে একটু একটু করে দাপুটে আর মরিয়া করে ফেললেই তো সে গুটিয়ে যাবে আমার সামনে ঠিক যে ভাবে। আমাকে তার ইচ্ছার গোলাম বানিয়ে রেখেছে– হুবহু সেই ভাবে আমিও তাকে বানিয়ে ফেলব আমার ইচ্ছার গোলাম।

মন শক্ত করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এইবার তাকে গুঁড়িয়ে দেবই আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দিয়ে। ইদানীং বড্ড বেশি সুরা পান করছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি চড়া মেজাজী। সুরা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত। তরল আগুনের প্রকোপে পড়েই বলা যায় পৌঁছে গেলাম পথের কাঁটা তুলে ফেলার চরম সিদ্ধান্তে ।

সুযোগটা পেয়ে গেলাম রোম শহরে। ১৮০০-সালের সেই কার্নিভ্যালের কথা মনে পড়ে? আমি ছিলাম সেখানে। ডিউক ডি-ব্রগলিও একটা মস্ত মাসকারেড পার্টির আয়োজন করেছিলেন তাঁর প্রাসাদে। এ পার্টিতে ছদ্মবেশ পরে যেতে হয়। মুখে থাকে মুখোশ। পরনে অদ্ভুত বেশ। স্রেফ মজা করার জন্যে এই ধরনের আসরে ভিড়ও হয় খুব।

আমার যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল বুড়ো ডিউকের তরুণী ভার্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা। মেয়েটি পরমাসুন্দরী, কিন্তু পতিভক্তি তেমন নেই। উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়। পার্টিতে যেতেই চোখ নাচিয়ে গাঢ় সুরে আমাকে জানিয়ে দিল, একটু ফাঁক পেলেই তার এই বিচিত্র ছদ্মবেশের রহস্যকথা ফাঁস করবে শুধু আমার কাছেই। ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ। মদ খেয়ে যখন চোখ লাল করে ফেলেছি, অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক আর মুখোশ পরা মেয়েপুরুষদের বিরামহীন গুঁতো খেয়ে মেজাজটাকেও ঠিক রাখতে পারছি না–ঠিক এইসময়ে ভিড়ের মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম বৃদ্ধ ওমরাহ-র তরুণী ভার্যাকে। মদির চোখের দারুণ কটাক্ষ আমাকে নিমেষে চুম্বকের মতো টান মারল সেদিকে। তোতির ঠেলায় আমি তখন অস্থির। তবু। অধীর ভাবে যেই পা বাড়িয়েছি মোহিনী অভিমুখে অমনি কে যেন আলতোভাবে হাত রাখল আমার কাঁধে–একই সঙ্গে কানের পর্দায় বর্ষিত হলো চাপা, ভাঙা গলায় সেই পৈশাচিক ফিসফিসানি।

প্রতিটি রক্তকণিকা তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে আমার শিরায়, ধমনীতে, কামিনী-পিপাসা বন্য হস্তীর বল এনে দিয়েছে পেশীতে পেশীতে, ধাবমান শোণিতের সুগম্ভীর গর্জন ধ্বনিত হচ্ছে মাথার মধ্যে–ঠিক এই সময়ে ঘটল এই বিপত্তি।

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। খপাৎ করে আঁকড়ে ধরে ছিলাম মূর্তিমান উৎপাতটার কলার। পরণে তার নীল মখমলের স্পেনীয় আলখাল্লা– কোমরে রক্তবর্ণের

বেল্ট। সারা মুখ ঢাকা কালো রেশমের মুখোশে। ঠিক এই বেশ আর এই মুখোশই দেখব এই আশা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম সবেগে।

দারুণ ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিলাম একই সঙ্গে। বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ আগুনের ফুলকির মতোই ছিটকে ছিটকে এসেছিল দাঁতে দাঁত পিষে প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণের সময়ে। আমি বলেছিলাম–স্কাউন্ড্রেল! জালিয়াৎ! পিশাচ! কী চাও তুমি? আমার মৃত্যু? সেটি হতে দিচ্ছি না! বলেই, হিড় হিড় করে শয়তান শিরোমণিকে বলরুম থেকে টেনে এনেছিলাম পাশের ছোট্ট ঘরটায়।

ধাক্কা মেরে দেওয়ালের ওপর আছড়ে ফেলেছিলাম তৎক্ষণাৎ। কপাট টেনে বন্ধ করে দিয়েই কোষমুক্ত করেছিলাম তরবারি। বলেছিলাম সাপের মতোই হিসহিসিয়ে দেখি– এবার কার গায়ে জোর বেশি! বার করো তোমার হাতিয়ার।

ক্ষণিক দ্বিধা করেছিল সে। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাপ থেকে টেনে বের করেছিল ইস্পাতের তলোয়ার।

শুরু হয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। শেষ হয়েছিল অচিরেই। রক্তের ধারা তখন প্রলয় নাচন নেচে চলেছে আমার শিরায় শিরায়। মত্ত ঐরাবতের শক্তি ভর করেছে শরীরে। স্রেফ দানবিক শক্তি দিয়ে মারের পর মার মেরে তাকে আমি কোণঠাসা করেছিলাম চক্ষের নিমেষে

এবং কলজে ফুটো করবার এমন সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ছিলাম তৎক্ষণাৎ। একবার নয় বার বার, সর্ব শক্তি দিয়ে তরবারি প্রবেশ করিয়েছিলাম তার বুকের খাঁচায়।

ঠিক তখনই তুমুল চেঁচামেচি শুনেছিলাম বাইরে–ঘন ঘন ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল দরজার কপাট। মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে চেয়েছিলাম আমি।

পরক্ষণেই সামনে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন পট পালটে গেছে। আসলে কিছুই পালটায়নি কিন্তু আমার উদ্দাম অলীক কল্পনা দিয়ে আমি মনে করে নিলাম যেখানে দেওয়াল ছিল, সেখানে রয়েছে বিশাল একটা দর্পণ। সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে আমারই অবয়ব। রক্তাক্ত দেহে বিহ্বল মুখে আমি টলতে টলতে এগিয়ে আসছি আমারই দিকে। মুখের মুখোশ আর হাতের তরবারি এখন মেঝেতে নিক্ষিপ্ত। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুখের ভাঁজ, খজ, রেখা আর তিল। এ যে আমারই প্রতিচ্ছায়া –একই পরমাণু দিয়ে গড়া একই আমি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আর তিলমাত্র। রক্তমাখা এই আশ্চর্য কায়াকে আমি উইলিয়াম উইলসন নামেই চিনে এসেছি এতগুলো বছর।

হাহাকারের সুরে শেষ কথাগুলো যখন বলেছিল উইলসন তখন গলা চেপে, গলা ভেঙে ফিসফিস করার চেষ্টা করেনি এতটুকুও। একটা একটা শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে শূন্যে বিলীন হচ্ছিল ওর প্রাণবায়ু। এবং চমকে চমকে উঠছিলাম আমি আমারই কণ্ঠস্বর ওর কণ্ঠে বর্ণে বর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে শুনে। ও বলেছিল :

জিতে গেলে ঠিকই কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়ে জিতলে। কারণ আমিই তোমার সব কিছু। আজ থেকে সমস্ত দুনিয়ার কাছে, সমগ্র স্বর্গলোকের কাছে, যাবতীয় আশার জগতের কাছে নিহত হয়ে রইলে তুমি! দেখছো কি? এত তোমারই ছায়া! ছায়াকে হত্যা করে ডেকে আনলে তোমার নিজেরই মৃত্যু!

–এডগার অ্যালান পো

একদিন ট্রেনে

এক কয়েকদিনের জন্য লন্ডনের বাইরে গিয়েছিলাম আমি। ভোরবেলা ইউস্টন স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলাম। সঙ্গে কিছু দরকারী কাগজপত্র রয়েছে। ঠিক করলাম ট্রেনে যেতে যেতে ডকুমেন্টগুলো পড়ে ফেলব।

ছোট একটি কামরা রিজার্ভ করা যায় কিনা খোঁজ করতেই গার্ড সাহেব একটি খালি কামরার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ ব্যবস্থা করতে তেমন অসুবিধাও হলো না, কারণ ট্রেনটি বলতে গেলে একরকম ফাঁকাই যাচ্ছিল।

ট্রেন ছাড়বার সময় হলো। বাঁশি বাজল, ট্রেন নড়েচড়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক একটি ভারী ব্যাগ নিয়ে ছুটতে ছুটতে আমার কামরার সামনে চলে এলেন; তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

একটু বিরক্তই হলাম। একা বসে নিজের কাজ আর করা যাবে না। কিন্তু উপায় কী? এ কামরা তো আর আমার একার নয়।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের দুজনের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ভাই, আমি রেলওয়ে কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। আমাদের কোম্পানি একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলেছে। তার ডিউটির অনেকটাই আমার ঘাড়ে এসে

পড়েছে। এ কাজটা নিয়ে আমি এখন খুবই ব্যস্ত। এই তো সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি। লোকাল ব্যাংকে জমা দেব। তাতে কাজ চালাতে খুব সুবিধা হবে। কোন খরচের জন্য হেড অফিসের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না।

কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়ে চলাফেরা করছেন, ভয় লাগে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে।

না, না! কে জানছে আমার ব্যাগে এত টাকা রয়েছে। তাছাড়া কে ছিনতাই করবে? আপনাকে বললাম বলে আপনি নিশ্চয়ই করবেন না, বলে ভদ্রলোক হাসলেন।

তবু, এভাবে...

কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমি খুব একটা ভিতু বা নার্ভাস টাইপের লোক নই। আমার মনোবল যথেষ্ট শক্ত।

কথাবার্তায় অনেকটা সময় কেটে গেল। ট্রেন ছুটে চলেছে। সঙ্গের কাগজগুলো পড়া হলো না। গন্তব্যে পৌঁছেও পড়া যাবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগছে। আগেকার বিরক্তির ভাবটা কেটে গেছে। কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোক আমার গন্তব্যস্থল কোথায় জেনে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে, আপনার বন্ধু তো আমার খুবই পরিচিত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনার বন্ধুর স্ত্রী আমার নিজের ভাগ্নী। ইস, আপনার সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভালো হত। কটা দিন একটু বিশ্রাম মিলত। কিন্তু উপায় নেই, ব্রাঞ্চ লাইনের সব দায়দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। লাইনের পরিকল্পনাটা আমিই দিয়েছিলাম। কয়েকজন ডিরেক্টর আপত্তি জানালেও স্কিমটা শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংয়ে পাশ করিয়ে নিতে পেরেছি। এখন যত ঝক্কি-ঝামেলা আমার ওপর। কমাস ধরে যা খাটা-খাটনি যাচ্ছে! ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

বন্ধু আর বন্ধুপত্নীকে বলব আপনার কথা।

বলবেন, ম্লান হেসে ভদ্রলোক বললেন।

আপনার যদি কিছু বলার থাকে, তবে আমি তা ওদের বলতে পারি, আমি বললাম।

আমার! ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন, তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, একটি কথা ওদের বলতে পারেন যে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে ওদের ওখানে যাব। ভাগ্নীকে বলবেন ব্লু রুমের ফায়ার প্লেসে যে অত আগুন না জ্বালায় । আমি গেলে ওরা আমাকে ও ঘরটিই ছেড়ে দেয়। উঃ! গতবারে গিয়ে আগুনের তাপে একেবারে ঝলসে যাওয়ার দশা।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। সামনে স্টেশন। আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে আর একটি গাড়ি থামার জন্য আমাদের ট্রেন প্লাটফরমে ঢোকার সিগনাল পায়নি।

দুই

একজন টিকিট চেকার ঢুকলেন কামরায়। এ কামরার টিকিট চেক করতে তার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। মোটে তো দুজন আরোহী। সোজা আমার কাছে এসে তিনি বললেন, টিকিট?

পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখালাম।

মনে হলো আমার সহযাত্রীর দিকে একবার তাকালেন চেকার সাহেব। তারপর নেমে গেলেন পাশের কামরার দিকে। ট্রেনও ততক্ষণে সিগনাল পেয়ে চলতে শুরু করেছে।

মি. ডুয়েরিং হাউসের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম, চেকার আপনার টিকিট দেখতে চাইলেন না তো?

বলতে ভুলে গিয়েছি আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকের নাম ডি. ডুয়েরিং হাউস।

ওরা সবাই আমাকে চেনে, জানে আমি রেল কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। প্রায়ই এ লাইনে যাতায়াত করি। আমার ফার্স্টক্লাস পাস আছে।

ট্রেন স্টেশনে ঢুকল। ভদ্রলোক চট করে উঠে পড়লেন, ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন, আমাকে এখানেই নামতে হবে। আপনি তো এ লাইনের শেষ স্টেশনে নামবেন। আপনার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময়টা বেশ কাটল। চলি তাহলে।

বিদায় জানিয়ে ভদ্রলোক নেমে পড়লেন প্লাটফরমে। তারপর মিশে গেলেন যাত্রীদের ভিড়ে।

আমি জানালা দিয়ে ঝুঁকে লক্ষ করছিলাম মি. ডুয়েরিং হাউসকে। হঠাৎ কীসের ওপর যেন আমার পা পড়ল। নিচু হয়ে দেখলাম একটা সিগারকেস। হয়তো আমার সহযাত্রী ফেলে গেছেন। ঠিক তাই। দেখলাম কেসটার এক কোনায় মি. ডুয়েরিং হাউসের নাম লেখা রয়েছে।

ট্রেন ছাড়তে এখনও দুমিনিট বাকি। ভাবলাম এক ছুটে ভদ্রলোককে কেসটা দিয়ে আসি। নেমে পড়লাম প্লাটফরমে। গার্ড বোধহয় আমার কামরার দরজা বন্ধ করতে আসছিলেন।

কোথায় যাচ্ছেন? আপনার তো এখানে নামার কথা নয়, বললেন তিনি।

আসছি এক্ষুনি। আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকটি তাঁর সিগারকেসটি ফেলে গেছেন। দামী কেস... ভদ্রলোক বোধহয় এখনও স্টেশনের বাইরে যেতে পারেননি। দেখি তাঁকে কেসটা দিয়ে আসা যায় কিনা।

তাড়াতাড়ি আসবেন। আর মিনিট দেড়েকের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেবে।

আর কথা না বাড়িয়ে ছুটতে লাগলাম। এটা একটা বড় জংশন। প্লাটফরমটাও বিরাট। ভদ্রলোক বোধহয় এতক্ষণে প্লাটফরমের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছেন।

কিছুটা ছুটে আসবার পরে সহযাত্রী ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। দেখলাম একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তারপর দুজনে ভিড় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একান্তভাবে আলাপ করতে লাগলেন। ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্লাটফরমের একটা ল্যাম্প পোস্টের পাশে। ওঁদের ঠিক মাথার উপরে জ্বলছিল গ্যাস বাতি। সেই আলোয় দুজনকেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

কুলি আর যাত্রীদের ভিড় ঠেলে যতদূর সম্ভব জোরে ছুটছিলাম। মনে ভয়, এই বুঝি আমাকে না নিয়েই ট্রেন ছেড়ে দিল। এরকম মানসিক অবস্থাতেও মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গীকে ভালভাবেই লক্ষ করছিলাম। ভদ্রলোকের রঙ ফর্সা, মাথার চুল ধূসর, লম্বায় তিনি আমার সহযাত্রীর থেকে ইঞ্চি দুয়েকের ছোটই হবেন। লোকটির মুখে হালকা দাড়ি-গোঁফ।

যাক এসে গেছি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিপদ! ঘাটে এসে তরী ডুবল । ভিড়ের ধাক্কায় পা পিছলে পড়ে গেলাম। সামলে নিয়ে উঠে পড়তে দুতিন সেকেন্ডের বেশি লাগেনি কিন্তু যখন সিধে হলাম তখন আমার সহযাত্রী বা তার সঙ্গী কাউকেই দেখতে পেলাম না। চারপাশে তাকালাম-নাঃ কোথাও ওঁদের কোন চিহ্ন নেই! ওঁরা দুজনেই কি কর্পূরের মতো উবে গেলেন!

ঢং ঢং ঢং... ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। বেজে উঠল ট্রেনের বাঁশি।

কাছেই স্টেশনের একজন পয়েন্টস ম্যান দাঁড়িয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে ভাই, একটু আগে গ্যাস পোস্টের তলায় যে দুজন। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা কোন্ দিকে গেলেন বলতে পার?

আমি লক্ষ করিনি, স্যার।

ট্রেনের বাঁশি আবার বেজে উঠল। দেখলাম হাত নেড়ে গার্ড সাহেব আমাকে গাড়িতে উঠবার ইঙ্গিত করছেন। ছুটলাম নিজের কামরার দিকে। গাড়ি নড়েচড়ে উঠল, চলতে শুরু করল ধীর গতিতে। এক লাফে নিজের কামরার ফুটবোর্ডে উঠে পড়লাম তারপর ঢুকে পড়লাম কামরায়।

আমি তখন হাঁপাচ্ছি। আমার হাতে সহযাত্রীর ফেলে যাওয়া সুদৃশ্য সিগারকেস। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তখনও তাকিয়ে আছি বিরাট প্লাটফরমটার দিকে।

গাড়ির গতি বাড়ল। পিছনে পড়ে রইল জংশন তার বিরাট প্লাটফরম নিয়ে।

বাকি পথটুকু আর সঙ্গে আনা কাগজপত্রে মন বসাতে পারলাম না। সহযাত্রী আর তার সিগারকেসটার কথাই বারবার মনে হানা দিতে লাগল। কেন যে মনে পড়ছিল জানি না। ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়... ট্রেন থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে লোকে কি অনেক সময় টুকটাক জিনিসপত্র ফেলে যায় না?

তিন

গন্তব্যে পৌঁছতে সাঁঝ ঘনাল। স্টেশন থেকে বন্ধুর বাড়ি যেতে কোন অসুবিধা হলো না। কারণ বন্ধুবর স্টেশনে তার মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। স্টেশন থেকে বাড়ি আসতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না।

গিয়ে দেখলাম আরও কয়েকজন অতিথি এসেছেন। গোসল করে, পোশাক পাল্টে ড্রয়িংরুমে এলাম। বন্ধুবর তার অতিথিদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ নানা গল্প-গুজব চলল, তারপর আমরা গিয়ে বসলাম খাবার টেবিলে। আজকের অভিজ্ঞতাটা বলবার জন্য মনটা ছটফট করছিল, কিন্তু এতক্ষণ সে কথা বলার সুযোগ পাইনি। এবার সুযোগ মিলল। বন্ধুপত্নীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলো ট্রেনে, আমরা এক সঙ্গে অনেকটা পথ এলাম। গল্প-গুজবে সময়টা বেশ কেটে গেল।

তাই বুঝি? কার সঙ্গে দেখা হলো? বিস্মিত হেসে বললেন বন্ধুপত্নী।

আপনার মামা মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে।

বন্ধুপত্নী চমকে উঠলেন, বন্ধুকেও কেমন যেন বিব্রত মনে হলো।

মি. ডুয়েরিং হাউস বলেছেন শীগগিরই হপ্তাখানেকের ছুটি নিয়ে তিনি এখানে আসবেন। তাকে যেন রু রুমটাই ছেড়ে দেয়া হয়। তবে গতবারের মত ফায়ার প্লেসে যেন অত আগুনের ব্যবস্থা করা না হয়। গতবার আগুনের তাপে অনেক কষ্ট পেয়েছেন তিনি।

কথা শেষ করার আগেই বুঝতে পারলাম ঘরের মধ্যে অস্বস্তির কালো একটা ছায়া নেমে এসেছে। ঘরের আনন্দময় পরিবেশটা যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। খাবার ঘরে দুঃসহ স্তব্ধতা। আমি হয়তো এমন কোনো কথা বলে ফেলেছি যা না বললেই ভালো হত! অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমার জন্যই বুঝি আনন্দের সুর কেটে

গেল। কিন্তু আমি কী এমন কথা বললাম যাতে ডিনার পার্টিটা নিরানন্দময় হয়ে গেল? কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

ডিনার পার্টি আর জমল না। বন্ধু, বন্ধুপত্নী এবং অতিথিরা খুশির ভাব আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল ভাবটা কৃত্রিম। যেটা স্বচ্ছন্দে গতিতে এগিয়ে চলছিল তাও যেন হঠাৎ মন্থর গতি হয়ে উঠল। কোথায় ঘটল ছন্দপতন?

কোন রকমে ভোজন পর্ব চুকল। অতিথিরাও কোন না কোন অজুহাতে চলে গেলেন যে যার বাড়ি। এরা সবাই স্থানীয়। বহিরাগত অতিথি কেবল আমি একা।

খাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে বসলাম আমি এবং বন্ধু। বন্ধুপত্নীও শরীর খারাপের কথা বলে শোবার ঘরে চলে গেলেন। দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর নীরবতা ভেঙে আমিই বললাম, আনন্দের সুরটা হঠাৎ কেটে গেল। আমার কারণেই যে এটা ঘটেছে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি আমার কোন্ কথায় বা আচরণে এমনটি ঘটল?

সুর কেটে গেল, তাই না? সিগারেটে টান দিয়ে বন্ধু বলল, তুমি আমার স্ত্রীকে যা বলেছ তাতে আমরা সবাই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছি।

ঠিক বুঝলাম না, বিমূঢ়ভাবে বললাম আমি।

তুমি বুঝবে কী করে? ব্যাপারটা তো তুমি জানোই না, এক মুখ ধোয়া ছাড়ল বন্ধু।

দুঃখিত! আনন্দের আসরটা মাটি করে দিলাম।

আরে না না, তোমার কোন দোষ নেই। বিব্রতভাবে বন্ধু বলল। তুমি যা করেছ, সেটাই স্বাভাবিক। যে বাড়িতে যাচ্ছি সে বাড়ির একজন আত্মীয়ের সঙ্গে পথে দেখা হলো, গন্তব্যে পৌঁছে এ কথা বলাই স্বাভাবিক। আমরা হলেও বলতাম।

তাহলে? আমি আরও অবাক হয়ে বললাম।

আসলে আমার মামা শ্বশুর অর্থাৎ মি. ডুয়েরিং হাউসের প্রসঙ্গ উঠবার ফলেই গোটা পরিবেশটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠল।

কেন কি হয়েছে মি. ডুয়েরিং হাউসের?

কী যে হয়েছে তাই তো কেউ জানে না। আচ্ছা তোমার কোন ভুল হয়নি তো, তুমি কি নিশ্চিত যে ট্রেনে যে ভদ্রলোক তোমার সহযাত্রী ছিলেন তিনি মি. ডুয়েরিং হাউস?

দেখ, মি. ডুয়েরিং হাউসকে আমি আগে কখনও দেখিনি। ভদ্রলোক নিজের যে পরিচয় দিলেন তাতে... আচ্ছা দাঁড়াও উনি একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলেন কামরায়, আপাতত আমার কাছে রয়েছে সেটা। দেখ তো এ সিগারকেসটা তোমার মামা শ্বশুরের কিনা..।

পকেট থেকে কেসটা বের করে বন্ধুর হাতে দিলাম।

কেসটা হাতে নিয়ে অবাক বন্ধুবর, বিস্মিত স্বরে বলল, হ্যাঁ, এটাই তো আমার মামা শ্বশুরের সিগার কেস। এটা বহুবার দেখেছি। তাছাড়া এই তো কোনায় তার নাম মনোগ্রাম করা রয়েছে। না, এটা তাঁরই জিনিস। তুমি বলছ এটা উনি ট্রেনের কামরায় ফেলে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার মামা শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হওয়াটা, একটু ইতস্তত করে বন্ধু বলল খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

এর মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে? ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলো তো। তখন থেকে কেবলই রহস্যের জাল বুনে চলেছ।

ব্যাপারটা হলো, কণ্ঠস্বর নিচু করে বন্ধু বলল, আমার মামা শ্বশুর রেল কোম্পানির সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে পালিয়েছিলেন। কেউ জানে না এখন তিনি কোথায়, তিনি একজন ফেরারি। পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কী বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি, এটা আমাদের জন্যও একটা দারুণ লজ্জার কথা। মি. ডুয়েরিং হাউস আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। কাজেই তার প্রসঙ্গ ওঠায় আমরা বেশ বিব্রত হয়ে যাই।

তিনি কতদিন ধরে নিরুদ্দেশ?

তা প্রায় মাস তিনেক।

অথচ আজকেই কয়েকঘণ্টা আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে।

তাই তো ভাবছি, এটা কী করে হল সেটাই বুঝতে পারছি না।

তুমি বলছ মি. ডুয়েরিং হাউস সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে ফেরার হয়েছেন। অথচ আমাকে বলেছেন টাকাটা তিনি স্থানীয় ব্যাংকে জমা দেবেন। ব্রাঞ্চ লাইনের কাজের জন্য যাতে সব সময় হেড অফিসের দিকে তাকিয়ে থাকতে না হয়, সেজন্যই এ ব্যবস্থা। তাঁর সঙ্গে

যে সত্তর হাজার পাউন্ড রয়েছে একথা তিনি নিজের থেকেই আমাকে বলেছেন। কোন অপরাধী কি এরকম বলে বেড়ায়?

হ্যাঁ, তোমার কথাটা একেবারে অযৌক্তিক নয়।

আচ্ছা, মি. ডুয়েরিং হাউস মানুষ হিসেবে কেমন?

তাকে অত্যন্ত সৎ এবং কর্মনিষ্ঠ বলেই জানতাম। সাধারণ একজন কেরানির চাকরি নিয়ে তিনি রেল কোম্পানিতে ঢুকেছিলেন। কোন খুঁটির জোর ছাড়াই। তারপর নিজের সততা, নিষ্ঠা আর কর্মদক্ষতায় ধাপে ধাপে উন্নতি করে তিনি কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের একজন সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেন যে তাঁর দুর্মতি হল। সারা জীবনের সুনামটাকে তিনি ধ্বংস করে ফেলেছেন!

বন্ধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে আজ কিন্তু আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ, সিগারকেসটা দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটার মধ্যে যেন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

হুঁ, চিন্তিতভাবে বন্ধু বলল।

চলো না কাল একবার জংশন স্টেশন থেকে ঘুরে আসি; দেখি নতুন কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাকি।

বেশ।

কিন্তু আমাদের যাবার ব্যাপারটা গোপন রেখো, আমি তাকে সাবধান করে দিলাম।

রাখবো।

তোমার স্ত্রীকেও আপাতত কিছু বলো না।

বেশ বলব না।

চার

পরদিন তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা দুই বন্ধু জংশন স্টেশনে এলাম। এই স্টেশনেই মি. ডুয়েরিং হাউস নেমেছিলেন। আর এখান থেকেই নতুন ব্রাঞ্চ লাইন

পাতা হচ্ছে। সুতরাং আমার নিরুদ্দেশ সহযাত্রীর কোন খবর আদৌ মিললে এখান থেকেই পাওয়া যাবে।

ট্রেন থেকে নেমে সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলাম। দেখলাম স্টেশন মাস্টার আমার বন্ধুকে বেশ ভালোভাবেই চেনেন। মামুলি দুচারটি কথাবার্তার পর বন্ধুবর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, মি. ডুয়েরিং হাউস কি কাল এই স্টেশনে নেমেছিলেন?

দারুণ অবাক হয়ে স্টেশন মাস্টার তাকালেন আমাদের দিকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, মি. ডুয়েরিং হাউস? কই এরকম খবর তো আমার কানে আসেনি।

আপনি মি. ডুয়েরিং হাউসকে চেনেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

কেন চিনব না? তিনি আমাদের রেল কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। ব্রাঞ্চ লাইন পাতবার কাজে তাঁকে বহুবার এপথে যাতায়াত করতে হয়েছে। তিনি আমার এ ঘরে এসে বসতেন, চা খেতেন। ব্রাঞ্চ লাইনের কাজ কতদূর এগিয়েছে বা কাজকর্ম কেমন হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতেন। মি. ডুয়েরিং হাউসকে আমি বেশ ভালোভাবেই চিনি।

কাল বিকেলে এই স্টেশনেই তিনি নেমেছিলেন। ইউস্টন স্টেশন। থেকে আমার সঙ্গে একই কামরায় তিনি এসেছিলেন।

আপনি ডুয়েরিং হাউসকে চেনেন তো? স্টেশন মাস্টার এবার আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

কালকের আগে তাঁকে কখনও দেখিনি।

তাহলে কী করে বুঝলেন যে আপনার সহযাত্রীই মি. ডুয়েরিং হাউস?

ভদ্রলোক তো সেই পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

তবে তিনি নিশ্চয়ই অন্য কেউ। যেকোন কারণেই হোক তিনি মি. ডুয়েরিং হাউস বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, স্টেশন মাস্টার গম্ভীরভাবে বললেন।

কিন্তু মি. ডুয়েরিং হাউস এটা ট্রেনের কামরায় ফেলে গেছেন।

ট্রেনের কামরায়?

হা, আগেই বলেছি গতকাল ইউস্টন স্টেশন থেকে এই জংশন পর্যন্ত তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন।

কিন্তু এ অবিশ্বাস্য। স্টেশন মাস্টার বললেন।

কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

মি. ডুয়েরিং হাউস একজন ফেরারী আসামী। রেল কোম্পানির সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে তিনি উধাও হয়েছেন। এ লাইনে তিনি বহুবার যাতায়াত করেছেন। এ লাইনের স্টেশন মাস্টার, গার্ড, টিকিট-চেকার, পয়েন্টস ম্যান, খালাসী, ড্রাইভার, কুলি সবাই তাঁকে চেনে। তাঁর খোঁজ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর চলে যাবে। সুতরাং মি. ডুয়েরিং হাউস এ লাইনে অন্তত যাতায়াত করার সাহস করবেন বলে মনে হয় না।

টিকিট চেকার? আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, গতকাল আমাদের কামরায় একজন টিকিট চেকার এসেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই আমার সহযাত্রীকে দেখেছেন। তাকে পাওয়া যাবে এখন?

না, সন্ধ্যার আগে তাকে পাবেন না। সে যে ট্রেনে আসবে সে ট্রেন এখানে পনের মিনিট থামবে। তখন তাকে আমার অফিসে তলব করতে পারি। কিন্তু আপনারা কি অতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

না করে উপায় কী, বন্ধু বলল, অবশ্য সময় কাটানো খুব একটা সমস্যা হবে না। ব্রাঞ্চ লাইনের কাজকর্ম দেখব। লাইনের লোক জনের কাছে খোঁজখবর নেব গতকাল তাদের

কেউ মি. ডুয়েরিং হাউসকে দেখেছে কিনা। আপনাদের এলাকাটা ঘুরে দেখব। কয়েক ঘণ্টা তো সময় তা দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

ব্রাঞ্চ লাইনের কাজকর্ম দেখে আর রেল কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ সেরে সন্ধ্যার একটু আগেই স্টেশনে ফিরে এলাম। আমাদের তদন্তের ফল মোটেই আশাপ্রদ হয়নি। মি. ডুয়েরিং হাউসকে গতকাল কেউ দেখেনি।

এক্সপ্রেস ট্রেন যথাসময়েই জংশন স্টেশনে এল। স্টেশন মাস্টার চেকার সাহেবকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠালেন।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই চেকার এসে গেলেন। চিনতে পারলাম। কালকের টিকেট চেকারই ইনি।

স্টেশন মাস্টার টিকিট চেকারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই দুই ভদ্রলোক আপনাকে মি. ডুয়েরিং হাউস সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান। আপনার তো তাড়া আছে– এক্ষুনি ট্রেনে ফিরে যেতে হবে...

না, আমার তেমন তাড়া নেই। আজকে আমার ডিউটি এখানেই শেষ । বাকি স্টেশনগুলোর জন্য আর একজন চেকারের উঠবার কথা আছে এই স্টেশন থেকে। বাকি পথটুকু আমি এমনিই চলে যেতাম। সে না হয় পরের লোকাল ট্রেনেই যাব।

বেশ।

এঁরা কি পুলিশের পক্ষ থেকে এসেছেন? চেকার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

না না সেসব কিছু নয় দ্রুত বললাম আমি। আমাদের প্রশ্ন শুনলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা আসলে কী।

বেশ, বলুন কী প্রশ্ন। চেকার বললেন।

আপনি মি. ডুয়েরিং হাউসকে চেনেন? আমি প্রশ্ন করলাম। চিনি।

তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন?

নিশ্চয়ই পারব।

আচ্ছা, গতকাল যে ট্রেনে আপনি টিকিট চেক করেছিলেন তাতে মি. ডুয়েরিং হাউস ছিলেন?

না।

এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?

অবশ্যই। চেকার বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন।

কী করে এতটা নিশ্চিত হলেন?

আমি প্রতিটি কামরার প্রতিটি লোকের টিকিট চেক করেছি। আর গতকালকের যাত্রীদের মুখও আমার মোটামুটি মনে আছে। কিন্তু কোন কামরাতেই মি. ডুয়েরিং হাউস ছিলেন না। দেখুন আপনার চেহারা আমার মনে আছে, অথচ আপনাকে আমি কালকের আগে কখনও দেখিনি। কাজেই বুঝতেই পারছেন মি. ডুয়েরিং হাউস কোনো কামরায় থাকলে আমি তাঁকে দেখলেই চিনতে পারতাম।

কিন্তু মি. ডুয়েরিং হাউস তো আমার কামরাতেই ছিলেন।

আপনার কামরায়! বিস্মিতভাবে চেকার বললেন, যতদূর মনে পড়ছে সে কামরায় তো আপনি ছাড়া আর কোনো যাত্রী ছিলেন না।

মোটেই না, আমার কামরাতেই মি. ডুয়েরিং হাউস ছিলেন। তিনি এই স্টেশনে নেমে যান। তাঁর ফেলে যাওয়া সিগার কেসটি তাঁকে পৌঁছে দিতে গিয়ে আমি ট্রেন ফেল করতে বসেছিলাম।

চেকার বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

কালকে যে গার্ড সাহেবকে দেখেছিলাম, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? স্টেশন মাস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

এই ট্রেনেই আছেন তিনি।

ট্রেন ছাড়তে কতক্ষণ দেরি?

আর মিনিট পাঁচেক পরেই ছেড়ে দেবে।

আমি যে মি. ডুয়েরিং হাউসের সিগার কেসটা নিয়ে ছুটেছিলাম তা গার্ড সাহেব দেখেছেন। ইচ্ছে করলে তাকে এখানে ডেকে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন, স্টেশন মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি।

স্টেশন মাস্টারের জরুরি ডাকে গার্ড সাহেব ছুটতে ছুটতে এলেন। তিনি স্বীকার করলেন আমাকে প্লাটফরম ধরে ছুটে যেতে দেখেছেন। এটাও বললেন যে আমি যেন কার সিগার কেস ফেরত দেবার জন্য দৌড়ে যাচ্ছিলাম।

ট্রেন ছাড়ার সময় হলো। গার্ড সাহেব দৌড়ালেন ট্রেনের দিকে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম চলন্ত ট্রেনের দিকে।

নীরবতা ভেঙে বন্ধু বলল, তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখেছ।

স্বপ্ন? যে কথা কোনদিন শুনিনি তা নিয়ে স্বপ্ন দেখব কী করে? ব্রাঞ্চ লাইনের কথা আমি কোনদিন শুনিনি। মি. ডুয়েরিং হাউস ব্যাগে করে সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছেন, তাও আমি জানতাম না।

হয়তো কোথাও শুনেছিলে বা খবরের কাগজে পড়েছ কিন্তু খেয়াল করনি। তোমার মনের গহনে এসব কথা জমা ছিল। স্বপ্নে মনের অচেতন স্তর থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যাপারটা তোমার মনে এসেছিল। জাগ্রত অবস্থায় যে ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দাওনি, স্বপ্নাতুর অবস্থায় সেটাই গুরুত্ব পেয়ে গেছে।

বেশ, তর্কের খাতিরে মানলাম তোমার কথা, কিন্তু তোমার বাড়ির ব্লু রুমের কথা আমি কী করে জানব? আমি তোমার এ বাড়িতে আগে কখনও আসিনি। মি. ডুয়েরিং হাউসকে যে রু রুমে থাকতে দেয়া হয়েছিল তা তো আমার জানার কথা নয়।

হুঁ, এটা ঠিকই বলেছ। হয় আমাদের না হয় মি. ডুয়েরিং হাউসের কাছে না শুনলে এটা তোমার জানার কথা নয়।

কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে আমি একথা শুনিনি, তাহলে অনিবার্যভাবে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে কথাটা আমি শুনেছি আমার সহযাত্রী মি. ডুয়েরিং হাউসের কাছ থেকে।

ব্যাপারটা তো তা-ই দাঁড়াচ্ছে, বিমূঢ়ভাবে বন্ধুবর বলল।

তাছাড়া এই সিগার কেসটা, এটা আমার কাছে এল কী করে?

তাই তো! ওটা আপনার কাছে এল কী করে? স্টেশন মাস্টার এতক্ষণ আমাদের দুজনের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি আমাকেই প্রশ্ন করলেন।

এ এক অদ্ভুত রহস্য, সবাই বলছে মি. ডুয়েরিং হাউস একজন ফেরারী আসামী। অথচ তুমি বলছ কাল এ লাইনে তিনি তোমার সহযাত্রী ছিলেন, বন্ধু বললেন।

হ্যাঁ, শুধু তাই নয় তাঁর মধ্যে কোন লুকোচুরির ভাবও ছিল না। কোন পলাতক আসামী কি এমনভাবে সহযাত্রীর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জনবহুল প্লাটফরমের মধ্য দিয়ে যায়? আর তাছাড়া এমন একটা স্টেশন যেখানে কর্মচারীরা সবাই তাঁকে চেনে? মি. ডুয়েরিং হাউসের কথাবার্তায় এবং আচরণে তাঁকে কিন্তু আমার একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছে। আমারও ধারণা এর মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে।

এ রহস্য ভেদ করা আমাদের কাজ নয়, আমি কালই কর্তৃপক্ষের কাছে সব কিছু জানিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠাচ্ছি, স্টেশন মাস্টার বললেন। রিপোর্টে আমি এ ব্যাপারটা গোয়েন্দা দিয়ে তদন্ত করাবার সুপারিশ করব।

পাঁচ

কয়েকদিন পর রেল কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাকে অনুরোধ করেছেন ডিরেক্টর বোর্ডের এক বিশেষ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। বুঝলাম বোর্ডের সদস্যরা আমাকে মি. ডুয়েরিং হাউস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান।

সভার আগের দিনই লন্ডনগামী ট্রেনে চেপে বসলাম। কোম্পানির হেড অফিস লন্ডনে। সেখানেই বোর্ডের সভা। সভায় যাতে যথাসময়ে পৌঁছতে পারি সেজন্য কোন রকম ঝুঁকি না দিয়ে একদিন আগেই বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

যথাসময়ে বোর্ডের অফিসে পৌঁছে গেলাম। কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী আমাকে মিটিংরুম-এ নিয়ে গেলেন।

দেখলাম সুন্দর সাজানো গোছানো একটি ঘরে বড় টেবিলের চারপাশে কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বুঝলাম এঁরাই রেল কোম্পানির ডিরেক্টর। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাকে স্বাগত জানিয়ে বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পরিচিতির পর শুরু হলো আসল কাজ। কোম্পানির চেয়ারম্যান বললেন, আমরা জংশন স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেয়েছি। রিপোর্টটা আমাদের কোম্পানির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টে বলা হয়েছে কদিন আগে আপনি নাকি আমাদের কোম্পানির নিরুদ্দিষ্ট ডিরেক্টর মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে একই কামরায় গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, ইউস্টন থেকে জংশন পর্যন্ত আমরা একই কামরায় ছিলাম।

আপনি কি মি. ডুয়েরিং হাউসকে চিনতেন?

না, সেদিনই ট্রেনের কামরায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

তাঁর সঙ্গে আপনার কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল?

নানা রকমের কথাবার্তা হয়েছিল।

আমাদের কোম্পানি সংক্রান্ত কোন কথা হয়েছিল?

জ্বি।

কী কথা?

মি. ডুয়েরিং হাউস নতুন ব্রাঞ্চ লাইনটা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। কাজের জন্য তিনি যে ব্যাগে করে সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছেন, সে কথাও বলেছেন।

তাই নাকি! চেয়ারম্যানের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুরটা আর চাপা রইল না।

বোর্ডের অন্য সদস্যরা উৎসুক হয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন, এবার তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ট্রেনে যার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল তিনিই যে আসল মি. ডুয়েরিং হাউস তা কী করে বুঝলেন? অন্য কোন লোকও তো বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজেকে মি. ডুয়েরিং হাউস বলে চালাতে পারেন।

তা পারেন, আমি স্বীকার করলাম, কিন্তু একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছে ছদ্মপরিচয় দিয়ে কী লাভ? তাছাড়া এমন লোকের নামে পরিচয় দেয়া হলো তিনি একজন ফেরারি আসামী পুলিশ যাকে খুঁজছে।

আপনার সেদিনের সহযাত্রীর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন? চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন।

যতদূর মনে ছিল সহযাত্রীর চেহারা এবং ভাবভঙ্গির একটা বর্ণনা দিলাম।

চেয়ারম্যানের মুখ গম্ভীর হলো। বোর্ডের সদস্যদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার বর্ণনা শুনে ভদ্রলোককে তো মি. ডুয়েরিং হাউস বলেই মনে হচ্ছে।

এ দেখছি বড়ই অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার! একজন প্রবীণ সদস্য মন্তব্য করলেন।

এবার আমি সিগার কেসটি বের করে টেবিলের উপর রেখে বললাম, আমার সহযাত্রী ভদ্রলোক এটা ফেলে গিয়েছিলেন।

চেয়ারম্যান সিগারকেসটি পরীক্ষা করে সেটা একজন সদস্যের হাতে দিলেন। তারপর বোর্ডের সদস্যদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল সিগারকেসটা।

তাঁদের পরীক্ষা শেষ হলে চেয়ারম্যান গম্ভীরভাবে বললেন, সিগারকেসটা যে মি. ডুয়েরিং হাউসের তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি নিজে এবং বোর্ডের মাননীয় সদস্যরা সবাই এই সিগারকেসটা তাঁকে বহুবার ব্যবহার করতে দেখেছি।

চেয়ারম্যান কলিংবেল টিপলেন, একজন বেয়ারা ঘরে ঢুকতে তিনি নিচু গলায় কী যেন আদেশ করলেন। একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন সেদিনের সেই টিকিট চেকার ।

বসুন, চেয়ারম্যান বললেন। আমার মতো চেকার সাহেবেরও জবানবন্দি নেওয়া হল।

আপনি মি. ডুয়েরিং হাউসকে চেনেন?

হ্যাঁ, বেশ ভালোভাবেই চিনি।

তাঁকে চিনতে ভুল হবার কোন সম্ভাবনা আছে?

মি. ডুয়েরিং হাউসকে এতবার দেখেছি যে তাঁকে দেখলে চিনতে পারব এমনটি হতেই পারে না, চেকার সাহেব বেশ জোর দিয়েই বললেন।

এই ভদ্রলোক বলছেন মি. ডুয়েরিং হাউস ইউস্টন থেকে জংশন স্টেশন পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে একই কামরায় এসেছেন। আপনি তো সেদিন ওই ট্রেনের চেকার ছিলেন তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আপনি কি সেদিন মি. ডুয়েরিং হাউসকে দেখেছেন? চেয়ারম্যান যেন তীরের মতো কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন।

জ্বি না, আমি প্রতিটি যাত্রীর টিকিট পরীক্ষা করেছি। মি. ডুয়েরিং হাউস ট্রেনে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেতাম, চিনতে পারতাম।

এই ভদ্রলোককে চেনেন? ওঁকে দেখেছেন কোনদিন?

উনি আমার পূর্ব পরিচিত নন, সেদিন ট্রেনের একটি কামরায় উনি ছিলেন।

আপনি কখন ওঁর কামরায় টিকিট চেক করতে যান?

ট্রেন জংশন স্টেশনে ঢুকবার ঠিক আগে! সিগনাল না পেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এ ভদ্রলোক তো বলছেন জংশন স্টেশন পর্যন্ত মি. ডুয়েরিং হাউস ওঁর কামরাতেই ছিলেন।

সেদিন আমি যখন ওঁর কামরায় চেক করতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে উনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

আমার দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান বললেন, আপনার কথার সঙ্গে আমাদের চেকারের বক্তব্যের কোন সঙ্গতি নেই। একজন বলছেন মি. ডুয়েরিং হাউস কামরায় ছিলেন আর একজন বলছেন ছিলেন না।

একটু থেমে প্রতিটি শব্দ ধীর এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন তিনি, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে আপনাদের দুজনের মধ্যে একজনের উক্তি সঠিক নয়। মাফ করবেন কিন্তু একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের দুজনের একজন মিথ্যা কথা বলছেন।

আমি সত্যি কথাই বলছি, স্যার, টিকিট চেকারের দিকে একটু সন্ধি দৃষ্টিতেই তাকালেন চেয়ারম্যান। চেকারের সঙ্গে পলাতক মি. ডুয়েরিং হাউসের একটা গোপন যোগাযোগ আছে–এ রকম একটা সন্দেহই কি চেয়ারম্যান সাহেবের মনে এসেছে?

টিকিট চেকারও বোধহয় এরকম কিছু একটা আশঙ্কা করে ভীরু গলায় বলল, আমি সত্যি কথাই বলছি, স্যার।

চেয়ারম্যান আমার দিকে সপ্রশ্ন চাউনি তুলতেই আমি বললাম, আমার বক্তব্য সম্বন্ধে নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি আগে যা বলেছি এখনও তা-ই বললাম।

এরপর সেদিনের গার্ডের জবানবন্দি নেয়া হলো। কিন্তু রহস্য সমাধানের কোন ক্লু পাওয়া গেল না। গার্ড জানালেন ট্রেন ছাড়বার একটু আগে তিনি আমাকে প্লাটফরম দিয়ে ছুটতে দেখেছিলেন। আমার সহযাত্রী একটা সিগারকেস ফেলে গিয়েছিলেন। সেটা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমি ছুটেছিলাম–একথাটাও তিনি বললেন।

বোর্ডের বৈঠকে নেমে এল এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

.

নীরবতা ভেঙে চেয়ারম্যান বললেন, ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার হলো না। আমরা যে তিমিরে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। এবার তাহলে কাগজগুলো দেখা দরকার। সেদিন ঐ ট্রেনের গার্ড চেকার এদের ডিউটি বুক নিয়ে আসা হোক। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

ডিরেক্টররা সায় দিলেন তাঁর কথায়, সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান বললেন, এ ব্যাপারে ডে বুকটা একবার দেখা দরকার।

সেক্রেটারি কলিং বেল টিপল। বেয়ারা ঢুকল। তার দিকে তাকিয়ে সেক্রেটারি বলল, মি. রাইকস।

একজন ডিরেক্টরের কথা থেকে বুঝলাম যে মি. রাইকস কোম্পানির একজন আন্ডার সেক্রেটারি।

ছয়

মি. রাইকস এলেন। ভদ্রলোক বেঁটে, রোগা, মাথার চুল ধূসর, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ রঙ ফর্সা, মুখে হালকা দাড়ি গোঁফ। লোকটি মিটিং রুমের দোরগোড়ায় আসতে না আসতেই সেক্রেটারি তাঁকে, যেদিন মি. ডুয়েরিং হাউস আমার সহযাত্রী ছিলেন বলে দাবি করেছি, সেই দিনকার ডে বুকটি নিয়ে আসবার জন্য বললেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে মি. রাইকস চলে গেলেন।

মি. রাইকস বোধহয় মুহূর্তকাল দোরগোড়ায় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে আমি এমন চমকে উঠলাম যে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। তারপর বেয়ারা দরজা ভেজিয়ে দিতেই আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

ওই ভদ্রলোক... হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোকই সেদিন ব্ল্যাক ওয়াটার জংশনের প্লাটফরমে মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। উত্তেজিতভাবে আমি বললাম।

সবাই স্তম্ভিত।

আপনি বোধহয় ভুল করছেন, উনি হেড অফিসের একজন আন্ডার সেক্রেটারি, ওঁর তো ব্ল্যাক ওয়াটার জংশনে যাবার কথা নয়, সেক্রেটারি বললেন।

না, আমি মোটেই ভুল করিনি। আমি জোর দিয়ে বললাম। ওঁরা দুজনে একটি লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আলো পড়ছিল ওদের গায়ে। দুজনকেই আমি স্পষ্ট দেখেছি। না না, আমি মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে এই ভদ্রলোককেই দেখেছিলাম।

চেয়ারম্যান একটু বিব্রতভাবেই বললেন।

মি. ল্যাংফোর্ড (আমার নাম), একটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন। আপনার কথার তাৎপর্যটা কি ঠিক বুঝতে পারছেন?

আমি নিজেকে যেমন চিনি, ওই ভদ্রলোককে ঠিক তেমনি নিশ্চিতভাবে চিনতে পারছি।

আপনার কথার ফলাফল কী হতে পারে তা কি ভেবে দেখেছেন? আপনি কিন্তু কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে মারাত্মক অভিযোগ আনছেন?

আমি শপথ করে বলতে পারি একটু আগে যে ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসেছিলন, তাকেই ব্ল্যাকওয়াটার জংশনের প্লাটফরমে মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

চেয়ারম্যান চেকার-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি সেদিন ট্রেনে মি. রাইকসকে দেখেছিলেন?

না, মি. রাইকস ট্রেনে ছিলেন না।

প্লাটফরমে? গার্ড সাহেবের দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁকে প্লাটফরমে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

মি. হান্টার, আপনার অফিসে কাজ করেন মি. রাইকস। তিনি কি এ মাসের চার তারিখে অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন?

মনে হয় না। তবে এই মুহূর্তে আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। কেন না ঐ সময়ে কয়েকদিন আমি বেশিক্ষণ হেড অফিসে থাকতে পারিনি, আমাকে বেরোতে হয়েছে নানা তদারকিতে। সেই সুযোগে মি. রাইকস অফিস কামাই করতেও পারেন। অবশ্য ডে বুকটা দেখলে সেটাও বোঝা যাবে।

আর ঠিক তখনই ডে বুক বগলে করে মিটিং রুমে ঢুকলেন মি. রাইকস।

বসুন।

মি. রাইকস বসবার পর চেয়ারম্যান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই গার্ড সাহেব আর চেকার সাহেবকে চেনেন?

চিনি স্যার। ওঁরা আমাদের কোম্পানিতেই কাজ করেন।

অনুগ্রহ করে ডে বুকে এ মাসের চার তারিখের এন্ট্রিগুলো দেখুন। দেখুন ওঁদের দুজনের ডিউটি কোন গাড়িতে কতক্ষণ পর্যন্ত ছিল ।

এক্ষুনি দেখে দিচ্ছি, স্যার। মি. রাইকস ডে বুকটা খুললেন।

পরপর কয়েকটি পাতায় অভ্যস্ত চোখ বুলিয়ে একটি পাতার নিচে আঙুল রেখে মি. রাইকস বললেন, পেয়েছি, স্যার। ওঁদের দুজনেরই ডিউটি ছিল ভোর চারটে পনেরোর এক্সপ্রেস ট্রেনে। ট্রেন ইউস্টন থেকে ছেড়ে ক্রম্পটন স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিল।

চেয়ারম্যান সামনের দিকে ঝুঁকে পূর্ণ দৃষ্টিতে মি. রাইকসের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ঐদিন বিকেলবেলা আপনি কোথায় ছিলেন, মি. রাইকস?

আমি? আমি স্যার?

জ্বি, আপনি, রাইকস। এ মাসের চার তারিখে বিকেলে এবং সন্ধ্যায় আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি তো এখানেই ছিলাম, স্যার। মি. হান্টারের অফিসেই ছিলাম আমি। আর কোথায় থাকব?

মি. রাইকসের গলার স্বরে কাঁপুনি থাকলেও তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যে অবাক ভাবটা ছিল তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

মি. রাইকস, গম্ভীরভাবে চেয়ারম্যান বললেন, আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে গত চার তারিখে বিকেলে আপনি ছুটি না নিয়ে অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন, ঠিক?

না, স্যার, তা নয়। মোটেই তা নয়। আমি অফিসেই ছিলাম। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমি একদিনের জন্যও ছুটি নিইনি। আমার বস মি. হান্টার নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবেন।

সেক্রেটারির দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন চেয়ারম্যান।

মি. রাইকস বোধহয় ঠিক কথাই বলেছেন। চার তারিখে ওঁর ছুটি নেবার কোন কথা আমার জানা নেই। এ সম্পর্কে অফিসের কেরানিরা হয়তো সঠিক খবর দিতে পারবে। আমি হেডক্লার্ককে ডাকছি, স্যার।

ডাকুন।

সেক্রেটারি কলিং বেল টিপলেন। বেয়ারা ঘরে ঢুকলে তাকে বললেন, হেড ক্লার্ক সাহেবকে এখানে আসতে বলো।

একটু পরেই হেড ক্লার্ক এলেন। ভদ্রলোক মাঝ বয়সী, চোখে চশমা, মুখের ভাব গম্ভীর। তিনি ঘরে ঢুকতেই কোন ভণিতা না করে চেয়ারম্যান তাঁকে জেরা করতে শুরু করলেন।

আপনি গত চার তারিখে অফিসে এসেছিলেন?

জ্বি।

কতক্ষণ অফিসে ছিলেন?

কাজকর্ম সেরে বেরোতে প্রায় ছটা বেজে গিয়েছিল।

মি. রাইকস সেদিন অফিসে এসেছিলেন?

জ্বি।

বিকেলের দিকে তিনি অফিসে ছিলেন?

ছিলেন।

কী করে এ কথা বলছেন? তাঁকে বিকেলের দিকে দেখেছিলেন? দেখেছিলাম। কিছু কাগজপত্রে সই করবার জন্য আমাকে তার ঘরে যেতে হয়েছিল। আর তাছাড়া...

তাছাড়া? হেড ক্লার্ককে কথা শেষ করতে না দিয়েই চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন।

আমাদের সেকশনে পদমর্যাদার দিক দিয়ে মি. রাইকসের পরেই আপাতত আমার স্থান। মাঝখানে সুপারিন্টেনডেন্টের একটা পদ আছে বটে কিন্তু সে পদটা কিছুদিন ধরে খালি। অফিসের কাজে মি. রাইকসকে আগে। চলে যেতে হলে তিনি আমাকে সেকশন দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। কাজেই ছুটির আগে মি. রাইকস কখনও হেড অফিস থেকে চলে গেলে আমি তা জানতে পারি। গত চার তারিখে এরকম কিছু ঘটেনি। সেদিন। সাড়ে চারটে পর্যন্ত আমি মি. রাইকসের ঘরেই ছিলাম। কাজেই এটা বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি যে বিকেল অন্তত সাড়ে চারটে পর্যন্ত মি. রাইকস হেড অফিসেই ছিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। ছুটির শেষে কাজে যোগ দিয়ে তিনি একদিনও অফিস কামাই করেননি।

হেড ক্লার্কের বক্তব্যে মি. রাইকসের ওপর থেকে সন্দেহটা কেটে গেল। এসব কথা শুনবার পর চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টররা তো তাকে আর সন্দেহ করতে পারেন না। এরপরেও সন্দেহ করলে অন্যায়ই করা হবে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন চেয়ারম্যান। সেই হাসির আড়ালে বোধ করি একটু বিরক্তিও লুকিয়ে ছিল।

সবই তো শুনলেন, মি. ল্যাংফোর্ড?

শুনলাম। কিন্তু এখনও আমি আমার বিশ্বাসে অবিচল।

কিন্তু আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি খুব দুর্বল, একটু কেশে চেয়ারম্যান বললেন, আমার ধারণা আপনি স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নটাকেই সত্যি বলে ভেবেছেন, এটা মনের একটা বিপজ্জনক অভ্যাস; এর ফল খুব মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মি. রাইকসের সন্তোষজনক অ্যালিবাই না থাকলে তাকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো।

আমি জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চেয়ারম্যান আমাকে সময় দিলেন না। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের লক্ষ করে বললেন, এ নিয়ে আর অনুসন্ধান চালানোর অর্থ হচ্ছে সময়ের অপব্যয়। মি. ল্যাংফোর্ডের বক্তব্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। প্রথমত, মি. ডুয়েরিং হাউস তার সহযাত্রী ছিলেন, দ্বিতীয়ত জংশন স্টেশনে তিনি আমাদের অফিসের একজন আন্ডার সেক্রেটারি মি. রাইকসকে দেখেছিলেন। কিন্তু গার্ড বেঞ্জামিন সোমার্সের সাক্ষ্য প্রমাণ করেছে যে মি. ডুয়েরিং হাউস মি. ল্যাংফোর্ডের সহযাত্রী ছিলেন না। হেড ক্লার্কের সাক্ষ্যের ফলে জানা যাচ্ছে ওই দিন ওই সময় মি. রাইকসের পক্ষে জংশন

স্টেশনের প্লাটফরমে থাকা একেবারেই অসম্ভব। তাহলে আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হচ্ছে যে ইউস্টন থেকে ক্লেবরো যাবার সময় মি. ল্যাংফোর্ড ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবশ্য তাঁর স্বপ্নটা যে জীবন্ত এ কথা মানতেই হবে। আর তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের কোম্পানির একটা ব্যাপার দৈবাৎ এসেও গিয়েছে। তবে এটা নিতান্তই কাকতালীয়। ব্যাপারটাকে এখানেই ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

একজনের দৃঢ় বিশ্বাসকে সবাই যদি অবিশ্বাস করতে শুরু করে তার চেয়ে অস্বস্তিকর এবং বিরক্তিকর আর কিছু হয় না। ব্যাপারটা যে দিকে মোড় নিল তাতে আমার ধৈর্য চ্যুতি ঘটল। চেয়ারম্যানের ভদ্র পরিহাস, গার্ড বেঞ্জামিন সোমার্সের ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ বাঁকা হাসি আর আন্ডার সেক্রেটারি রাইকসের চোখের দৃষ্টিতে আধা বিদ্বেষ এবং আধা বিজয়ের উল্লাস আমার কাছে অসহ্য ঠেকল।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রাইকস লোকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে- ভয়ও পেয়েছে। ওর চকিত চাহনি যেন আমাকে নীরবে প্রশ্ন করছে- কে তুমি? কী চাও? কেন আমার চাকরির ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছ? ছুটি না নিয়ে আমি অফিসে অনুপস্থিত ছিলাম কিনা তা জেনে তোমার কী লাভ?

এসব দেখে এবং ঘটনার গতি লক্ষ করে আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্যগণ আমি আর একটু সময় চাইছি আপনাদের কাছে।

ছেড়ে দাও ব্যাপারটা, আমার বন্ধু ফিসফিস করে বলল, চেয়ারম্যান ঠিকই বলেছেন, তুমি স্বপ্নই দেখেছ। এখন যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো।

কিন্তু এভাবে আমাকে চুপ করিয়ে দেয়া গেল না। আমার আরো কিছু বলার আছে এবং তা আমি বলবই।

চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের সদস্যরা আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে আমি স্থির গলায় বললাম, মি. চেয়ারম্যান স্যার, আপনি বলছেন আমি স্বপ্ন দেখেছি। বেশ তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম আপনার কথা। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে।

কী প্রশ্ন?

দেখুন, স্বপ্নের মধ্যে কেউ বাস্তব জিনিসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। এই সিগার কেসটা একটা স্থূল বাস্তব জিনিস। বলতে পারেন কী করে স্বপ্নের মধ্যে আমি সিগারকেসটা পেলাম?

সিগারকেসটা, হ্যাঁ, মি. ল্যাংফোর্ড, আমি স্বীকার করছি কেসটা আপনার স্বপক্ষে একটা জোরালো পয়েন্ট। কিন্তু এটাই আপনার একমাত্র জোরালো পয়েন্ট। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে একটা নিছক সাদৃশ্যের দ্বারা আমরা ভুল পথে চালিত হচ্ছি। আপনার পাওয়া সিগারকেসটার সঙ্গে মি. ডুয়েরিং হাউসের সিগারকেসটার গঠনগত মিল থাকবার জন্যই হয়তো আমরা একটু সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি। আপনি অনুগ্রহ করে সিগারকেসটা আরেকবার দেখাবেন?

সিগারকেসটা চেয়ারম্যানের হাতে দিতে গিয়ে বললাম, তা কী করে সম্ভব? অন্যের সিগারকেসে মি. ডুয়েরিং হাউসের মনোগ্রাম কী করে থাকবে? তাছাড়া অন্য সব দিক দিয়েও বা কী করে এটা তার সিগারকেসের মতো হবে?

চেয়ারম্যান কিছুক্ষণ নীরবে সিগারকেসটা পরীক্ষা করলেন তারপর সেটা দিলেন সেক্রেটারি মি. হান্টারের হাতে। সেক্রেটারি কেসটা কয়েকবার উল্টেপাল্টে দেখে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, না, এটা কেবল নিছক সাদৃশ্যের ব্যাপার নয়। এটা যে মি. ডুয়েরিং হাউসের সিগারকেস তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমি বহুবার দেখেছি এটা। কেসটার কথা আমার ভালোভাবেই মনে আছে।

আমিও বোধহয় একই কথা বলব। কিন্তু কীভাবে সিগারকেসটা মি. ল্যাংফোর্ডের হাতে এলো? এ প্রশ্নের উত্তর কী দেবেন? গম্ভীর গলায় চেয়ারম্যান সেক্রেটারিকে প্রশ্ন করলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, সেক্রেটারি জবাব দিলেন।

উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। অবশ্য আমি আগে যা বলেছি সে কথাই আবার বলছি। মি. ডুয়েরিং হাউস নেমে যাবার পর কামরার মেঝেতে আমি ওটা কুড়িয়ে পেয়েছি। তাকে দেখার জন্য আমি জানালা দিয়ে ঝুঁকেছিলাম তখন। আমি কেসটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলি। মি. ডুয়েরিং হাউসকে ওটা দেবার জন্য আমি প্লাটফরম দিয়ে ছুটছিলাম আর তখনই দেখি–বলতে পারেন আমার বিশ্বাস আমি দেখেছি যে তিনি গ্যাস লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে মি. রাইকসের সঙ্গে নিবিষ্টভাবে কথা বলছেন।

আমার বন্ধু আমার জামার হাতায় টান দিল।

দেখো, মি. রাইকসের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, ও ফিসফিস করে বলল।

একটু আগে রাইকস যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকালাম। তার মুখ মরার মতো ফ্যাকাসে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের কোণে আতঙ্ক। চোরের মতো দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাইকস।

আমার মনে হঠাৎ একটা অদ্ভুত এবং অস্পষ্ট সন্দেহ জেগে উঠল। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে আমি রাইকসের কাঁধ দুটো চেপে ধরলাম। তারপর ওর আতঙ্কে পাণ্ডুর মুখখানা ঘুরিয়ে দিলাম চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের সদস্যদের দিকে।

তাকান ওর দিকে, একবার দেখুন ওর চেহারা। আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এর থেকে ভালো সাক্ষ্য আর নেই, উত্তেজিতভাবে আমি বললাম।

চেয়ারম্যানের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আন্ডার সেক্রেটারির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি কঠোরভাবে বললেন, মি. রাইকস, যদি আপনি কিছু জানেন তবে তা খুলে বললেই ভালো হয়।

আমার হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য রাইকস ধস্তাধস্তি করতে লাগল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমি ওকে সজোরে চেপে ধরেছি। আর আমার গায়ের জোরটাও কম নয়, দুর্বল রাইকস কী করে পারবে আমার সঙ্গে। হাঁপাতে হাঁপাতে ও অসংলগ্নভাবে বলতে লাগল, আমায় যেতে দিন। আমি জানি না... কিছু জানি না। আমাকে এভাবে আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই আপনার... বেআইনি... এটা ঘোরতর বেআইনি... আমাকে ছেড়ে দিন.. যেতে দিন...।

গম্ভীর গলায় চেয়ারম্যান বললেন, মি. রাইকস, ঠিক করে বলুন ব্ল্যাকওয়াটার জংশনে মি. ডুয়েরিং হাউসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কিনা? আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ

আনা হয়েছে, তা হয় সত্য না হয় মিথ্যা। যদি সত্য হয় তবে আপনি পরিচালক মণ্ডলির সভার কাছে সারেন্ডার করুন এবং যা জানেন কোনো কথা গোপন না করে তা স্বীকার করুন।

অসহায় আতঙ্কে –নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় রাইকস তার দুহাত মোচড়াতে লাগল। এবার সে ভেঙে পড়ার মুখে।

আমি ওখানে ছিলাম না, আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল রাইকস, আমি সে সময় দুশো মাইল দূরে ছিলাম! এ ব্যাপারে কিছু জানি না আমি...আমার স্বীকার করার মতো কিছু নেই। আমি নির্দোষ... ফর গডস শেক, আমি নির্দোষ!

দুশো মাইল দূরে! চেয়ারম্যান প্রতিধ্বনি করলেন, আপনার কথার অর্থ কী?

আমি... আমি ডেভনশায়ারে ছিলাম। তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলাম আমি। মি. হান্টার জানেন সে কথা। বলুন স্যার, আমি সত্যি বলছি কিনা। গোটা ছুটিটাই আমি ডেভনশায়ারে কাটিয়েছি। আমি প্রমাণ করতে পারি, আমি সেখানে ছিলাম!

রাইকসকে ভীত এবং অসংলগ্নভাবে কথা বলতে দেখে বোর্ডের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে গম্ভীরভাবে ফিসফিস করতে লাগলেন। একজন নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বেয়ারাকে দরজায় পাহারা দেবার জন্য বলে এলেন।

আপনার ডেভনশায়ারে থাকার সঙ্গে এ ঘটনার কী সম্পর্ক? চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন, আপনি কখন ডেভনশায়ারে ছিলেন?

মি. রাইকস ছুটি নিয়েছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে আর সেই সময়েই মি. ডুয়েরিং হাউস নিখোঁজ হন, চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে সেক্রেটারি মি. হান্টার বললেন।

মি. ডুয়েরিং হাউস যে নিখোঁজ হয়েছেন এ কথা ছুটির পর অফিসে ফিরে আসার আগে আমি জানতে পারিনি, ভাঙা গলায় রাইকস বলল।

সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ, চেয়ারম্যান বললেন, আমি এক্ষুনি এ ব্যাপারটা পুলিশকে জানাব। আমি নিজেই ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদাসম্পন্ন। কাজেই এ মামলা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার আইনগত ক্ষমতা আমার আছে আর এ ধরনের মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমি অভ্যস্ত। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি– কোন বাধা দেবেন না, কোনরকম গোপনীয়তার আশ্রয় না নিয়ে সব কথা অকপটে স্বীকার করুন। স্বীকারোক্তি হয়তো আপনার সহায়ক হবে হয়তো আপনার অপরাধের গুরুত্বটাও কিছু হ্রাস পাবে তাতে। এ কাজে কে বা কারা আপনার সঙ্গী ছিল?

আমার কোনো সঙ্গী ছিল না, নতজানু হয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ভীত রাইকস, আমাকে দয়া করুন আমাকে বাঁচান। আমি সব কথা স্বীকার করব। আমি তাঁর কোনো

ক্ষতি চাইনি। তাঁকে আঘাত করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তার মাথার একগোছা চুলও আমি টানতে চাইনি। দয়া করুন... ছেড়ে দিন আমায়... আমাকে যেতে দিন... আমাকে যেতে দিন...।

চেয়ারম্যান উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে। চাপা মানসিক উত্তেজনায় তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, ওহ্ গড! এ কী ভয়ঙ্কর রহস্য! এ সবের অর্থ কী?

অর্থটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, আমার বন্ধু জোনাথন জেলফ বলল, এর অর্থ হলো একটা খুন। হ্যাঁ, আমার ধারণা মি, ডুয়েরিং হাউসকে খুন করা হয়েছে।

না! না! না! মার খাওয়া কুকুরের মতো রাইকস আর্তনাদ করে উঠল। না, না, খুন নয়...খুন নয়। কোনো জুরী একে খুন বলবে না। ভেবেছিলাম আমি তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলেছি। তার বেশি আমি কিছু করতে চাইনি। খুন? নরহত্যা? না, না, আমি তা করতে চাইনি... করতে চাইনি।

দারুণ আতঙ্কে এবং উত্তেজনায় রাইকসের কণ্ঠ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ঘটনাটা প্রকাশিত হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। দারুণ আতংকে দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারম্যান কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তিনি ভাবতেও পারেননি যে মি. ডুয়েরিং হাউসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।

মিনিট তিন-চার পরে তিনি বললেন, হতভাগা নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দিল! মি. রাইকস আপনি যে অপরাধ করেছেন তার শাস্তি জানেন?

স্যার, আপনি সব কথা স্বীকার করার আদেশ করলেন তাই স্বীকার করলাম। আপনার নির্দেশ মতোই আমি বোর্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করছি, ভাঙা গলায় বলল রাইকস।

আপনি এমন একটা অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করছেন, যা আপনার দ্বারা করা সম্ভব বলে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি, চেয়ারম্যান বললেন, এ অপরাধের শাস্তি দেয়া বা এ অপরাধের ক্ষমা করার ক্ষমতা এই বোর্ডের নেই। আপনাকে কেবল এটুকু উপদেশ দিতে পারি যে আপনি আইনের কাছে সারেন্ডার করুন। কোনো কথা গোপন না করে নিজের অপরাধ স্বীকার করুন। এবার বলুন কবে এ অপকর্মটা করেছিলেন?

অপরাধী উঠল ধীরে ধীরে। থরথর করে কাঁপছে। টেবিলে ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিল একটু। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বপ্নের ঘোরে বলল, বাইশে সেপ্টেম্বর।

বাইশে সেপ্টেম্বর! আমি জোনাথনের দিকে তাকালাম, সেও চমকে তাকাল আমার দিকে। আমার মনে একই সঙ্গে বিস্ময় এবং আতঙ্ক।

জোনাথনের মুখখানা মরার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। ফিসফিসিয়ে কাঁপা গলায় বলল ও, তাহলে.. তাহলে সেদিন ট্রেনে তুমি কাকে দেখেছিলে!?

এলিসিয়া

সান্ডারফোর্ডের চোখের রঙ ওর গায়ের মতোই–হলুদ। এলিজাবেথ অ্যানকে কঠোরভাবে বলা আছে সান্ডারফোর্ড কিংবা সে যেন কখনোই চিলেকোঠার ঘরে না যায়।

এলিজাবেথ অ্যান বাবা-মার সাথে এই প্রথম ওদের গ্রামের বাড়িতে এসেছে। ওরা থাকে আমেরিকার বোস্টনে।

গ্রামের বিশাল বাড়িটি ওদের কেয়ারটেকার দেখাশোনা করে। সে-ই। আসলে বলেছে চিলেকোঠার ঘরে যেন অ্যান জীবনেও না যায়।

কেন, প্রশ্ন করেছিল অ্যান। জবাবে রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসে চুপ করে থেকেছে কেয়ারটেকার।

মা মেয়েকে নিষেধ করে দিয়েছেন চিলেকোঠার ঘরে না ঢুকতে। ব্যাখ্যা দিয়েছেন শতাব্দী প্রাচীন অন্ধকার ও ঘর চামচিকা আর ধুলো-ময়লায় বোঝাই। ভয় পেতে পারে অ্যান। অসুখ বাধিয়ে বসাও বিচিত্র নয়।

চিলেকোঠার ঘর দেখার প্রচুর আগ্রহ এলিজাবেথ অ্যানের। তবে বাবা মার খুবই বাধ্য মেয়ে সে। ওঁরা কিছু নিষেধ করলে সে কাজ জীবনেও করবে না অ্যান।

কিন্তু আজ নেহায়েত ঠেকায় পড়ে চিলেকোঠার ঘরে আসতে হয়েছে। অ্যানকে। সান্ডারফোর্ডের কারণে।

সান্ডারফোর্ড ওরফে স্যান্ডি ভীষণ ছটফটে, দুষ্ট। কোথাও একদণ্ড স্থির থাকতে জানে না। ফুড়ুৎ করে অ্যানের কোল থেকে নেমে ছুটেছে চিলেকোঠার ঘরের দিকে। অ্যানকেও বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে পেছন পেছন। চিলেকোঠার ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়াল অ্যান। ব্যস্ত চোখ খুঁজছে সান্ডারফোর্ডকে। সিঁড়ির মাথায় কতগুলো বাক্সের মধ্যে হলদে লেজটাকে দেখতে পেল সে। সান্ডি, এদিকে আসো, নরম গলায় ডাকল অ্যান।

চিলেকোঠার ঘরের দরজায় তালা নেই। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কবাট। একটা হলুদ ঝিলিক দেখল অ্যান ফাঁকটার আড়ালে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সান্ডারফোর্ড।

সান্ডারফোর্ড, চলে আয় বলছি, এবার গলা চড়ল অ্যানের। তোর ও ঘরে যাওয়া নিষেধ, জানিস না?

কোনো সাড়া নেই সান্ডারফোর্ডের।

এদিকে এসো, এলিসিয়া। সান্ডারফোর্ড আমার কাছে। মিষ্টি, নরম একটা কণ্ঠ ভেসে এল চিলেকোঠার ঘর থেকে। জমে গেল অ্যান। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, ঘুরে তাকাল কণ্ঠের উৎসের দিকে।

একটা আরাম কেদারা। দেখলেই বোঝা যায় বহু পুরানো। ওতে বসে মৃদু দুলছেন এক বৃদ্ধা। তার মাথার চুল ধবধবে সাদা, চেহারা ভারী বিষণ্ণ। তাঁর কোলে সান্ডারফোর্ড, লেজ গুটিয়ে বসে আছে। দুজনেই তাকিয়ে আছে। অ্যানের দিকে। অতি প্রাচীন চেহারার বৃদ্ধার গায়ে নীল একটা গাউন।

এদিকে এসো, বৃদ্ধা আস্তে আস্তে হাত বোলাচ্ছেন সান্ডারফোর্ডের মাথায়। তোমার বেড়াল আমার কাছে। দেখতেই পাচ্ছ। ও আমার বন্ধু হয়ে গেছে, এলিসিয়া। হাসলেন তিনি। তবে তাঁর চোখ হাসছে না। আধো অন্ধকারে মনে হলো জ্বলছে চোখ জোড়া, চাউনিটাও কেমন কঠিন।

আমার নাম এলিসিয়া নয়, ঢোক গিলল অ্যান।

জানি, জানি সে কথা, সোনা, দ্রুত বলে উঠলেন তিনি। তবে তোমার চেহারা অবিকল এলিসিয়ার মতো। এত মিল তার সাথে তোমার যে তোমাকে এলিসিয়াই মনে হচ্ছে। তোমাকে এলিসিয়া ডাকলে তুমি কি খুব রাগ করবে? তোমাকে তো আমি এলিসিয়াই ভাবছি। তোমরা এ বাড়িতে আসার পর থেকে তোমাকে আমি দেখছি। তুমি যখন

বাগানে খেলা করো তখন তোমাকে আমি দেখি। এ জানালা দিয়ে। ছোট একটা জানালার দিকে হাত তুলে দেখালেন বৃদ্ধা। এত স্বচ্ছ চামড়া, অ্যানের মনে হলো চামড়া ভেদ করে জানালার গরাদগুলোও দেখতে পাচ্ছে সে। আমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি তুমি আসবে। বিশেষ করে আজকের দিনটার জন্য। আজ যে তুমি এগারোতে পা দিয়েছ, সোনা, আবার হাসলেন তিনি মিষ্টি করে।

বৃদ্ধা ঠিকই বলেছেন আজ এলিজাবেথ অ্যানের এগারোতম জন্মদিন।

কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এলিসিয়া, সোনা, বললেন তিনি। উঠে এসো। ঘরে এসো। তোমার সাথে কথা বলার জন্য কতদিন ধরে মুখিয়ে আছি আমি।

চিলেকোঠার ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না অ্যানের, ভয় লাগছে। মহিলার আচরণে কেমন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার আছে। অ্যান ভাবল, মাকে এ মহিলার কথা জানাবে।

এসো! গোঁ ধরে রইলেন বৃদ্ধা। তোমাকে আমার এলিসিয়ার ছবি দেখাব। দেখবে এলিসিয়ার সাথে তোমার কত মিল।

ধন্যবাদ। কিন্তু ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে না, বলল অ্যান।

আমি যাই, হঠাৎ মনে পড়ল কেন এখানে এসেছে সে। স্যান্ডি, এসো, ডাকল বটে, কিন্তু বেড়ালটা একটুও নড়ল না। আগের মতো বৃদ্ধার কোলে মুখ গুঁজে বসে রইল। মহিলা তার গাউনের নীল পকেটে গুঁজে রাখা ছোট একটা ছবি বের করে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন অ্যানকে।

এসো, এলিসিয়া। ছবি দেখ। তারপর সান্ডারফোর্ডকে যেতে দেব। এমনভাবে কথাটা বললেন যেন সান্ডারফোর্ডের যাওয়া না যাওয়া তার উপর নির্ভর করছে। সান্ডারফোর্ডকে ধরে রাখার তাঁর কী অধিকার আছে?

না, এলিজাবেথ অ্যান উপরে যাবে না। সে সিঁড়ির চার নম্বর ধাপে উঠল। এখান থেকে গলা বাড়িয়ে ছবিটা দেখা যাবে, তারপর সান্ডারফোর্ডকে নিয়ে নেমে যাবে নিচে। সে আরেক ধাপ সিঁড়ি উঠল।

হ্যাঁ, এসো সোনা। এসো।

ছবি না দেখলে অদ্ভুত মহিলা সান্ডারফোর্ডকে ছাড়বেন না বুঝতে পারল সময় বয়ে গেল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া। ছবিটি মহিলার হাত থেকে যেন পিছলে গেল, পাখা মেলল শূন্যে। তারপর ল্যান্ড করল ধুলোভরা মেঝেয়।

অ্যান ঝুঁকল মেঝের উপর থেকে ছবিটি কুড়িয়ে নিতে, ঠিক তখন চেয়ার থেকে লাফিয়ে নামল সান্ডারফোর্ড, সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ছবিটি হাতে নিয়ে সিধে হলো অ্যান। তাকাল শতাব্দী প্রাচীন রকিং চেয়ারটার দিকে। চেয়ার খালি। হঠাৎ করেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন বৃদ্ধা।

খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিল অ্যান। অদ্ভুত, ভাবল ও, গোটা ব্যাপারটা আসলে অদ্ভুত একটা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। নিজেকে প্রবোধ দিল ও। চিলেকোঠার ঘর নিয়ে নানা কথা ভেবেছি আমি তাই কল্পনায় ওই বুড়ি মহিলাকে দেখেছি।

কিন্তু পুরোটাই যদি কল্পনা হয়ে থাকে তাহলে এ ছবি এল কোত্থেকে!!

ছবিটি সাদা কালো, হলদেটে রঙ ধরেছে। ছোট একটি মেয়ের ফটোগ্রাফ। অবিকল এলিজাবেথ অ্যানের মতো দেখতে।

ছবিটা উল্টে দেখল অ্যান, পেছনে লেখা এলিসিয়া ফ্রস্ট, বয়স এগারো।

ছবি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল অ্যান, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের উপর রেখে দিল।

আজ অ্যানের জন্মদিন। বাবা অবশ্য কাউকে দাওয়াত দেননি। শুধু বিশাল একটি কেক এনেছেন আর মা তার মেয়ের পছন্দের পায়েল্লা আর পুডিং বেঁধেছেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষে, বাবা ড্রইংরুমে বসে পাইপ কুঁকছেন, রান্নাঘরে মাকে বাসন ধোয়ার কাজে সাহায্য করছে অ্যান।

ন্যাকড়া দিয়ে একটা প্লেট মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল অ্যান, এলিসিয়া কে, মা?

ওর মা মাংসের বাটি ধুতে ব্যস্ত, মেয়ের প্রশ্ন তেমন খেয়াল করলেন না, হালকা গলায় বললেন, জানি না মা। কে সে?

আমিও জানি না, জবাব দিল অ্যান। তবে এ নামে কেউ বোধহয় ছিল। ওই মেয়েটার একটা ছবি পেয়েছি আমি চিলেকোঠার ঘরে ...

মা ঝট করে ঘুরলেন মেয়ের দিকে। তোমাকে না ওখানে যেতে মানা করেছি?

যেতে চাইনি তো, মিনমিন করে বলল অ্যান। স্যান্ডিটা দৌড়ে গেল। আমাকেও তাই...

ঠিক আছে। আর যাবে না। হ্যাঁ, কী বলছিলে যেন?

বলছিলাম এলিসিয়া ফ্রস্ট, বয়স এগারো। মেয়েটার চেহারা অবিকল আমার মতো। বয়সও মিলে যায়।

এলিসিয়া ফ্রস্ট? মা এক মিনিট কী যেন ভাবলেন, চিলেকোঠার ঘরে? হুম...ওখানে অবশ্য অনেক পুরানো জিনিসপত্র আছে। তবে কোনো ছবি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।... ফ্রস্ট...দাঁড়াও! দাঁড়াও! মনে পড়েছে...ওটা তোমার গ্রেট-গ্রান্ডমাদারের নাম। এলিসিয়া ফ্রস্ট ছিলেন তোমার গ্রেট- গ্রান্ডমাদারের বোন। ছোট বেলায় মারা গেছেন তিনি।

অ্যান আরেকটা প্লেট মুছতে লাগল।

কিন্তু ... বলে চললেন মা, ওনার কোনো ছবি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কোথায় পেলে, ট্রাঙ্কে?

মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি, বলল অ্যান।

কোথায় ছবিটা?

আমার ঘরে।

প্লেট মোছা হলে অ্যান ছবিটা দেখাল মাকে। মনে মনে আফসোস হচ্ছে এখন ওই বৃদ্ধার কথাও বলতে হবে। যদিও অ্যান মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্রেফ কল্পনায় সে বুড়িকে দেখেছে।

হ্যাঁ, বললেন মা। তোমার গ্রেট-গ্রান্ডমাদারের বোনই বটে। ওই সময়ে তোলা ছবি। এ ছবিটি তোলার পরেই নিশ্চয় তিনি মারা যান। লোকে বলে মেয়েটির মৃত্যুর পর তার মা মানে তোমার গ্রেট–গ্রেট গ্রান্ডমাদার, এলিজাবেথ অ্যান-পাগল হয়ে যান। বছরের পর বছর এ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি আর শুধু এলিসিয়া নাম ধরে ডেকেছেন।

চিলেকোঠায় একটা রকিং চেয়ার দেখলাম–ওটা বোধহয় আমার গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ডমাদারের, তাই না? জিজ্ঞেস করে অ্যান।

হ্যাঁ। ওটা আমি বিয়ের পর থেকে ওখানে দেখে আসছি।

আমার চেহারা কি এলিসিয়ার মতো?

অনেকটা তো বটেই, জবাব দিলেন মা। চোখে চশমা পরে খুঁটিয়ে দেখলেন ছবিটি। তারপর মেয়েকে ওটা ফেরত দিয়ে বললেন, ভুল বললাম। অনেকটা নয়, পুরোটাই। আদর করে মেয়ের রেশম কালো চুল নেড়ে দিলেন। তোমরা দুজনেই খুব সুন্দরী।

ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটল ওখানেই। ছবির কথা অ্যান ভুলে গেল বেমালুম। তবে, পরদিন বিকেলে সে নিজের ঘরে ঢুকছে, কে যেন দূর থেকে ডাক দিল। এলিসিয়া-আ! ঘুরল অ্যান, ওর ঘর থেকে চিলেকোঠার ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। দরজা বন্ধ করে এসেছিল অ্যান। কিন্তু এখন ওটা হাট করে খোলা।

বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল অ্যানের। আমি কিছু শুনিনি, নিজেকে প্রবোধ দিল ও। সব আমার কল্পনা। আমি যাব না। আমি আর চিলেকোঠার ঘরে যাব না।

এলিসিয়া-আ-আ! দূরাগত ডাকটি মৃদু, তবে নরম এবং পরিষ্কার।

যাব না আমি, নিজেকে বোঝাল অ্যান, ও ঘরে কেউ নেই। কারও অস্তিত্ব নেই। আমি স্রেফ কল্পনায় বুড়িকে দেখেছি। অ্যান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, চিলেকোঠার দরজা আবার বন্ধ করে দিল। তারপর চলে এল নিজের ঘরে।

অ্যান জানত না এজন্য ওকে কী দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

.

গভীর ঘুমের স্তর থেকে অস্বস্তি নিয়ে জেগে গেল এলিজাবেথ অ্যান, দেখল তার পায়ের কাছে বসা সান্ডারফোর্ড, আঁধারে চোখ জ্বলছে। আর তার পেছনে নীল গাউন পরা চিলেকোঠার সেই বুড়ি। তবে হাসছেন না তিনি, শ্বাপদের মতো জ্বলছে চোখ।

তোমাকে আমি ডেকেছিলাম, বললেন তিনি কঠিন গলায়। তুমি আসনি। তুমি ভীষণ বেয়াদব। আমরা সারাটা বিকেল তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। আসনি কেন?

মহিলার গলার স্বর ভয় পাইয়ে দিল অ্যাকে। গায়ের কথাটা চিবুক পর্যন্ত টেনে নিল। আমতা আমতা করে বলল, আপনি মানে...।

মানে মানে করতে হবে না, হিসিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। যখনই ডাকব, চলে আসবে তুমি...

ভয়ে চোখে জল এসে গেল অ্যানের। মাকে ডাকার জন্য হাঁ করল, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজই বেরুল না।

হঠাৎ মহিলার চেহারা বদলে গেল, মিষ্টি এবং বিমর্ষ লাগল তাঁকে। এলিসিয়া, আমার সোনা... আমি তোকে ভয় দেখাতে চাইনি রে, সোনা। তোর অভাব খুব অনুভব করছি আমি। অবশেষে তোর দেখা পেয়েছি। কথা দে, প্রতিদিন তুই আমার কাছে আসবি।

নিজের জায়গায় ফিরে যান, ফুঁপিয়ে উঠল অ্যান, আপনার ঘরে যান, প্লিজ...

যাব রে, মা। যাচ্ছি তো, শিরা ওঠা হাত বাড়িয়ে অ্যানের গাল ছুঁলেন তিনি আদর করে। শুধু আমাকে কথা দে, কাল আমার ওখানে আসবি। কথা বলবি এই নিঃসঙ্গ, অসহায় বুড়ির সাথে।

আচ্ছা, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল অ্যান।

সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা, আর সান্ডারফোর্ড চোখ বুজে পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ল।

.

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গত রাতের কথা কিছুই মনে থাকল না অ্যানের। বাথরুমে ঢুকল মুখ হাত ধুতে। আয়নার দিকে তাকাল এবং চমকে উঠল।

ডানদিকের গালে লালচে তিলের মতো একটা দাগ। আঙুল দিয়ে ওখানে ঘষল অ্যান। উঠল না দাগটা। হঠাৎ গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। মহিলা ডান গালে হাত ছুঁইয়েছিল। কিন্তু ... কিন্তু ওটা তো স্বপ্ন ছিল, তাই না? আসলে মশা কামড় দিয়েছে, তাই ফর্সা গালে লালচে দাগ ফুটে আছে। নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নাস্তার টেবিলে গেল অ্যান।

ওর মা মেয়ের গাল পরীক্ষা করে বললেন, মশা কামড়েছে। তোমার ঘরে অ্যারোসল স্প্রে করে দিচ্ছি। আর মশা ঢুকতে পারবে না।

তবে কাল রাতের স্বপ্নটা নিয়ে সারাটা দিন বিব্রত থাকল অ্যান। ঘুমাবার সময় যত এগিয়ে এল, অস্বস্তিটা বেড়ে চলল। একবার ভাবল মাকে বলবে ঘটনাটা। উঁহু, মা শুনলে এমন ঠাট্টা শুরু করে দেবেন, রীতিমতো লজ্জায় পড়ে যাবে অ্যান। বলবেন হরর গল্প পড়ে হরর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। থাক্, মাকে বলতে হবে না।

ঘুমাবার সময়, জীবনে এই প্রথম খাটের তলা, আলমারি ইত্যাদি দেখে নিল ও। তারপর দরজায় খিল দিল। টেনেটুনে দেখল ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে কিনা।

বিছানায় উঠে পড়ল অ্যান, হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচ অফ করল।

আজ রাতে আমি ঘুমাব না, মনে মনে বলল অ্যান। তাই করল সে। এক ঘণ্টা আঁধারে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

তারপর ঘুমে চোখ বুজে আসছে, ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটল। বাম পায়ে কীসের শক্ত পুঁতো খেয়ে লাফিয়ে উঠল অ্যান। ধড়মড় করে উঠে বসল।

বিছানার কিনারায় বসে আছেন সেই বৃদ্ধা। হাসছেন। চাঁদের আলোয় ঘরের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার। মহিলার চোখ জ্বলছে সান্ডারফোর্ডর মতো, শক্ত করে ধরে আছেন অ্যানের পায়ের গোড়ালি।

সান্ডারফোর্ড তাঁর পাশেই, ভয়ানক লাগছে ওকে। শরীরটা ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়েছে। হাঁ করা মুখ, ধবধবে সাদা দাঁত বের হয়ে আছে।

অ্যান শুনল মহিলা বলছেন ফিসফিস করে...এবার আমার সময়... এলিসিয়া...তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ...বলেছিলে আসবে... আসনি... আমাকে তাই আসতে হয়েছে...আমি তোমাকে আজ নিয়ে যাব আমার সাথে...

ধস্তাধস্তি করল অ্যান, কিন্তু বুড়ির গায়ে কী শক্তি, অবলীলায় ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বিছানার প্রান্তে। আমি তোমাকে শিক্ষা দেব... তোমার কত বড় সাহস. . .কথা দিয়ে কথা রাখ না...

অ্যান গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে গোঙানি ছাড়া কিছুই বেরুল না। প্রাণপণ চেষ্টা করছে বুড়ির বজ্রমুষ্ঠি থেকে পা ছুটিয়ে নেয়ার।

আমরা এবার চলে যাব ... আমরা তিনজন... সারাজীবনের জন্য... আমার এলিসিয়া...

হাত বাড়াল অ্যান কিছু একটা আঁকড়ে ধরার জন্য। কিন্তু হাতে কিছুই বাঁধল না, ওকে বুড়ি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছেন...

এবার তিনি অ্যানের চুল ধরলেন মুঠো করে। ব্যথায় গায়ে আগুন ধরে গেল ওর। প্রাণপণ শক্তিতে বুড়ির বুকে দুহাত দিয়ে রাম ধাক্কা মারল অ্যান। ফুসফুস থেকে সমস্ত দম বেরিয়ে যাবার মতো হিস শব্দ শুনল ও। বন্ধন মুক্ত হয়ে গেল অ্যান।

দ্রুত গড়ান দিয়ে মেঝেতে নামল অ্যান, আর তখন সান্ডারফোর্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর, নখ বসে গেল কাঁধে। তীব্র ব্যথাটা যেন ফুসফুসে শক্তি যোগাল অ্যানের, মুখ হাঁ করল ও, গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার। সান্ডারফোর্ডকে দুহাতে ধরল ও, ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ওর কব্জি চেপে ধরল শুকনো, খটখটে একটা হাত। করে ঘুরল অ্যান। ভৌতিক বুড়ি, দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে, ভয়ানক লাগছে দেখতে। ঠিক যেন একটা ডাইনি।

ওদিকে বন্ধ দরজায় ক্রমাগত দমাদম করাঘাত পড়ছে। অ্যানের মার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এল, কী হয়েছে, অ্যান? দরজা বন্ধ করে রেখেছ কেন... অ্যান?

ডাইনি বুড়ির কী শক্তি! অ্যানকে হাত মুচড়ে জানালার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যান আবার চিৎকার দিল। বুড়ির গলা সাপের মতো হিসহিস করে উঠল কানের পাশে, তোকে আসতেই হবে... আজ থেকে তুই আমার এলিসিয়া... আমার ...

হ্যাঁচকা টানে অ্যান ছিটকে পড়ল জানালার ওপর, খট করে খুলে গেল জানালা। টের পেল ওকে জানালা দিয়ে টেনে বের করার চেষ্টা করছে বুড়ি। জানালার ফ্রেম ধরে ফেলল অ্যান, প্রাণপণে ঝুলে রইল...

এমন সময় ভেঙে পড়ল বেডরুমের দরজা, জ্বলে উঠল আলো। জানালার ফ্রেম ছেড়ে দিল অ্যান, পড়ে গেল মেঝেতে। ওর বাবা-মা ছুটে গেলেন ওর দিকে।

এরপরের ঘটনাগুলো যেন ঘোরের মধ্যে ঘটতে লাগল। কাঁদছে অ্যান, ওর মা কাঁধে সান্ডারফোর্ডের নখের আঁচড় পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, ব্যান্ডেজ করছেন, ফোঁপাতে ফোঁপাতে অ্যান বলছে, না, স্যান্ডিকে মেরো না। ওর কোনো দোষ নেই। সান্ডারফোর্ড ভয়ের চোটে আলমারির আড়ালে পালিয়েছে।

অনেক সময় লাগল অ্যানের ধাতস্থ হতে। তারপর বলল, সবকিছুর নষ্টের গোড়া চিলেকোঠার রকিং চেয়ারটা...ওটা পুড়িয়ে ফেল... তারপর সে বাবা-মাকে সমস্ত ঘটনা বলল।

বাবা চিলেকোঠা থেকে আরাম কেদারাটা নিয়ে এলেন। কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। সে দৃশ্য অ্যান দেখল স্থির চোখে, তার পায়ের নিচে বসে থাকল সান্ডারফোর্ড।

সে-ও দেখল শতাব্দী প্রাচীন আরাম কেদারাটাকে গ্রাস করছে আগুনের লেলিহান শিখা, পুড়ে যাচ্ছে ওটা।

–লুইজি ফ্রাঙ্কি

ঘাতক

খুন হয়ে যাচ্ছে, এই ভয়টা যেদিন থেকে পেয়ে বসল ওকে, সাহস করে কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। আশঙ্কাটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল গত কয়েকমাস ধরে, ধীরে ধীরে প্রবল হচ্ছিল সন্দেহ, ছোট্ট কয়েকটা ঘটনা সেটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। গভীর এবং তীব্র এক স্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে সে এই মুহূর্তে, নিচের দিকে প্রচন্ড জোরে কে যেন টানছে ওকে, কালো এবং বিশাল এক গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। অষ্ট, টেনিস বল সাইজের ড্যাবডেবে চোখওয়ালা বিকট চেহারার কী ওটা? গোল গোল, চাকা চাকা দাগ খুঁড়গুলোর, এক সঙ্গে প্রসারিত হলো সবকটা; একটা ঝিলিক দেখল সে শুধু, পরক্ষণে টের পেল হিলহিলে গুঁড়গুলো তাকে বেঁধে ফেলেছে ঠান্ডা, কঠিন নিষ্পেষণে। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, চিৎকার করতে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে...

ঘরটাকে তার মনে হলো বিশাল এক সমুদ্র, ভেসে আছে সে। কিন্তু চারপাশে ওরা কারা? সাদা মুখোশ পরা, হাতে ধারাল যন্ত্রপাতি, কথা বলছে নিচু স্বরেকে আমি, ভাবার চেষ্টা করল সে; কী নাম আমার?

অ্যালিস লিবার। বিদ্যুৎ চমকের মতো নিজের নামটা মনে পড়ল তার । ডেভিড লিবারের স্ত্রী। কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বোধটা দূর হলো না। নিজেকে ভীষণ একা এবং অসহায় মনে হচ্ছে মুখোশধারী লোকগুলোর মাঝে। প্রচন্ড ব্যথা তার শরীরে, বমি উগরে আসতে চাইছে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে মৃত্যুভয়।

আমি ওঁদের চোখের সামনে খুন হয়ে যাচ্ছি, ভাবল অ্যালিস। ডাক্তার কিংবা নার্সরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছেন না আমার শরীরে কী ভয়ঙ্কর একটা জিনিস ঘাপটি মেরে আছে। জানে না ডেভিডও। শুধু আমি জানি। আর জানে ওই খুনিটা–খুদে গুপ্তঘাতক।

মারা যাচ্ছি আমি। কিন্তু কাউকে কথাটা বলতে পারছি না। আমার সন্দেহের কথা শুনলে ওঁরা হাসবেন, বিদ্রূপ করে বলবেন–প্রলাপ বকছি। আমি। কিন্তু খুনিটাকে ওঁরা ঠিকই কোলে তুলে নেবেন, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবেন না আমার মৃত্যুর জন্য ওটাই দায়ী। শুধু সবাই শোক প্রকাশ করবে আর আমার খুনীর জন্য সবার দরদ উথলে পড়বে।

ডেভিড কোথায়? অবাক হলো অ্যালিস। নিশ্চয়ই ওয়েটিং রুমে। একটার পর একটা সিগারেট ফুকছে আর ঘড়ির দিকে একঠায় তাকিয়ে অপেক্ষা করছে কখন শুনবে সংবাদটা। অ্যালিসের শরীর হঠাৎ ঘেমে গোসল হয়ে গেল, প্রচন্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ও। এবার! আসছে। ওটা! আমাকে খুন করতে আসছে! চিৎকার শুরু করল সে। কিন্তু আমি মরব না। কিছুতেই মরব না!

বিশাল এক শূন্যতা গ্রাস করল অ্যালিসকে। খালি খালি লাগল পেট। ব্যথাটা হঠাই চলে গেছে। প্রচন্ড ক্লান্ত লাগল নিজেকে। অন্ধকারের একটা পর্দা দ্রুত নেমে আসছে চোখের ওপর। হে ঈশ্বর, আঁধারের রাজ্যে হারিয়ে যেতে যেতে ভাবল অ্যালিস, শেষ পর্যন্ত ঘটেছে তাহলে ব্যাপারটা...

পায়ের শব্দ শুনতে পেল অ্যালিস। আস্তে আস্তে কে যেন হেঁটে আসছে।

দূরে, একটা কণ্ঠ বলে উঠল, ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। ওকে এখন ডিস্টার্ব কোরো না।

পরিচিত শেভিং লোশনের সুঘ্রাণ স্বর্গের শান্তি বইয়ে দিল অ্যালিসের . শরীরে। ডেভিড । ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কণ্ঠটা ডা. জেফারসের।

চোখ খুলল না অ্যালিস। নরম গলায় বলল, আমি জেগে আছি। অবাক কান্ড। কথা বলছে সে। তার মানে মারা যায়নি!

অ্যালিস! অনুভব করল ওর হাত দুটো উষ্ণ আবেগে চেপে ধরেছে ডেভিড।

তুমি খুনিটার সঙ্গে দেখা করতে চাইছ, ডেভিড, ভাবল অ্যালিস। আমি শুনতে পাচ্ছি তুমি ওটাকে দেখতে চাইছ, তাহলে আর আমার কিছুই বলার নেই। চোখ খুলল অ্যালিস। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড। দুর্বল হাতটা বাড়াল অ্যালিস, শুজনিটা সরাল একপাশে।

ঘাতক তাকাল ডেভিডের দিকে। তার ছোট্ট মুখটা লাল, কালো গভীর চোখ জোড়া শান্ত। ঝিকমিক করছে।

ইসসিরে! হেসে উঠল ডেভিড। কী সুন্দর আমার সোনাটা! চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকল সে, আস্তিন ধরে টান দিলেন ডা. জেফারস।

না, না, এখন নয়, পরে, বললেন তিনি। নবজাতক শিশুকে এভাবে চুমু খেতে নেই। তুমি আমার চেম্বারে এসো। কথা আছে।

যাওয়ার আগে অ্যালিসের হাতে চাপ দিল ডেভিড। কৃতজ্ঞ গলায় বলল, ধন্যবাদ, অ্যালিস। অসংখ্য ধন্যবাদ।

ক্লিষ্ট হাসল অ্যালিস। কিছু বলল না।

ডাক্তারের রুমে ঢুকল ডেভিড । হাত ইশারায় ওকে বসতে বললেন ডা. জেফারস। একটা সিগারেট ধরালেন। গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ চুপচাপ টানলেন ওটা। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। সোজা তাকালেন ডেভিডের চোখে।

বাচ্চাটাকে তোমার স্ত্রী মেনে নিতে পারছে না, ডেভিড।

কী!

ওর জন্য খুব কঠিন সময় গেছে। তোমাকে তখন বলিনি তোমার টেনশন বাড়বে বলে। ডেলিভারি রুমে অ্যালিস হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চিৎকার করে অদ্ভুত সব কথা বলছিল–আমি ওগুলো রিপিট করতে চাইছি না। তবে বুঝতে পারছি বাচ্চাটাকে সে নিজের বলে ভাবতে পারছে না। তবে এর কারণটা আমি তোমাকে দুএকটা প্রশ্ন করে জানতে চাই। সিগারেটে বড় একটা টান দিলেন ডাক্তার, একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললেন, বাচ্চাটা কি ওয়ান্টেড চাইল্ড, ডেভিড?

একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

জানাটা খুব জরুরি।

অবশ্যই সে ওয়ান্টেড চাইল্ড, আমরা একসঙ্গে এ নিয়ে প্ল্যান করেছি। অ্যালিস তখন কত খুশি–

হুমম–সমস্যাটা তো হয়েছে ওখানেই। যদি বাচ্চাটা আনপ্ল্যানড হত তাহলে ব্যাপারটাকে সাধারণ কেস বলে ধরে নিতাম। অপ্রত্যাশিত শিশুকে বেশিরভাগ মা-ই ঘৃণা করে। কিন্তু অ্যালিসের ক্ষেত্রে এটা ঠিক মিলছে না।

ডা. জেফারস সিগারেটটা ঠোঁট থেকে আঙুলের ফাঁকে ধরলেন, অন্য হাত দিয়ে চোয়াল ঘষতে ঘষতে বললেন, তাহলে ব্যাপারটা অন্য কিছু হবে। হয়তো শৈশবের কোনো

ভীতিকর স্মৃতি ওর তখন মনে পড়েছে। কিংবা আর সব মায়ের মতোই সন্তান জন্ম দেবার সময় মৃত্যুভয় ওকে কাবু করে ফেলেছিল। যদি এরকম কিছু হয় দিন কয়েকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে, ডেভিড, একটা কথা–অ্যালিস যদি তোমাকে বাচ্চাটার ব্যাপারে কিছু বলে... মানে... ইয়ে, সে চেয়েছিল বাচ্চাটা মৃত জন্ম নিক, তাহলে কিন্তু শকড হয়ো না। আশা করছি সব ঠিক থাকবে। আর যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ওদেরকে নিয়ে এই ব্যাচেলর বুড়ো ডাক্তারের চেম্বারে চলে এসো, কেমন? তোমাদেরকে এমনিতেও দেখতে পেলে খুবই খুশি হব।

ঠিক আছে, ড. জেফারস। অ্যালিস একটু সুস্থ হলেই সপরিবারে আপনার বাসায় আবার যাব।

চমৎকার একটি দিন। মৃদু গুঞ্জন তুলে টয়োটা স্কারলেট ছুটে চলেছে বুলেভার্ডের দিকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডেভিড। আহা, কি সুন্দর নীল আকাশটার রঙ! কাঁচ নামিয়ে দিল ও। রাস্তার পাশের একটা ফুলের দোকান থেকে সুবাস ঝাঁপটা মারল নাকে। প্রাণভরে গন্ধটা টানল ডেভিড। সিগারেটের আনকোরা প্যাকেটটার সেলোফেন ছিঁড়ে একটা সিগারেট জল ঠোঁটে। টুকটাক কথা বলছে অ্যালিসের সঙ্গে। অ্যালিস হালকাভাবে জবাব দিচ্ছে। বাচ্চাটা ওর কোলে। ডেভিড খেয়াল করল আলগোছে ধরে আছে। সে ছোট্ট মানুষটাকে। মাতৃসুলভ কোনো উষ্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে না অ্যালিসের আচরণে। যেন কোলে শুয়ে আছে চীনে মাটির একটা পুতুল। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল ডেভিড।

আচ্ছা! শিস দিয়ে উঠল ও। বাচ্চার নাম কী রাখব আমরা?

অ্যালিস বাইরের সবুজ গাছগাছালি দেখতে দেখতে উদাসীন গলায় বলল, এখনও ঠিক করিনি। তবে একদম আলাদা কোনো নাম রাখতে চাই আমি। এখনই এ নিয়ে গবেষণায় বসতে হবে না। আর দয়া করে বাচ্চার মুখে সিগারেটের ধোয়া ছেড়ো না তো। বলল বটে, কিন্তু এ যেন নিছক বলার জন্যই বলা।

অ্যালিসের গা ছাড়া ভাব আহত করল ডেভিডকে। সিগারেটটা ফেলে দিল জানালা দিয়ে। দুঃখিত, বলল ও।

বাচ্চাটা চুপচাপ শুয়ে আছে তার মায়ের কোলে। দ্রুত অপসৃয়মান গাছের ছায়ারা খেলা করছে তার মুখে। কালো চোখ দুটো খোলা। ছোট্ট, গোলাপী, রবারের মতো মুখ হাঁ করে ভেজা শ্বাস ফেলছে।

অ্যালিস এক পলক তাকাল তার বাচ্চার দিকে। শিউরে উঠল।

ঠান্ডা লাগছে? জানতে চাইল ডেভিড।

অল্প। কাঁচটা তুলে দাও। ঠান্ডা গলায় বলল অ্যালিস।

ডেভিড ধীরে জানালার কাঁচ ওঠাল।

দুপুর বেলা।

ডেভিড বাচ্চাটাকে নার্সারী রুম থেকে নিয়ে এসেছে, উঁচু একটা চেয়ারের চারপাশে অনেকগুলো বালিশ রেখে তার মধ্যে শোয়াল ওকে।

অ্যালিস খাবার দিতে দিতে বলল, ওকে অত উঁচু চেয়ারে শুইয়ো না। পড়ে টরে যাবে।

আরে না, পড়বে না। দেখো এখানে ও দিব্যি আরামে ঘুমাবে। হাসছে ডেভিড। খুব ভাল লাগছে ওর। দেখো, দেখো, ওর মুখ দিয়ে লালা পড়ে কেমন চিবুক ভিজিয়ে দিয়েছে! তোয়ালে দিয়ে বাচ্চার মুখ মুছে দিল ডেভিড। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল এদিকে তাকিয়ে নেই অ্যালিস।

বুঝলাম সন্তান জন্ম নেবার সময়টা খুব সুখকর কিছু নয়, চেয়ারে বসতে বসতে বলল ডেভিড। কিন্তু সব মায়েরই তার বাচ্চার প্রতি কিছু না কিছু মায়া থাকে।

ঝট করে মুখ তুলল অ্যালিস। ওভাবে বলছ কেন? ওর সামনে এসব কথা কক্ষনো বলবে না। পরে বোলো। যদি তোমার বলার এত ইচ্ছে থাকে।

কীসের পরে! সংযম হারাল ডেভিড। ওর সামনে বললেই বা কি আর পেছনে বললেই বা কি! হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল ও। ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেছে। অ্যালিসের মানসিক অবস্থা এখন ভাল নয়। ওর সঙ্গে রাগারাগি করা চলবে না। ঢোক গিলল ডেভিড। নিচু গলায় বলল, দুঃখিত, অ্যালিস।

কোনো কথা বলল না অ্যালিস। প্রায় নিঃশব্দে শেষ হলো ওদের মধ্যাহ্ন ভোজন।

রাতে ডিনারের পর, ডেভিড বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেল ওপরে। অ্যালিস ওকে কিছু বলেনি। কিন্তু ওর নিরব অভিব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল কাজটা ডেভিডকেই করতে হবে।

নার্সারীতে বাচ্চাকে রেখে নিচে নেমে এল ডেভিড। রেডিওতে মিউজিক বাজছে, অ্যালিস সম্ভবত শুনছে না। ওর চোখ বন্ধ, আড়ষ্টভাবে শুয়ে আছে বিছানায়। শব্দহীন পায়ে এগিয়ে এল ডেভিড। দাঁড়াল অ্যালিসের পাশে। একটা হাত রাখল চূর্ণ কুন্তলে। চমকে চোখ মেলে চাইল অ্যালিস। স্বামীকে দেখে স্বস্তি ফুটল দুচোখের তারায়। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, জড়িয়ে ধরল সে ডেভিডকে। ডেভিড টের পেল ওর আড়ষ্ট শরীর ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রচন্ড ভয় পেয়েছিল কোনো কারণে, এখন পরম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে স্বামীর বুকে। ডেভিড ওর ঠোঁট খুঁজল। অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল দুজোড়া অধর।

তুমি, তুমি খুব ভাল, ডেভিড, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যালিস। কত নিশ্চিন্তে তোমার ওপর ভরসা করতে পারি আমি! এত নির্ভরযোগ্য তুমি!

হাসল ডেভিড। বাবা বলতেন–পুত্র, মনে রেখো, তোমার সংসারে তুমিই একমাত্র অবলম্বন।

কালো, উজ্জ্বল কেশরাজি ঘাড় থেকে সরাল অ্যালিস। তোমার বাবার যোগ্য পুত্রই হয়েছ বটে। তোমাকে পেয়ে এত সুখী আমি। জানো, প্রায়ই ভাবি এখনও যেন আমরা নবদম্পতিই রয়ে গেছি। আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে হচ্ছে না, কারও দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না, আমাদের কোনো সন্তান নেই।

ডেভিডের হাত দুটো নিজের গালে ছোঁয়াল অ্যালিস। হঠাৎ অস্বাভাবিক সাদা হয়ে উঠেছে তার মুখ।

ওহ, ডেভিড, একটা সময় ছিল যখন ছিলাম শুধু তুমি আর আমি। আমরা পরস্পরকে নিরাপত্তা দিতাম। আর এখন এই বাচ্চাটাকে আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে, কিন্তু বদলে তার কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তা পাব না। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমি কত কিছু চিন্তা করেছি। দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মন্দ জায়গা-

তাই কি?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আইন সকল মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করে। যখন আইন বলে কিছু থাকে না তখন ভালবাসা নিরাপত্তার সন্ধান দেয়। আমি তোমাকে আঘাত করছি, কিন্তু আমার ভালবাসা তোমাকে রক্ষা করছে। যদি ভালবাসা না থাকত তাহলে পৃথিবীর সব মানুষই অসহায় হয়ে পড়ত। আমি তোমাকে ভয় পাই না। কারণ আমি জানি তুমি আমার ওপর যত রাগ করো, বকা দাও, খারাপ ব্যবহার করো, সব কিছুর ওপর ছাপিয়ে ওঠে আমার প্রতি তোমার গভীর প্রেম, নিবিড় ভালবাসা। কিন্তু বাচ্চাটা? ও এত ছোট যে ভালবাসা কিংবা অন্য কোনো কিছুই সে বুঝবে না যতক্ষণ না আমরা তাকে ব্যাপারটা বোঝাই। যেমন ধর, ও কি এখন বুঝবে কোনটা ডান আর কোনটা বাম?

এখন বুঝবে না। তবে সময় হলে শিখে নেবে।

কিন্তু... কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল অ্যালিস, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ডেভিডের বাহুবন্ধন থেকে।

কীসের যেন শব্দ শুনলাম!

ডেভিড চারদিকে চাইল । কই, আমি তো কিছু শুনিনি...। লাইব্রেরি ঘরের দরজার দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে। অ্যালিস। ওই ওখানে, ফিসফিস করে বলল সে।

ঘর থেকে বেরুল ডেভিড, খুলল লাইব্রেরি ঘরের দরজা। আলো জ্বেলে এদিক ওদিক চাইল। কিছু চোখে পড়ল না। আলো নিভিয়ে আবার ফিরে এল অ্যালিসের কাছে। নাহ্, কিছু নেই, বলল ও। তুমি আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। নাও, এখন শুতে চলো দেখি।

নিচতলার সব আলো নিভিয়ে ওরা উঠে এল ওপরে। সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে অ্যালিস বলল, অনেক আজেবাজে কথা বলেছি, ডেভিড । কিছু মনে কোরো না। আসলেই আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।

অ্যালিসের কাঁধে হাত রাখল ডেভিড। কিছু মনে করেনি সে।

নার্সারী রুমের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল অ্যালিস, ইতস্তত করছে। তারপর হাত বাড়াল পেতলের নবের দিকে, দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে। খুব সাবধানে এগিয়ে চলল বাচ্চার দোলনার দিকে। ঝুঁকল অ্যালিস, সঙ্গে সঙ্গে কাঠ হয়ে গেল শরীর। ডেভিড! চিৎকার করল ও।

দৌড়ে দোলনার কাছে চলে এল ডেভিড।

.

বাচ্চাটার মুখ টকটকে লাল, সম্পূর্ণ ভেজা; ছোট্ট হাঁ-টা বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে; চোখ দুটো যেন জ্বলছে রাগে। হাতজোড়া সে তুলে রেখেছে শূন্যে, যেন বাতাস খামচে ধরার চেষ্টা করছে।

আহারে, দরদ ঝরে পড়ল ডেভিডের গলায়, আমার সোনাটা না জানি কতক্ষণ ধরে কেঁদেছে।

কেঁদেছে? অ্যালিস দোলনার একটা পাশ আঁকড়ে ধরল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। কই কান্নার আওয়াজ তো শুনলাম না।

দরজা বন্ধ, শুনবে কী করে?

এজন্যই বোধহয় ওর মুখ এত লাল আর এত জোরে শ্বাস টানছে?

অবশ্যই। আহারে, আমার সোনা রে । অন্ধকারে একা কেঁদে কেঁদে না জানি কত কষ্টই পেয়েছে। আজ রাতে ওকে আমাদের ঘরে নিয়ে যাই, কি বলো? এখানে একা থাকলে আবার যদি কাঁদে।

আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ওকে নষ্ট করবে, বলল অ্যালিস।

কোনো কথা না বলে বাচ্চাটাকে দোলনাসহ নিজেদের শোবার ঘরে নিয়ে চলল ডেভিড। টের পেল অ্যালিসের চোখ তাদেরকে অনুসরণ করছে।

.

নিঃশব্দে কাপড় ছাড়ল ডেভিড। বসল খাটের এক কোনায়। হঠাৎ কি মনে পড়তে হাতের তালুতে ঘুসি মারল ও।

ধুত্তুরি! তোমাকে বলতে ভুলেই গেছি। আমাকে সামনের শুক্রবার শিকাগো যেতে হবে।

আবার শিকাগো কেন?

যাওয়ার কথা ছিল তো আরও দুমাস আগে। তোমার কথা ভেবে পিছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওদিকের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে না গেলেই নয়।

কিন্তু তুমি গেলে যে আমি একদম একা হয়ে পড়ব।

তোমার জন্য নতুন হাউজকীপার ঠিক করেছি আমি। মহিলা শুক্রবার আসবে। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমি তো মাত্র অল্প কটা দিন থাকব।

তবুও আমার ভয় করছে। কেন জানি না এত বড় বাড়িতে একা থাকার কথা ভাবলেই বুকটা কেমন করে ওঠে। আমি যদি তোমাকে সব কথা খুলে বলি তুমি নির্ঘাত আমাকে পাগল ঠাওরাবে। আমার মনে হচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাব।

বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ডেভিড। ঘরের বাতি নেভানো। অন্ধকারে বিছানার ধারে হেঁটে এল অ্যালিস, ব্ল্যাংকেট তুলল, ঢুকল ভেতরে। ক্রিমের মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল, রমণীর উষ্ণ শরীর উত্তেজিত করে তুলল ডেভিডকে। সে অ্যালিসকে জড়িয়ে ধরল। তুমি যদি আমাকে আরও কয়েকটা দিন পরে যেতে বলো তাহলে আমি

না, শরীর থেকে ডেভিডের হাতটাকে আস্তে সরাল অ্যালিস। তুমি যাও। আমি জানি ব্যাপারটা জরুরি। আমি আসলে তোমাকে যে কথাগুলো বললাম তখন সেগুলো সম্পর্কে এখন ভাবছি। কিন্তু বাচ্চাটা- শ্বাস টানল ও। তোমাকে সে কি নিরাপত্তা দেবে, ডেভিড?

কী বলা যায় ভাবছিল ডেভিড। বলবে যে সে যতসব আজগুবি ব্যাপার নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে মরছে? এমন সময় খুট করে বেড সুইচ টিপল অ্যালিস। সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হলো বেডরুম।

দ্যাখো, আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল অ্যালিস।

বাচ্চাটা শুয়ে আছে দোলনায়। চকচকে কালো চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

আবার বাতি নেভাল অ্যালিস। সরে এল ডেভিডের দিকে। থরথর করে কাঁপছে ওর শরীর।

যাকে আমি জন্ম দিয়েছি তাকে এত ভয় পাব কেন, অ্যালিসের ফিসফিসে কণ্ঠ কর্কশ এবং দ্রুত হয়ে উঠল। কারণ ও আমাকে খুন করতে চেয়েছে। ও ওখানে শুয়ে আছে, আমাদের সব কথা শুনছে, সব বুঝতে পারছে। অপেক্ষা করছে কবে তুমি বাইরে যাবে আর সে আবার আমাকে খুন করার চেষ্টা চালাবে। ঈশ্বরের দোহাই বলছি! কান্নায় গলা বুজে এল অ্যালিসের।

প্লীজ! ওকে থামাতে চেষ্টা করল ডেভিড। কেঁদো না, প্লীজ!

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অ্যালিস অন্ধকারে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে থাকল। আস্তে আস্তে কাঁপুনিটা কমে গেল, নিঃশ্বাস হয়ে উঠল। স্বাভাবিক এবং নিয়মিত। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

চোখ লেগে এল ডেভিডেরও।

ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে একটা শব্দ শুনল সে।

ছোট্ট, ভেজা, রবারের ঠোঁট থেকে একটা শব্দ। ঘুমিয়ে পড়ল ডেভিড।

.

সকালবেলা ঝরঝরে মন নিয়ে ঘুম থেকে জাগল ওরা। অ্যালিস মধুর হাসল স্বামীর দিকে চেয়ে। হাতঘড়িটা দোলনার ওপর দোলাল ডেভিড, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল কাঁচ। দেখো, বাবু, দেখো, কি চকমকে, কি সুন্দর! কি চকমকে, কি সুন্দর! সুর করে বলছে সে।

আবারও হাসল অ্যালিস স্বামীর ছেলেমানুষী দেখে। মনে এখন ওর আর কোনো শঙ্কা নেই। ডেভিড নিশ্চিন্তে তার ব্যবসার কাজে শিকাগো যেতে পারে। ভয় পাবে না অ্যালিস। বাচ্চার যত্ন ঠিকই নিতে পারবে সে।

শুক্রবার সকালে শিকাগোর উদ্দেশ্যে উড়াল দিল ডেভিড। নীল আকাশ, পেঁজা তুলো মেঘ আর সূর্যের ঝকঝকে সোনালি রশ্মি ছুঁয়ে গেল ওকে। ফ্রেশ মুড নিয়ে শিকাগো এয়ারপোর্টে পা রাখল ও। শেরাটন হোটেলে আগেই রুম বুক করা ছিল। ওখানে উঠেই প্রথমে লং ডিসট্যান্স কলে অ্যালিসকে ফোন করে জানাল সে ঠিকঠাক মতো পৌঁছেছে। তারপর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডেভিড। ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা ওর। পরবর্তী ছটা

দিন ঝড় বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে একটা বিজনেস ডিল করতে গিয়ে। এর মধ্যে একদিন লস এঞ্জেলেসে ফোন করল ও। কিন্তু ওদিক থেকে কোনো সাড়া পেল না। ফোন ডেড। তবে চিন্তিত হলো না ডেভিড। মাঝে মাঝে এভাবে ফোন ডেড হয়ে পড়ে ওদের বাসায়। কাছের এক্সচেঞ্জে কমপ্লেন জানালে আবার ঠিক হয়ে যায়। এবারও ওরকম কিছু একটা হয়েছে ভেবে ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবল না সে। কাজের মধ্যে এত বুঁদ হয়ে গেল সে বাড়ির কথা প্রায় মনেই পড়ল না। সপ্তম দিনে, ব্যাংকোয়েট হলে একটা কনফারেন্স সেরে রুমে ফিরেছে ডেভিড, জামা কাপড় ছাড়ছে বিশ্রাম নেয়ার জন্য, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন। অপারেটর জানাল লস এঞ্জেলেস থেকে লং ডিসট্যান্স কল। খুশি হয়ে উঠল ডেভিড। নিশ্চয় অ্যালিস। যাক, তাহলে এবার ওদের ফোনটা তাড়াতাড়িই ঠিক হয়েছে।

অ্যালিস? আগ্রহ ভরে ডাকল ডেভিড।

না, ডেভিড। ড. জেফারস বলছি।

ড. জেফারস!

একটা খবর দেব। কিন্তু ভেঙে পড়া চলবে না। শোনো, অ্যালিস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমার ক্লিনিকে আছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো। ওর নিউমোনিয়া

হয়েছে। ভেব না, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব অ্যালিসের জন্য করব। তবে ওর পাশে এখন তোমাকে খুব দরকার।

হাত থেকে ফোন খসে পড়ল ডেভিডের। কোনোমতে উঠে দাঁড়াল, পায়ের তলাটা ফাঁকা ঠেকল। মনে হলো অসীম এক ঘূর্ণির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ও। ঘরটা অস্পষ্ট হয়ে উঠল, দুলছে।

অ্যালিস, আর্তনাদ করে উঠল ডেভিড। অন্ধের মতো এগোল সে দরজার দিকে।

.

তোমার স্ত্রী মা হিসেবে খুব চমৎকার, ডেভিড। নিজের কথা সে একটুও ভাবেনি। বাচ্চাটার জন্য চিন্তায় চিন্তায়...

ড. জেফারসের একটা কথাও শুনছে না ডেভিড। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অ্যালিসের পান্ডুর মুখের দিকে। অ্যালিসের মুখের পেশী বার কয়েক কাঁপল, চোখ মেলে চাইল ও। অস্ফুট একটা হাসি ফুটল ঠোঁটে, তারপর কথা বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে বলছে অ্যালিস। মা হিসেবে বাচ্চার প্রতি একজন তরুণীর কি দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাই বর্ণনা দিচ্ছে সে। ধীরে ধীরে গলা চড়ল ও, ভয় ফুটল কণ্ঠে, তীব্র বিতৃষ্ণা বিষোদগার

হলো। ডাক্তারের মুখাবয়বে কোনো পরিবর্তন হলো না, কিন্তু ডেভিড বারবার কেঁপে উঠল। থামাতে চাইল ও অ্যালিসকে, কিন্তু পারল না।

বাচ্চাটা ঘুমাতে চাইত না। আমি ভেবেছিলাম ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও দোলনায় শুয়ে থাকত আর শুধু চেয়ে থাকত। আর গভীর রাতে উঠে কাঁদতে শুরু করত, সারারাত। একের পর এক রাত। কত চেষ্টা করেছি থামাতে। পারিনি। আর আমিও ওর কান্নার চোটে একটা রাতও ঘুমাইনি।

মাথা নাড়লেন ড. জেফারস। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এখন ও দ্রুত আরোগ্যের পথে। কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে আশা করি।

অসুস্থ বোধ করছে ডেভিড। বাচ্চা? আমার বাচ্চাটার কী অবস্থা?

ও ঠিকই আছে।

ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনাকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব...

ওকে ওকে, সান। এমনিতেই খাটো মানুষ আমি। কৃতজ্ঞ করে আরও খাটো কোরো না। বরং ধন্যবাদ প্রাপ্য তোমাদের ওই হাউজকীপারের। অ্যালিস অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বাথরুমে। এমনিতেই ক্লান্ত শরীর, তারপর প্রচন্ড ঠান্ডা। ভাগ্যিস নিউমোনিয়াটা ওকে খুব

বেশি কাবু করার আগেই আমি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তোমাদের হাউজকীপার যদি বাথরুমের দরজা ভেঙে অ্যালিসকে বের করতে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি করত তাহলে ওকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে উঠত। এনিওয়ে, অ্যালিসকে তুমি শিগগিরই বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

ডাক্তার দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেলেন। অ্যালিস দুর্বল গলায় ডাকল, ডেভিড!

ঘুরল ডেভিড। জড়িয়ে ধরল অ্যালিসকে। অ্যালিস ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে থাকল। ভীত গলায় বলতে শুরু করল, আমি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম। তোমাকে বুঝতে দিইনি হাসপাতাল থেকে ফেরার পরেও আমি শরীরে পুরো শক্তি ফিরে পাইনি। কিন্তু বাচ্চাটা আমার দুর্বলতা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রতি রাতে ওটা কাঁদত। কিন্তু যখন কাঁদত না তখন অস্বাভাবিকরকম নিরব থাকত। আমি রাতে ঘরের বাতি জ্বালাতে সাহস পেতাম না। জানতাম আলো জ্বাললেই দেখব ও আমার দিকে একঠায় তাকিয়ে আছে।

ডেভিড জড়িয়ে ধরে আছে অ্যালিসকে। অ্যালিসের প্রতিটি কথা ও উপলব্ধি করতে পারছে অন্তরে অন্তরে। বাচ্চাটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও, টের পাচ্ছে ওর উপস্থিতি। এই বাচ্চা প্রতিদিন গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে যখন আর সবার বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে ঘুমায়। এই বাচ্চা জেগে থাকে, যখন কাঁদে না তখন চিন্তা করে। আর তার দোলনা থেকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে। এসব কি হচ্ছে? নিজেকে

ভর্ৎসনা করল ডেভিড। এত চমৎকার তুলতুলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসব কী ভাবছে সে। অ্যালিসের দিকে মনোযোগ দিল সে।

অ্যালিস বলে চলেছে, আমি বাচ্চাটাকে খুন করতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তাই। তুমি যেদিন শিকাগো গেলে তার পরদিনই আমি ওর ঘরে ঢুকে ঘাড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু হাত শুধু ঢুকিয়েই থাকলাম। অনেকক্ষণ নড়তেই পারলাম না। ভীষণ ভয় লাগছিল আমার। তারপর বিছানার চাদর দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে, উল্টো অবস্থায় রেখে দৌড়ে পালালাম ঘর থেকে।

ডেভিড ওকে থামাতে চাইল।

না, আমাকে আগে শেষ করতে দাও। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফোঁসফেঁসে গলায় বলল অ্যালিস। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলাম ঠিক কাজটাই করেছি আমি। বাচ্চারা দোলনায় কাপড় পেঁচিয়ে এভাবে শ্বাসরোধ হয়ে কতই তো মারা যায়। কেউ জানবেই না যে আমিই কাজটা করেছি। কিন্তু ওকে মৃত অবস্থায় দেখব বলে যেই ঘরে ঢুকেছি... ডেভিড, বিশ্বাস করো, দেখি কি ও মরেনি! হ্যাঁ, মরেনি। বেঁচে আছে। তোষকে পিঠ দিয়ে হাসছে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। তারপর ওকে আর আমার ধরার সাহসই হলো না। আমি সেই যে ও ঘর থেকে চলে এলাম আর সেদিকে গেলাম না। আমি ওকে খাওয়াতেও যাইনি কিংবা একবার দেখতেও যাইনি। হয়তো হাউজকীপার ওকে খাইয়েছে। ঠিক জানি না। আমি, শুধু জানি সারারাত সে চিৎকার করে কেঁদে আমাকে

জাগিয়ে রাখত। আর মনে হতো সমস্ত বাড়িতে ওটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় আমি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। হাঁপিয়ে উঠছে অ্যালিস। দম নিতে একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, বাচ্চাটা ওখানে সারাদিন শুয়ে থাকে আর খালি আমাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ ও বুঝতে পেরেছে ওর সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। ওর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই; আমাদের মধ্যে কোনো নিরাপত্তার বন্ধন নেই; কোনোদিন হবেও না।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল অ্যালিস। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ডেভিড অনেকক্ষণ বসে থাকল ওর শিয়রে, নড়তে ভুলে গেছে যেন। ওর রক্ত জমাট বেঁধে গেছে শরীরে। কোথাও একটা নার্ভও কাজ করছে না। দিন তিনেক পরে অ্যালিসকে বাড়ি নিয়ে এল ডেভিড। সিদ্ধান্ত নিল পুরো ব্যাপারটা সে জানাবে ড. জেফারসকে। তিনি অখন্ড মনোযোগে ডেভিডের সব কথা শুনলেন।

তারপর বললেন, দেখো, ডেভিড, তুমি ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করো। কখনও কখনও মায়েরা তাদের সন্তানদের ঘৃণা করেন, এটা এক ধরনের দ্বৈতসত্তা। ভালবাসার মধ্যে ঘৃণা, প্রেমিক-প্রেমিকারা হরহামেশা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছে। কয়েকদিন মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। বাচ্চারাও তাদের মায়েদের ঘৃণা করে...।

বাধা দিল ডেভিড, আমার মাকে আমি কখনো ঘৃণা করিনি।

করেছ। কিন্তু স্বীকার করবে না। এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তার প্রিয়জনদের ঘৃণা করার কথা কখনো স্বীকার করতে চায় না।

কিন্তু অ্যালিস তার বাচ্চাকে ঘৃণা করার কথা স্পষ্ট করে বলছে!

বরং বলো সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। ঘৃণা এবং ভালবাসার যে স্বাভাবিক দ্বৈতসত্তা রয়েছে, সে ওটা থেকে একটু এগিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ডেলিভারির মাধ্যমে ওর বাচ্চার জন্ম। নরক যন্ত্রণা সহ্য করেছে সে সন্তান জন্ম দেয়ার সময়। এই প্রায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং নিউমোনিয়ার জন্য অ্যালিস বাচ্চাটাকেই একমাত্র দায়ী মনে করছে। নিজের সমস্যা সে নিজেই সৃষ্টি করছে, কিন্তু দায়ভারটা তুলে দিচ্ছে হাতের কাছে যাকে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হিসেবে পাচ্ছে, তার ওপর। আমরা সবাই এটা করি। চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলে দোষ দিই ফার্নিচারটার । অথচ নিজেরা যে সাবধান নই সেদিকে খেয়াল রাখি না। ব্যবসায় ফেল করলে অভিসম্পাত করি ঈশ্বর, আবহাওয়া কিংবা আমাদের ভাগ্যকে। তোমাকে নতুন করে কিছু বলার নেই। আগেও যা বলেছি আজও তাই বলছি। লাভ হার। ওকে আরও বেশি বেশি ভালবাস। পৃথিবীর সেরা ওষুধ হলো ভালবাসা। ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে ওর প্রতি তোমার স্নেহটাকে ফুটিয়ে তোলো, ওর মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তোলো। ওকে বোঝাও বাচ্চারা কত নিষ্পাপ আর মোটেও অনিষ্টকারী নয়। বাচ্চাটার মূল্য কারও চেয়ে কম নয় এই অনুভূতি ওর মধ্যে জাগিয়ে তোল। দেখবে কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে। মৃত্যুভয় ভুলে যাবে অ্যালিস, ভালবাসতে শুরু করবে তার বাচ্চাকে। যদি আগামী মাসের মধ্যেও ওর কোনো

পরিবর্তন না দেখো, তাহলে আমাকে। জানিও। ওকে কোনো ভাল সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠাব। এখন তুমি যেতে পার। তবে দয়া করে চেহারা থেকে অসহায় ভাবটা মুছে ফেল।

.

শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। বসন্তকে বিদায় দিল গ্রীষ্ম। ডেভিডদের বুলেভার্ডের বাড়িতে সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। ডেভিড তার কাজে ব্যস্ত থাকছে ঠিকই, তবে বেশিরভাগ সময় সে ব্যয় করছে স্ত্রীর জন্য। অ্যালিস এখন অনেকটাই সুস্থ। বিকেলে দুজনে মিলে হাঁটতে যাচ্ছে পার্কে, কখনো সামনের লনে ব্যাডমিন্টনের নেট ঝুলিয়ে পয়েন্ট গুণে খেলছে, ডেভিডকে হারাতে পারলে হাততালি দিয়ে উঠছে বাচ্চাদের মতো। আস্তে আস্তে শক্তি ফিরে পাচ্ছে অ্যালিস। মনে হচ্ছে ভয়টার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে ও।

তারপর একদিন রাতে প্রবল ঝড় হলো। আকাশের বুক চিরে সাপের জিভের মতো ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও, হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জন যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল বাড়িটাকে। সেই সঙ্গে কেঁপে উঠল অ্যালিস। ঘুম ভেঙে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে, ওকেও ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য করল। অ্যালিসকে আদর করতে করতে ডেভিড জানতে চাইল কী হয়েছে।

ভয়ার্ত গলায় অ্যালিস বলল, কে যেন আমাদের ঘরে ঢুকেছে। লক্ষ করছে আমাদেরকে।

আলো জ্বালাল ডেভিড। আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ, সস্নেহে বলল সে। এতদিন তো ভালই ছিলে। আবার কী হলো? আলো নেভাল সে।

অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যালিস। তারপর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। ওকে বুকে চেপে ধরে থাকল ডেভিড, ভাবল তার এই মিষ্টি বউটা কি সামান্য কারণেই না ভয় পায়।

হঠাৎ ঘুম চটে যাওয়ায় আর ঘুম আসছিল না ডেভিডের। অনেকক্ষণ আগডুম বাগডুম ভাবল সে। শব্দটা হঠাৎ কানে এল। খুলে যাচ্ছে। বেডরুমের দরজা। ইঞ্চিকয়েক খুলে গেল পাল্লা দুটো।

কেউ নেই ওখানে। বাতাস থেমেছে বহুক্ষণ।

চুপচাপ শুয়ে থাকল ডেভিড। মনে হলো এক ঘণ্টারও বেশি সময় সে অন্ধকারে শুয়ে আছে।

তারপর, অকস্মাৎ গোঙানির মতো কান্নার আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। কাঁদছে বাচ্চাটা।

গোঙানির শব্দটা অন্ধকারের মধ্যে গড়িয়ে এল, ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, যেন প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে। এই সময় আবার শুরু হলো ঝড়।

ডেভিড খুব আস্তে আস্তে একশো গুণল। থামছে না বাচ্চা, একভাবে কেঁদেই চলেছে।

সাবধানে অ্যালিসের বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল ডেভিড, নামল বিছানা থেকে। স্যান্ডেলে পা গলিয়ে এগোল দরজার দিকে।

ও এখন নিচে, রান্নাঘরে যাবে, ঠিক করল ডেভিড। খানিকটা দুধ গরম করে চলে আসবে ওপরে, তারপর...।

মিশমিশে অন্ধকারটা যেন মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের থেকে, পা পিছলে গেছে ডেভিডের। নরম কী একটা জিনিসের ওপর পা-টা পড়েছিল, টের পেল অসীম শূন্যের এক কালো গহ্বরের মধ্যে ছিটকে যাচ্ছে সে।

উন্মাদের মতো হাত বাড়াল ডেভিড, প্রচন্ড ঝাঁকি খেল কব্জি জোড়া, ধরে ফেলেছে রেলিং। নিজেকে গাল দিল একটা।

কীসের ওপর পা দিয়ে পিছলে পড়েছিল ডেভিড? জিনিসটা কী বোঝার জন্য হাতড়াতে শুরু করল অন্ধকারে। মাথায় দ্রিম দ্রিম ঢাক বাজছে। হৃৎপিন্ড যেন গলার কাছে এসে ঠেকেছে, প্রচন্ড ব্যথা করছে হাত।

নরম জিনিসটা খুঁজে পেল ডেভিড। গায়ে আঙুল বুলিয়েই বুঝতে পারল, একটা পুতুল। বিদঘুঁটে চেহারার বড়সড় এই পুতুলটা সে কিনেছিল তার বাচ্চার জন্য।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না ডেভিড। কে যে এভাবে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখে! নাহ, হাউজকীপারটা দেশের বাড়ি গিয়ে মুশকিলই হলো দেখছি। আরেকটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হতে যাচ্ছিল ডেভিডের। অত উঁচু থেকে সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে আছড়ে পড়লে বাঁচত নাকি সে? ভাগ্যিস রেলিংটা ধরে ফেলেছিল।

পরদিন, নাস্তার টেবিলে কথাটা বলল অ্যালিস। আমি দিন কয়েকের জন্য একটু ভ্যাকেশনে যেতে চাই। তুমি যদি সময় করতে না পারো, আমাকে একাই যেতে দাও, প্লীজ। হাউজকীপার বুধবার আসবে। সে একাই বাচ্চার যত্ন নিতে পারবে। আমি ওকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছি না। আসলে বলতে পারো আমি কয়েকদিনের জন্য ওর কাছ থেকে পালাতে চাইছি। ভেবেছিলাম এই ব্যাপারটা –মানে ভয়টা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। কিন্তু তা আর পারলাম কই? ওর সঙ্গে এক রুমে আর থাকতে পারছি না আমি। ও এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যেন প্রচন্ড ঘৃণা করে আমাকে। এভাবে আরও কিছুদিন চললে

আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। আমার মন বলছে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সেটা ঘটার আগেই আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে চাই।

থমথমে মুখে চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল ডেভিড। তোমার আসলে এখন দরকার একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট। তিনি যদি তোমাকে বাইরে যেতে বলেন তাহলে যেয়ো। কিন্তু এভাবে আর চলে না। তোমার টেনশনেই আমি মরলাম!

মুখ কালো হয়ে গেল অ্যালিসের। অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকল। তারপর ওর দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ। আমাকে একজন ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। ঠিক আছে, কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই আমি যেতে রাজি, ডেভিড।

ডেভিড ওর ঠোঁটে চুমু খেল। ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়ে, ডার্লিং। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য কথাটা বলিনি। তুমি তো জানোই, তুমি আমার কাছে কতখানি। তোমার সামান্য কষ্ট হলেও আমি দিশেহারা হয়ে যাই।

মুখ তুলল অ্যালিস। জানি। আমি কিছু মনে করিনি। যাকগে, আজ ফিরবে কখন?

অন্যান্য দিনের মতোই। কেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

এমনিই। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরলে আমি একটু স্বস্তি পাই। চারদিকে এত অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর যে জোরে গাড়ি চালাও, আমার খুব ভয় করে।

ও তো আমি সবসময়ই চালাই। অ্যাক্সিডেন্টে মরব না, একশোভাগ গ্যারান্টি দিলাম। অ্যালিসের ফর্সা গাল টিপে দিল সে। হাসতে হাসতে বলল, চলি, দৃঢ় পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডেভিড। ফ্রেশ মুড নিয়ে।

.

অফিসে পৌঁছেই ড. জেফারসকে ফোন করল ডেভিড। জানতে চাইল তাঁর জানাশোনা ভাল কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট আছে কিনা। একজন নির্ভরযোগ্য নিউরোসাইকিয়াট্রিস্টের কথা বললেন ডাক্তার। জানালেন তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবেন, ডেভিডকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল ডেভিড। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর যখন ফ্রী হলো ডেভিড, অনুভব করল বাসায় যাওয়ার জন্য কী ব্যগ্র হয়ে আছে মন। লিফটে নামার সময় গতরাতের ঘটনাটা মনে পড়ল ওর। অ্যালিসকে আছাড় খাওয়ার কথা বলেনি সে। পুতুলটার কথা বললে সে যদি অন্যভাবে রিয়্যাক্ট করে । থাক, দরকার নেই বলার। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।

সূর্য ডুবে গেছে আকাশছোঁয়া বিল্ডিংয়ের আড়ালে। টকটকে লাল আভা ছড়িয়ে আছে ওদিকের আকাশে। সিঁদুর রঙা মেঘগুলো আশ্চর্য সব মূর্তি একে রেখেছে আকাশের বুকে। অপূর্ব! একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুরফুরে মেজাজে গাড়ি চালাচ্ছে ডেভিড।

গাড়ি বারান্দায় টয়োটা রাখল ডেভিড। অ্যালিসকে নিয়ে এখনই আবার বেরুবে। ঠিক করেছে লং ড্রাইভে যাবে। ফেরার পথে রাতের খাবারটা সেরে নেবে কোনো রেস্টুরেন্টে।

হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল ডেভিড। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। পেছন থেকে মিষ্টি স্বরে ডেকে উঠল একটি পাখি। কলিংবেলে চাপ দিল। পিয়ানোর টুং টাং শব্দ বাজতে শুরু করল দোতলায়। দেড় মিনিট পার হওয়ার পরেও অ্যালিস আসছে না দেখে ভ্রু কুঁচকে উঠল ওর। ঘুমিয়ে পড়েনি তো অ্যালিস। কিন্তু এ সময় তো ওর ঘুমাবার কথা নয়। দরজার নবে হাত রাখল ডেভিড। মোচড় দিল। ধাক্কা দিতেই খুলে খেল দরজা। কপালে আরও একটা ভাঁজ পড়ল ওর। সদর দরজা কখনো ভোলা রাখে না অ্যালিস। দিনকাল ভাল নয় জানে। তাহলে কী হলো আজ মেয়েটার।

ঘরে ঢুকেই উঁচু গলায় ডাকল ডেভিড, অ্যালিস! কোনো উত্তর নেই। আবারও ডাকতে গেল, কিন্তু হাঁ হয়েই থাকল মুখ। দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে সে, ভয়ের তীব্র একটা ঠান্ডা স্রোত জমিয়ে দিল ওকে।

কিম্ভূত পুতুলটা পড়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। কিন্তু পুতুল নয়, ডেভিড তাকিয়ে আছে অ্যালিসের দিকে। অ্যালিসের হালকা পাতলা দেহটা দুমড়ে মুচড়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। যেন একটা ভাঙা পুতুল, আর কোনোদিন খেলা করা যাবে না। কোনোদিন না।

মারা গেছে অ্যালিস।

বাড়িটি আশ্চর্যরকম নিঃশব্দ, শুধু ডেভিডের বুকে হাতুড়ির আঘাত পড়ছে দমাদম।

মারা গেছে অ্যালিস।

মাথাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল ডেভিড, স্পর্শ করল চম্পক অঙ্গুলি। ভীষণ ঠান্ডা। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে থাকল ডেভিড অ্যালিসকে। কিন্তু ও তো আর বেঁচে উঠবে না, আর কখনও জলতরঙ্গ কণ্ঠে ডাকবে না তার নাম ধরে। বাঁচতে চেয়েছিল অ্যালিস। তার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ ডেভিড বাঁচাতে পারেনি তার প্রিয়তমাকে, পারেনি নিরাপত্তা দিতে।

উঠে দাঁড়াল ও। ড. জেফারসকে ফোন করতে হবে। কিন্তু নাম্বারটা মনে পড়ছে না। ভূতগ্রস্তের মতো উঠে এল ডেভিড দোতলায়। সম্মোহিত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল নার্সারী রুমের দিকে। খুলল দরজা। পা রাখল ভেতরে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল দোলনার দিকে। পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠছে। কোনোকিছু ঠাহর করতে পারছে না ভাল মতো।

বাচ্চাটা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, কিন্তু মুখখানা লাল, ঘামে চকচক করছে, যেন অনেকক্ষণ একভাবে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ও মারা গেছে, ফিসফিস করে বলল ডেভিড। মারা গেছে অ্যালিস।

তারপর সে হঠাৎ হাসতে শুরু করল। নিচু গলায় হাসতেই থাকল। সংবিৎ ফিরে পেল গালে সজোরে চড় খেয়ে। চমকে উঠল ড. জেফারসকে দেখে। তিনি একের পর এক চড় মারছেন ওকে আর চেঁচাচ্ছেন, শান্ত হও, ডেভিড। প্লীজ, কাম ডাউন।

অ্যালিস মারা গেছে, ড. জেফারসকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলল ডেভিড। পড়ে গেছে ও দোতলা থেকে পা পিছলে। গত রাতে আমিও পুতুলটার গায়ে পা পিছলে প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। আর এখন

ড. জেফারস ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। জানেন, আমি ওর সুন্দর একটা নাম দেব ভেবেছিলাম। এখন কি নাম দেব জানেন? লুসিফার!

.

রাত এগারোটা। অ্যালিসকে গোরস্তানে কবর দিয়ে এসেছে ডেভিড । শুকনো মুখে বসে আছে লাইব্রেরি ঘরে। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বলল, ভেবেছিলাম অ্যালিসকে ভাল একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাব। ভেবেছিলাম ওর মাথায় গন্ডগোল হয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি বাচ্চাটাকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা অমূলক ছিল না।

ডাক্তার সশব্দে শ্বাস ফেললেন। অ্যালিসের মতো তুমিও দেখি ছেলেমানুষী শুরু করলে। অসুস্থতার জন্য অ্যালিস বাচ্চাটাকে দোষ দিত আর এখন তুমি ওর মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করছ। খেলনাটার ওপর পা পিছলে দোতলা থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙেছে অ্যালিসের। এজন্য তুমি কোনোভাবেই বাচ্চাটাকে দায়ী করতে পারো না।

ওটা লুসিফার। চুপ করো! ওই শব্দটা আরও কখনো মুখে আনবে না।

মাথা নাড়ল ডেভিড। অ্যালিস রাতে অদ্ভুত সব শব্দ শুনত, কে যেন হাঁটছে ঘরে। আপনি জানেন, ড. জেফারস, কে ওই শব্দ করত? বাচ্চাটা। ছয়মাসের একটা বাচ্চা, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত, আমাদের সব কথা শুনত। চেয়ারের হাতল চেপে ধরল ডেভিড। আর আমি যখন আলো জ্বালাতাম, কিছু চোখে পড়ত না। বাচ্চাটা এত ছোট, যে কোনো ফার্নিচারের আড়ালে লুকিয়ে পড়াটা ওর জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না।

থামবে তুমি! বললেন ডাক্তার।

না, আমাকে বলতে দিন। সব বলতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি গতবার ব্যবসায়ের কাজে শিকাগো গেলাম, তখন কে অ্যালিসকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল, কে তার নিউমোনিয়া বাঁধিয়েছিল? বাচ্চাটা। কিন্তু এত চেষ্টার পরেও যখন অ্যালিস মরল না, তখন সে আমাকে খুন করতে চাইল। ব্যাপারটা ছিল স্বাভাবিক; সিঁড়িতে একটা খেলনা ফেলে রাখো, বাপ তোমার জন্য দুধ না নিয়ে আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকো, তারপর সে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে ঘাড় ভাঙুক। সাধারণ একটা কৌশল, কিন্তু কাজের। আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি। কিন্তু ফাঁদটা অ্যালিসকে শেষ করেছে।

একটু থামল ডেভিড। হাঁপিয়ে গেছে। তারপর বলল, বহু রাতে আমি আলো জ্বেলে দেখেছি ওটা ঘুমায়নি, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বেশিরভাগ শিশু ওই সময় ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু ও জেগে থাকত, চিন্তা করত।

বাচ্চারা চিন্তা করতে পারে না।

ও পারে। আমরা বাচ্চাদের মন সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি? অ্যালিসকে ওর ঘৃণা করার কারণও ছিল। অ্যালিস ওকে মোটেও স্বাভাবিক কোনো শিশু ভাবত না। ভাবত অস্বাভাবিক কিছু। ড. জেফারস, আপনি তো জানেনই জন্মের সময় কত বাচ্চা তাদের মায়েদের খুন করে। এই নোংরা পৃথিবীতে জোর করে টেনে আনার ব্যাপারটা কি ওদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে? ডেভিড ক্লান্তভাবে ডাক্তারের দিকে ঝুঁকল। পুরো ব্যাপারটাই এক সুতোয় বাঁধা। মনে করুন, কয়েক লাখ বাচ্চার মধ্যে কয়েকটা জন্মাল

অস্বাভাবিক বোধ শক্তি নিয়ে। তারা শুনতে পায়, দেখতে পায়, চিন্তা করতে পারে, পারে হাঁটাচলা করতে। এ যেন পতঙ্গদের মতো। পতঙ্গরা জন্মায় স্বনির্ভরভাবে। জন্মাবার কয়েক হপ্তার মধ্যে বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু সাধারণ বাচ্চাদের কয়েক বছর লেগে যায় হাঁটতে, চলতে, কথা বলা শিখতে।

কিংবা ধরুন, কোটিতে যদি একটা বাচ্চা অস্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে? জন্মাল একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মেধা এবং শক্তি নিয়ে। কিন্তু সে ভান করল আর দশটা বাচ্চার মতোই। নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করতে চাইল, খিদের সময় তার স্বরে কাঁদল। কিন্তু অন্য সময় অন্ধকার একটা বাড়ির সব জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে সে, শুনছে বাড়ির লোকজনের কথাবার্তা। আর তার পক্ষে সিঁড়ির মাথায় ফাঁদ পেতে রাখা কত সোজা! কত সহজ সারারাত কেঁদে কেঁদে তার মাকে জাগিয়ে রেখে অসুস্থ করে তোলা।

ফর গডস শেক! দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার, উত্তেজিত। এসব কি উদ্ভট কথা বলছ তুমি!

উদ্ভট শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি, ড. জেফারস। মানুষটা ছোট বলেই আমরা ওকে সন্দেহ করতে পারছি না। কিন্তু এই খুদে সৃষ্টিগুলো ভীষণ রকম আত্মকেন্দ্রিক। কেউ ওদের ভাল না বাসলে ঠিকই টের পেয়ে যায়। তখন তাদের প্রতি ওদের ঘৃণা উথলে ওঠে। আপনি কি জানেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বার্থপর হচ্ছে শিশুরা?

ড. জেফারস ভ্রূকুটি করে অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন।

ডেভিড বলল, আমি বলছি না বাচ্চাটার ওপর কোনো অস্বাভাবিক শক্তি ভর করেছে। কিন্তু সময়ের আগেই যেন ও দ্রুত বেড়ে উঠেছে। আর এই ব্যাপারটাই আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে।

ঠাট্টা করতে চাইলেন ডাক্তার। ধরো, বাচ্চাটা অ্যালিসকে খুনই করেছে। কিন্তু খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। বাচ্চাটার উদ্দেশ্য কী ছিল?

জবাবটা তৈরিই ছিল। ত্বরিতগতিতে বলল ডেভিড, যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেনি তার সবচেয়ে শান্তির জগৎ কোথায়? মায়ের জরায়ু। ওখানে সময় বলে কিছু নেই, আছে শুধু শান্তির অপার সমুদ্র, একমনে গা ভাসিয়ে থাকো। কোনো কোলাহল নেই, নেই দুশ্চিন্তা। কিন্তু তাকে যখন জোর করে টেনে আনা হলো এই মাটির পৃথিবীতে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জগৎ থেকে মুহূর্তে সে পতিত হলো এক নরকে। স্বার্থপর এই পৃথিবীতে তাকে বেঁচে থাকতে হলে মানুষের ভালবাসা আদায় করতে হবে। অথচ যার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। পরিচিত জগৎ থেকে হঠাৎ এই অপরিচিত দুনিয়ায় এসে নিজেকে সে প্রচন্ড অসহায় ভাবতে থাকে, তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ছোট্ট মগজে তখন শুধু স্বার্থপরতা আর ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। মোহময় জগৎ থেকে কে তাকে এই নিষ্ঠুর পরিবেশে নিয়ে এল, ভাবতে থাকে সে। এ জন্য দায়ী কে? অবশ্যই মা। তার

অপরিণত মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে তখন মায়ের প্রতি ছড়িয়ে পড়ে প্রবল ঘৃণা। বাপও মায়ের চেয়ে ভাল কিছু নয়। সুতরাং তাকেও ঘৃণা করো। খুন করো দুজনকেই।

বাধা দিলেন ডাক্তার। তুমি যা বললে এই ব্যাখ্যা যদি সত্যি হতো তাহলে পৃথিবীর সব মহিলাই তাদের বাচ্চাদের ভয়াবহ কিছু একটা ভাবত।

কেন ভাববে না? আমাদের বাচ্চাটা কি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ নয়? হাজার বছরের ডাক্তারী শাস্ত্রের বিশ্বাস তাকে প্রটেক্ট করছে। প্রকৃতিগতভাবে সবার ধারণা সে খুব অসহায়, কোনো কিছুর জন্য দায়ী নয়। কিন্তু এই বাচ্চাটা জন্মেইছে বিপুল ঘৃণা নিয়ে। যত দিন যাচ্ছে ততই প্রবল হয়ে উঠছে তার ঘৃণা। সে রাতে শুয়ে থাকে দোলনায়, ফর্সা টুকটুকে মুখখানা ভেজা, শ্বাস ফেলতে পারছে না। অনেকক্ষণ কেঁদেছে বলে এই অবস্থা? অবশ্যই নয়। সে দোলনা থেকে নেমেছে, হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়েছে সারা ঘরে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও আমার অ্যালিসকে খুন করেছে। আমিও ওকে খুন করব।

ডাক্তার ডেভিডের দিকে এক গ্লাস পানি আর কয়েকটা সাদা বড়ি এগিয়ে দিলেন। তুমি কাউকে খুন করবে না। তুমি এখন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘুমাবে। নাও, এগুলো গিলে ফেলল। একটা ভাল ঘুম হলেই এসব উদ্ভট চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে যাবে।

ডেভিড পানি দিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলল ঘুমের বড়িগুলো। ওপরে উঠল ও। কাঁদছে। শুয়ে পড়ল বিছানায়। ড. জেফারস ওর ঘুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর চলে গেলেন।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে ডেভিডের এই সময় শব্দটা শুনল।

কে? অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

কে যেন হলঘরে ঢুকেছে।

ঘুমিয়ে পড়ল ডেভিড।

পরদিন খুব ভোরে ডেভিডের বাসায় হাজির হলেন ড. জেফারস। ডেভিডকে নিয়ে খুব টেনশনে আছেন তিনি। ছোটবেলা থেকে ওকে চেনেন। আবেগপ্রবণ, অস্থির। ভাগ্যিস গত রাতে তিনি ওদের বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একবার দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নইলে ছেলেটা অ্যালিসের শোকে ওভাবে হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যেত। অ্যালিসের কথা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। এত লক্ষ্মী একটা মেয়ে! কি চমৎকার সুখের জীবন ছিল ওদের। সব গেল ছারখার হয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। ডেভিডকে তিনি কিছু দিনের জন্য দূরে কোথাও ঘুরে আসতে বলবেন। এভাবে একা থাকলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে। ছেলেটার।

কলিংবেল বাজালেন ডাক্তার। কোনো উত্তর নেই। তাঁর মনে পড়ল ডেভিড বলেছিল হাউজকীপার দেশের বাড়িতে গেছে। নব ঘোরালেন তিনি। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন। ডাক্তারি ব্যাগটা রাখলেন কাছের একটা চেয়ারে।

সাদামতো কী একটা সরে গেল দোতলার সিঁড়ি থেকে। ড. জেফারস প্রায় খেয়ালই করলেন না। তাঁর নাক কুঁচকে উঠেছে। কীসের যেন গন্ধ পাচ্ছেন।

গন্ধটা গ্যাসের!

বিদ্যুৎ খেলে গেল ডাক্তারের শরীরে, ঝড়ের বেগে সিঁড়ি টপকালেন, ছুটলেন ডেভিডদের বেডরুম লক্ষ্য করে।

বিছানায় নিশ্চয় পড়ে আছে ডেভিড, সারা রুম ভর্তি গ্যাসে। দরজার পাশের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো অগ্নিনির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডারের মুখ খোলা। হিসহিস শব্দে বেরিয়ে আসছে সাদা পদার্থটা। ড. জেফারসের চকিতে মনে পড়ল ডেভিড একবার বলেছিল সে তার বেডরুমে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার লাগিয়েছে। কারণ তার কোনো এক বন্ধু নাকি বিছানায় শুয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে নেটের মশারিতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরার জোগাড় হয়েছিল। ডেভিডেরও শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। অ্যালিসের তাগিদেই নাকি সে নিরাপত্তার জন্য ওই সিলিন্ডার লাগিয়েছে দেয়ালে।

ড. জেফারস দ্রুত সিলিন্ডারের মুখ বন্ধ করলেন। বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিলেন। তারপর দৌড়ে গেলেন ডেভিডের কাছে।

ঠান্ডা হয়ে আছে শরীর। অনেক আগেই মারা গেছে ডেভিড।

কাশতে কাশতে ঘর থেকে বেরোলেন ডাক্তার। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি ঝরছে। ডেভিড কিছুতেই ওই সিলিন্ডারের মুখ খোলেনি। ঘুমের মধ্যে ওর হাঁটার অভ্যাস আছে, বলেছিল অ্যালিস। কিন্তু যে পরিমাণ ঘুমের ওষুধ ডাক্তার ওকে খাইয়েছেন তাতে দুপুর পর্যন্ত ডেভিডের অঘোরে। ঘুমাবার কথা। সুতরাং এটা আত্মহত্যাও হতে পারে না। তাহলে কি...!

হলঘরে মিনিট পাঁচেক পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ড. জেফারস। তারপর এগোলেন নার্সারী রুমের দিকে। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিয়ে খুললেন তিনি দরজা। দাঁড়ালেন দোলনার পাশে।

দোলনাটা খালি।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার দোলনা ধরে। তারপর অদৃশ্য কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন :

নার্সারীর দরজাটা বন্ধ ছিল। তাই তুমি তোমার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান দোলনাতে ফিরে আসতে পারোনি। তুমি বুঝতে পারোনি যে বাতাসের ধাক্কায় দরজাটা অমন শক্তভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি জানি তুমি এই বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছ। ভান করছ এমন কিছুর, আসলে যা তুমি নও। মাথার চুল খামচে ধরলেন ডাক্তার, বিবর্ণ এক টুকরো হাসি ফুটল মুখে। আমি এখন অ্যালিস আর ডেভিডের মতো কথা বলছি, তাই না? কিন্তু আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। আমি অপার্থিব কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তারপরও আমি কোনো ঝুঁকি নেব না।

নিচে নেমে এলেন ডাক্তার। চেয়ারে রাখা ডাক্তারি ব্যাগ খুলে একটা যন্ত্র বের করলেন।

হলঘরে ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ঘষটে ঘষটে আসছে এদিকে। পাঁই করে ঘুরলেন ড. জেফারস।

আমি তোমাকে এই দুনিয়ায় এনেছি, ভাবলেন তিনি। আর এখন আমিই তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেব...।

শব্দ লক্ষ্য করে ঠিক ছপা হেঁটে গেলেন ডাক্তার। হাতটা উঁচু করে ধরলেন সূর্যালোকে।

দেখো বেবি! কি চকমকে, কি সুন্দর!

সূর্যের আলোতে ঝিকিয়ে উঠল স্কালপেলটা।

–রে ব্রাডবারি

ছায়া কালো কালো

বিকট শব্দ তুলে ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রেন। আমি কামরার জানালা দিয়ে প্রায় সাঁঝ বেলার আবছা আঁধারে ঢাকা বাইরে উঁকি দিলাম। এটা কোন্ জায়গা?

ওক গ্রোভ, স্টেশনের ছাদে ঝাপসা সাইনবোর্ডটি পড়া গেল। আমি ক্লান্ত শ্বাস ছাড়লাম। তিনদিন ধরে ট্রেন জার্নি করছি। অবিরাম দুলুনি, পোড়া অঙ্গার আর জানালার পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে বেজায় শ্রান্ত আমি। হঠাৎ একটি বুদ্ধি মাথায় এল। আইল ধরে এগোলাম কন্ডাক্টরের দিকে। সে এক বৃদ্ধাকে ট্রেন থেকে নামতে সাহায্য করছে।

এখানে ট্রেন থামবে কতক্ষণ? জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

মিনিট দশেক, ম্যাম, বলল সে।

আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। পা রাখলাম স্টেশনের সামনের নরম বালুতে। আবার শক্ত জমিনে হাঁটতে কী যে ভাল লাগছে! শীতের সুশীতল বাতাস টেনে নিলাম বুক ভরে। পা বাড়ালাম স্টেশনের বাইরে। একটু হাঁটাহাঁটি করব। এক ঝলক হাওয়া এসে আমার স্কার্টে বাড়ি খেল, চুল উড়িয়ে মুখে ফেলল। আমি অলস চোখে ওক গ্রোভের চারপাশে নজর বুলালাম। একেবারেই গতানুগতিক ধরনের ছোট শহর। হাঁটতে হাঁটতে

স্টেশন ছেড়ে খানিকটা দূরে চলে এলাম। ইতিমধ্যে বার দুয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়েছি ঘড়িতে। দশমিনিট হুট করে পার না হয়ে যায় সে ভয়ে আছি। এমন সময় দেখি দুটো কুকুর একটা বিড়াল ছানার ওপর হামলা করেছে।

আমি ছুটে গেলাম ওদিকে। ছানাটাকে ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিতে কসরত করতে হলো। কামড় এবং আঁচড়ও খেতে হলো। তবে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে একটা দোকানের দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কানে ভেসে এল ট্রেনের হুইশলের শব্দ। আমি ছুট দিলাম স্টেশনে। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছে দেখি সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঝিকঝিক শব্দে আমার ট্রেন নাগালের বাইরে চলে গেছে। এখন আর ছুটেও ওটাকে ধরতে পারব না।

এখন কী করি? ইস, কেন যে মরতে এই অভিশপ্ত স্টেশনে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। হাত পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল বলেই ট্রেন থেকে অচেনা অজানা জায়গায় নামতে হবে? আমার লাগেজসহ সবকিছু রয়ে গেছে রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া রেলগাড়িতে। সঙ্গে পার্স ছাড়া কিছুই নেই। আর আমি একা পড়ে আছি এই খুদে শহরে যাকে অজ পাড়া গাঁ বললেই মানায়। এ শহরের নামই তো জীবনে শুনিনি।

নাকি শুনেছি? ওক গ্রোভ.... কেমন চেনা চেনা লাগছে নামটি। ওক গ্রোভ... ওহ! মনে পড়েছে! কলেজে আমার যে রুমমেট ছিল তার বাড়ি ছিল ওক গ্রোভ নামে একটি শহরে। আমি স্টেশন মাস্টারের ঘরে পা বাড়ালাম।

এখানে কি মিস মেরি অ্যালিসন থাকেন? জিজ্ঞেস করলাম তাকে। মেরি ডিয়ানে অ্যালিসন?

বুড়ো আমার দিকে কেন অনেকক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোধগম্য হলো না। দীর্ঘ বিরতির পরে সে আমার প্রশ্নের জবাব দিল। জি, ম্যাম, ধীরে ধীরে, ইতস্তত গলায় বলল সে। আপনি তার আত্মীয় নাকি?

না, হাসলাম আমি। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। ভাবছি... আজ রাতটা ওর বাড়িতে গিয়ে থাকব। আমি... এমন বোকা ট্রেনটা মিস করেছি...

আপনি, আবারও দ্বিধা বুড়োর গলায়, এখানে কোনো হোটেলে থাকতে পারেন। এখানে একটাই হোটেল আছে। মে ফেয়ার।

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল আমার। বুড়োর কথা শুনে মনে হচ্ছে সে যেন চায় আমার বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে উঠি। অবশ্য মফস্বল শহরে অনাহুত অতিথিদের আকস্মিক আগমন অনেকেই খুব একটা আন্তরিকভাবে মেনে নেয় না শুনেছি। কিন্তু আমি তো যেতে চাইছি আমার বান্ধবীর বাসায়। তাতে এ বুড়োর সমস্যা কী? আমি স্টেশন মাস্টারের দিকে শীতল চোখে তাকালাম।

আপনি পারলে ওর ঠিকানাটা বলে দিন, কঠিন গলায় বললাম আমি।

বুড়ো ঠিকানাটা বলল। তবে অনিচ্ছাসত্ত্বে।

শহরের শেষ প্রান্তে, বড় সাদা বাড়িটাতে মেরি অ্যালিসনের নিবাস, বলা হয়েছে আমাকে। ওর সঙ্গে শেষ যেবার দেখা হয়েছিল সেই স্মৃতি মনে পড়ছে। মেরি ছিল হাসিখুশি, আন্তরিক স্বভাবের মেয়ে। পরিবার অন্তপ্রাণ। ও একবার ওর বাড়ি, বাবামা এবং ভাইয়ের একটা ছবি দেখিয়েছিল। তাদের চেহারা এখন অবশ্য মনে নেই। আমার প্রাক্তন রুমমেট ও বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে দেখা হচ্ছে, সেই আগ্রহে আমার হাঁটার গতি বেড়ে গেল।

.

অবশেষে খুঁজে পেলাম বাড়িটি। লম্বা লম্বা থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন কলোনিয়াল ম্যানসনটি। বিশাল। তবে ঝোঁপঝাড়, আগাছা এবং প্রকান্ড প্রকান্ড সাদা ওক গাছ রাস্তা থেকে প্রায় ঢেকে রেখেছে প্রাসাদোপম বাড়িটি, যেন লুকিয়ে আছে বাকি জগৎ থেকে। বাড়িটির প্রচুর সংস্কার দরকার, সেইসঙ্গে বাগানেরও। দেখে মনে হচ্ছে এক সময় বাগানের চেহারা সুন্দরই ছিল। এখন লম্বা লম্বা ঘাস আর আগাছায় বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

আমি শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। দরজার হাতলে পিতলের ভারী কড়া লাগানো। তিন বার কড়া নাড়ার পরে অতিকায় দরজাটি সামান্য খুলে গেল। আমার কলেজের বান্ধবীটি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কোনো কথা নাবলে। আমি হেসে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম হাত। সে আস্তে আস্তে আমার হাতখানা ধরল। তার চেহারা আগের মতোই আছে, শুধু সর্বদা চঞ্চল ঝকঝকে নীল চোখজোড়ায় সেই স্বতঃস্ফূর্ততা উধাও, কেমন স্বরাচ্ছন্ন। চাউনি। ওর আচরণেও কেমন একটা পরিবর্তন চলে এসেছে লক্ষ করলাম। ছটফটে মেয়েটা কেমন ঝিম মেরে গেছে। অস্বাভাবিক চুপচাপ। আমার দিকে অনেকক্ষণ কুয়াশাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে থাকল নিরবে। তারপর খুব আস্তে আস্তে, অবাক গলায় বলল, লিজ! লিজ! আমার আঙুলগুলো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল যেন ভয় পাচ্ছে আমি অকস্মাৎ উধাও হয়ে যাব। তোমাকে... তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। ঈশ্বর! কীভাবে... পথ চিনে এখানে এলে?

আমি আসলে ট্রেন মিস করেছি। মানে হাওয়া খেতে নেমেছিলাম। স্টেশনে ফিরে দেখি চলে গেছে ট্রেন। বললাম আমি। তবে ট্রেন মিস করে ভালোই করেছি... আমার হঠাৎ মনে পড়ল তুমি এখানেই থাকো। তাই চলে এলাম।

আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেরি হাতটা ধরে রেখে। আর কাল সকাল দশটার আগে আটলান্টা যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই, একটু ইতস্তত গলায় যোগ করলাম আমি, তারপর হেসে উঠলাম। আমাকে ভেতরে আসতে বলবে না!

ও হ্যাঁ.. অবশ্যই। অস্বাভাবিক গলায় বলল মেরি। যেন আমাকে ঘরে আসতে বলার বিষয়টিই তার মাথায় ছিল না। এসো!

প্রকাণ্ড হলঘরে প্রবেশ করলাম আমি। মেরির উদ্ভট আচরণ আমাকে অবাকই করেছে। কলেজে সে ছিল আমার প্রিয় বান্ধবী, তাহলে কেন এমন আড়ষ্টতা? ওর আচরণ দেখে মনে হয়েছে বাড়িতে ঢুকতে চাওয়ায় সে মহা বিব্রত, যেন আমি একজন অচেনা মানুষ, অন্য গ্রহ থেকে এসেছি! হয়তো আমার অপ্রত্যাশিত আগমন ওকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, নিজেকে বোঝাতে চাইলাম। কিন্তু ব্যাখ্যাটি মেনে নিল না আমার জন্য।

তোমাদের বাড়িটি পুরানো হলেও ভারী সুন্দর! ওকে সহজ করে তুলতে স্বতঃস্ফূর্ততা ফোঁটালাম কণ্ঠে। তবে অস্বাভাবিক নিরব বাড়িটি আমাকে একটু অস্বস্তিতেই ফেলে দিল। মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে এল, এত বড় বাড়িতে তুমি নিশ্চয় একা থাক না?

আমার দিকে এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল মেরি যার অর্থ ঠাহর হলো না। খুবই নিচু গলায়, আমার শুনতে বেশ বেগ পেতেই হলো, বলল, আরে না!

হেসে উঠলাম আমি। তা তো বটেই! বোকার মতো হয়ে গেল প্রশ্নটা। তা অন্যরা সবাই কই?

আমি মাথা থেকে খুলে নিলাম হ্যাট। চারপাশে চোখ বুলালাম। আসবাবগুলো শতাব্দী প্রাচীন, দেয়ালে একটা ঝাড়বাতিদান আছে, তাতে কয়েকটি মোম জ্বলছে। ওই মোমের আলোটুকুই ভরসা। বৈদ্যুতিক কোনো বাতির ব্যবস্থাই নেই। মোমের আলো গাঢ় ছায়া ফেলেছে দেয়ালে- দপদপ করছে, নড়ছে। যেন জ্যান্ত। এসব দৃশ্য দেখে গা ছমছম করার কথা কিন্তু পুরানো বাড়িটির সর্বত্র একটা শান্তি ছড়িয়ে আছে যেন। তবে একই সঙ্গে বড় রহস্যময়ও লাগল। মনে হলো অন্ধকার কোণগুলো থেকে অদৃশ্য চোখ দেখছে আমাদেরকে।

সবাই কোথায়? শুয়ে পড়েছে? আবার করলাম প্রশ্নটি প্রথমবারে ও শুনতে পায়নি ভেবে।

ওরা আছে এখানেই, সেই অদ্ভুত ফিসফিসে গলায় জবাব দিল মেরি যেন জোরে কথা বললে ঘুমন্ত কেউ জেগে যাবে।

ও যেদিকে ইঙ্গিত করেছে সেদিকে তাকালাম। এবং চমকে উঠলাম সামান্য। ঘরে যখন ঢুকি ছোট এ দলটিকে লক্ষই করিনি! ওরা মোমবাতির আলো থেকে খানিকটা দূরে, প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গাদাগাদি করে । স্থির। নির্নিমেষ চাউনি।

আমি হেসে মেরির দিকে তাকালাম। সে মৃদু বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো নরম গলায় বলল, আমার মা... ।

আমি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম সামনে লম্বা চেহারার ভদ্রমহিলাটির দিকে। তিনি ছায়া থেকে বেরিয়ে এক কদম বাড়লেন। আমার বাড়ানো হাতখানা দেখেও যেন দেখলেন না, তার মুখে ফুটল অপূর্ব হাসি এবং মেরির মতো নিচু গলায় বললেন, আমার মেয়ের বান্ধবী হিসেবে তোমাকে সুস্বাগতম!

আমি চোখের কোন দিয়ে এতক্ষণ লক্ষ করছিলাম মেরিকে। মনে হলো তার মায়ের কথা শুনে সে যেন স্বস্তি পেল, চেহারা থেকে দূর হয়ে গেল আড়ষ্টতা।

আমার বাবা, মেরির কণ্ঠে এবারে আশ্চর্য সুখি সুখি ভাব। বছর চল্লিশের লম্বা-চওড়া, ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন ঠোঁটে ভদ্রতার হাসি নিয়ে। তিনিও আমার বাড়ানো হাতখানা অগ্রাহ্য করলেন তবে অত্যন্ত আন্তরিক গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, সোনা। মেরি মাঝেমধ্যেই তোমার কথা বলে।

মেরি এবার বলল, এ হলো ললানি... ওকে ছবিতে দেখেছিলে, মনে আছে?

ছবিতে যে সুদর্শন তরুণটিকে দেখেছিলাম সে হাসিমুখে সামনে বাড়ল।

এই তাহলে লিজ! বলল সে। তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন যে মেয়ে কিনা ইঁদুর ধরতে ভয় পায় না.. মনে পড়ে? মেরি বলেছে তুমি একবার জ্যান্ত ইঁদুর রেখে দিয়েছিলে তোমাদের প্রফেসরের ডেস্কে। হাসি হাসি মুখ করে সে কথা

বললেও ফিসফিস করছিল বলে আমার কাছে একটু বেখাপ্পাই লাগছিল। এবং লক্ষ করলাম আমিও ওদের সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি। এদের কারও মধ্যেই আন্ত রিকতার অভাব নেই তবু কেন সকলে এমন অস্বাভাবিক চুপচাপ। তবে সবচেয়ে অবাক হলাম মেরির ফিসফাস শুনে অথচ ও কলেজে থাকতে সবসময় উচ্চস্বরে কথা বলত, ঘর ফাটিয়ে হাসত।

ও বেটি, বলল মেরি। অদ্ভুত একটা আনন্দের আভা জ্বলজ্বল করছে। চেহারায়।

বছর বারোর এক বালিকা ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ভদ্রতাসূচক সৌজন্য দেখাল।

আর ও বিল, বলল মেরি। গোলগাল চেহারার একটি বাচ্চা তার বোনের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল। তবে জোরে নয়, আস্তে।

কী সুন্দর বাচ্চা! বললাম আমি।

বাচ্চাটি বেটির পেছন থেকে বেরিয়ে এসে মাথাটা একদিকে কাত করে বড় বড় নীল চোখ মেলে আমাকে দেখতে লাগল। আমি ওর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটায় আদর করে হাত বুলাতে যেতেই সে ঝট করে পিছিয়ে গেল। যেন অপরিচিত মানুষের স্পর্শ পেতে

অভ্যস্ত নয়। আমি অবশ্য অবাক হলাম না। অচেনা লোকদের দেখলে বাচ্চারা এরকম করেই থাকে। তবে ওকে আর আদর করার চেষ্টা করলাম না।

.

ওদের সঙ্গে খানিক কথা বলেই পরিবারটিকে বেশ ভালো লেগে গেল আমার। মেরি জিজ্ঞেস করল আমি আমার রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নেব কিনা। তারপর ও রাতের খাবারের জন্য ডাকবে। আমি মেরির পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম দোতলায়। একটা জিনিস লক্ষ করেছি মেরি ছাড়া তার পরিবারের অন্য সকল সদস্যের শরীর স্বাস্থ্য বড্ড খারাপ। ওর বাবা থেকে শুরু করে ছোট ভাই পর্যন্ত সবার গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, যেন প্রবল রক্তশূন্যতায় ভুগছে। হয়তো আমার চোখের দেখার ভুলও হতে পারে। মোমের স্বল্প আলোয় ওদের গায়ের ত্বক খড়িমাটির মতো লেগেছে।

আটটায় ডিনার, মেরি হেসে বলল আমাকে। তারপর চলে গেল আমাকে হাত মুখ ধুয়ে তাজা হওয়ার সুযোগ দিয়ে।

তবে আটটার একটু আগেই আমি নেমে এলাম নিচতলায়। দেখি হলঘরে কেউ নেই। নারীসুলভ কৌতূহলে একটি প্রকাণ্ড আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেয়াল জোড়া আয়না। আমার পেছনের হলঘরের পুরো ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। মোমবাতির আলো পড়েছে কাঁচে। আয়নায় নিজেকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিলাম। তারপর পেছন

ফিরে তাকাতেই দেখি বিল দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। বড় বড় নিষ্পাপ চোখ জোড়া ঝিকমিক করছে।

হাই, ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। কেমন লাগছে আমাকে বলো তো? আমি আয়নার দিকে ফিরলাম এবং দারুণ চমকে উঠলাম।

বিরাট কাঁচের আয়নায় নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি, হলঘরের অনেকখানি অংশেরও প্রতিফলন ঘটেছে ওখানে। কিন্তু বাচ্চাটাকে দেখা যাচ্ছে না আয়নায়! আমার গা শিরশির করে উঠল। পেছন ফিরে তাকালাম। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে ও আগের জায়গায়। এবারে আয়নায় তাকালাম। না, বিল নেই। আয়না জুড়ে শুধু আমি! এটা আয়নার কোনো কারসাজি নয় তো? ভাবলাম আমি। তাই হবে। কারণ পেছন ফিরলেই বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছি আর আয়নায় তাকালে সে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এটা আয়নার কারসাজি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। হয়তো এরকম মজা দেখতেই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে এ আয়না।

তবে আয়নার কারসাজি নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানো বা চমকানোর সুযোগ হলো না মেরি ডিনার খেতে ডাক দেয়ার কারণে। আমি বিলের দিকে হাত বাড়ালাম ওকে নিয়ে ডাইনিংরুমে যাব বলে। কিন্তু বিল দুষ্ট হেসে আমার হাত ধরল না। ছুট দিল ডাইনিংরুমে।

.

রান্না চমৎকার হয়েছে। পরিবারটির সঙ্গে গল্পগুজবও হলো বেশ। তবে ওরা সবাই আগের মতোই নিচু গলায় কথা বলে গেল।

খাবার পরিবেশন করল মেরি। রান্না ঘর থেকে ছুটে ছুটে জিনিসপত্র নিয়ে আসতে লাগল। ওদের হয়তো আর্থিক সংকট চলছে তাই কাজের

নোক রাখতে পারেনি, ভাবলাম আমি। আমি বেশিরভাগ কথা বললাম। লোনি এবং মেরির সঙ্গে। বাচ্চাটা এবং বেটি আনন্দচিত্তে আমাদের গল্প শুনতে লাগল। মেরির বাবা-মা মাঝে মধ্যে আমাদের আড্ডায় অংশ নিলেন দুএকটা মন্তব্য করে।

মেরি খাবার দাবার রান্না ঘর থেকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গেই বসে পড়েছিল খেতে। তবে খাবার যা খাওয়ার আমি আর সে-ই খেলাম। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খাবার প্রায় মুখেই তুলল না। বেশ কয়েকবার কাঁটা চামচে খাবার গেঁথে নিয়ে ঠোঁটে তুললেও পরে আবার তা আলগোছে নামিয়ে রাখল প্লেটে। খাওয়ার নামে আসলে তারা ভান করছিল। এমনকী বাচ্চাটা পর্যন্ত থালায় হাত ডুবিয়ে বসে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আর মাঝে মধ্যে মজার দুএকটা কথা শুনে খিলখিল হাসল।

খাওয়া শেষে আমরা লাইব্রেরি ঘরে গেলাম। মেরির সঙ্গে চলল কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ। মি. অ্যালিসন এবং তাঁর স্ত্রী বই পড়লেন, মাঝেমধ্যে আমাদের আলোচনায় অংশ নিলেন। হাসলেন। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। লোনি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েছে, বেটি বসেছে তার চেয়ারের হাতলের ওপর, আমাদের কলেজের দুএকটা বোকামোর গল্প শুনে হাসিতে কুটিপাটি হলো। তবে জোরে হাসল না, বলাবাহুল্য।

রাত এগারোটার দিকে আমাকে বারবার হাই তুলতে দেখে মেরি তাড়া লাগাল ঘুমাতে যাওয়ার জন্য। আমি বাধ্যগতের মতো শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বেডসাইড টেবিলে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল মেরি। একটা বই পড়তে লাগলাম। ঘুমানোর আগে বই না পড়লে ঘুম আসে না আমার।

.

বই পড়তে পড়তে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেলাম। দেখি মোমবাতি তখনও জ্বলছে। আমি ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা হালকা শব্দ আমার ঝিমুনিটাকে পুরোপুরি দূর করে দিল।

কেউ আমার দরজার হাতল ধরে ঘোরাচ্ছে। শব্দটা ওখান থেকে এসেছে।

আমি চট করে বিছানায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ভান করলাম। যদিও সামান্য চোখ ফাঁক করে দেখছি কী ঘটছে।

আস্তে খুলে গেল দরজা। মিসেস অ্যালিসন ঢুকলেন ঘরে। কোনোরকম শব্দ না করে চলে এলেন আমার শিয়র পাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। আমি চোখ বুজে ফেললাম শক্ত করে যাতে চোখ পিটপট না করে। তবে একটু পরে চোখের পর্দা সামান্য ফাঁক করে দেখি তিনি দরজার দিকে এগোচ্ছেন। আমি গভীর ঘুমে বিভোর ভেবে সন্তুষ্ট। ভাবলাম উনি কামরা থেকে বেরিয়ে যাবেন কিন্তু তিনি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং হলঘরে কাউকে যেন ইশারা করলেন ভেতরে আসতে।

মন্থর গতিতে এবং অবিশ্বাস্য নিঃশব্দে পা টিপে টিপে আমার ঘরে ঢুকলেন মি. অ্যালিসন, লোনি, বেটি এবং বাচ্চা। ওঁরা আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এমন ব্যাকুলভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন যে আমার মায়াই লাগল।

ইচ্ছে করছিল চোখ মেলে তাকাই এবং জিজ্ঞেস করি ওরা এত রাতে কেন আমাকে দেখতে এসেছেন। তবে চুপটি করে থাকাই ভালো মনে করলাম। দেখি ওঁরা কী বলেন। মধ্যরাতের এ অনুপ্রবেশ কিন্তু আমার ভেতরে কোনো ভীতির সঞ্চার করল না। বরং আমি আশ্চর্য শান্তি এবং নিরাপত্তা অনুভব করছিলাম, মনে হচ্ছিল সদাশয় দেবদূতেরা আমাকে পাহারা দিয়ে রাখছেন।

ওঁরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন কোনো কথা না বলে। তারপর কিশোরীটি আমার দিকে ঝুঁকে এল, লেপের ওপর রাখা আমরা হাতে হাত বুলিয়ে দিল। সেই স্পর্শে আমি ভয়ানক চমকে গেলেও বহু কষ্টে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম নিজেকে।

মেয়েটির হাত ভয়ানক ঠান্ডা- তার হাত শুধু শীতলই নয়, মনে হচ্ছিল তার গোটা অবয়ব থেকে বরফ ঠান্ডা একটা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। যেন কেউ আমার গায়ে কনকনে নিঃশ্বাস ফেলছে। তার হাত এক মুহূর্তের জন্য আমার গায়ে ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল কোনো ওজনই নেই ওই ভয়ানক। ঠান্ডা হাতে!

তারপর ওঁরা সবাই, মুখে স্নেহ ও ভালোবাসার হাসি, কোনো কথা না বলে এক লাইনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন খোলা দরজা দিয়ে। ওঁরা কেন এলেন, কী উদ্দেশ্যে কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না আমার। ওদের রহস্যময় আগমনের কারণ ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রাদেবীর কোলে চলে গিয়েছি। জানি না।

.

পরদিন সকালে আমার রুমেই নাশতা নিয়ে এল মেরি। আমি খাচ্ছি, ও গল্প করতে লাগল। আমি ধীরে সুস্থে পোশাক পরে নিলাম। দশটার ট্রেন ধরব। ট্রেন ছাড়ার সময় কাছিয়ে এলে মেরিকে জিজ্ঞেস করলাম ওর পরিবারের লোকজন কোথায় কারণ গত রাতের পর তাদের কাউকে কাছে পিঠে দেখতে পাইনি। আমার মুখে ওর বাবা-মা-ভাই-

বোনের প্রশংসা শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হলো মেরির চেহারা। তবে আমার পরের কথাটি শুনে উজ্জ্বল আভাটুকু ম্লান হয়ে গেল। আমি কিন্তু কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি যাওয়ার আগে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।

সেই অদ্ভুত, দুর্বোধ্য ভাবটা আবার ফিরে এল মেরির চেহারায়। ওরা.. চলে গেছে। টেনে টেনে ফিসফিস করে বলল ও। আমি ওর দিকে হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে আছি দেখে যোগ করল, মানে... ওরা নেই। রাতের আগে... আর ফিরছে না। শেষ কথাটা এমন আস্তে উচ্চারণ করল প্রায় শোনাই যায় না।

কী আর করা। মেরিকে বললাম আমার হয়ে সে যেন তার পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ এবং বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে দেয়। মেরিকে দেখে মনে হলো না ও আমাকে রেল স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কাজেই একাই রওনা হতে হলো। স্টেশনে পৌঁছে দেখি ট্রেন লেট। আমি টিকেট কেটে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিলাম সময় কাটাতে।

মিস অ্যালিসনের পরিবারটি খুব চমৎকার, তাই না? বললাম আমি। সবাই সবার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।

স্টেশন মাস্টার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। তার বলিরেখায় ভরা মুখখানা হঠাৎ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

আপনি ওখানে কাল রাত্তিরে ছিলেন? ব্যাঙের গলায় বলল সে।

ছিলাম তো! বললাম আমি। বুড়োর আচরণে যারপরনাই বিস্মিত। কেন থাকব না?

এবং.... আপনি... ওদেরকে দেখেছেন? তার গলার স্বর ঝপ করে নেমে এল।

মেরির পরিবারের কথা বলছেন? লোকটার প্রশ্নে এবার বিরক্তই। হলাম। অবশ্যই দেখেছি! এতে অবাক হওয়ার কী আছে? কেন, ওদের কোনো সমস্যা আছে?

আমার আগুয়ান ট্রেনের হুইশল শোনা গেল দূর থেকে। তবে আমি বুড়োর জবাব না শুনে নড়ছি না। স্টেশন মাস্টার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গতকালের মতো অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং দ্বিধাগ্রস্ত গলায় জবাব দিল।

ওরা সবাই গত বছর মারা গেছে। ফিসফিস করল সে, ঝুঁকে এল আমার সামনে, বিস্ফারিত চোখ। প্রত্যেকে–গুটি বসন্তে ধ্বংস হয়ে গেছে পরিবারটি –শুধু মেরি ছাড়া!

–মেরি এলিজাবেথ কাউন্সেলম্যান

নিশি আতঙ্ক

গত গ্রীষ্মে, প্যারিস থেকে কয়েক মাইল দূরে, সীন নদীর তীরে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। ওখানে প্রতি রাতে যেতাম ঘুমাতে। কয়েকদিনের মধ্যেই, আমার এক পড়শীর সঙ্গে খাতির হয়ে গেল। লোকটির বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এরকম অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় হয়নি আমার। লোকটি দাঁড় বাইতে খুব পছন্দ করত। সবসময়ই তাকে পানির ধারে কিংবা নদীতে দেখতাম। এ লোকের বোধহয় নৌকার মধ্যে জন্ম, নৌকাতেই হয়তো একদিন তার মৃত্যু হবে।

একদিন সীন নদীর তীর ধরে দুজনে হাঁটছি, লোকটির কাছে নদী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলাম। হঠাৎ লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার চেহারার রং কেমন বদলে গেল, বাকপটু হয়ে উঠল সে এবং প্রায় কবিত্ব এসে গেল তার কথাবার্তায়। তার বুকের মধ্যে একটি জিনিসই শুধু অনুরণন তোলে, একটি বিষয়েই তার যত আগ্রহ এবং অনুরাগ আর তা হলো নদী।

আহ! বলল সে আমাকে, আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এ নদীকে নিয়ে কত যে স্মৃতি রয়েছে আমার। আপনারা যারা শহরে থাকেন তারা নদীর মাহাত্ম বুঝতেই পারবেন না। কিন্তু একজন জেলের কাছে শব্দটি একবার কেবল উচ্চারণ করে দেখুন। তার কাছে নদী বড় রহস্যময়ী, প্রগাঢ়, অচেনা, কল্পনা এবং মরীচিৎকার এক দেশ। যেখানে রাতের বেলা মানুষ এমন কিছু দেখে যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যেখানে লোকে অদ্ভুত সব শব্দ

শোনে, যেখানে অকারণেই একজনের শরীরে উঠে যায় কাঁপুনি যেন গোরস্তানের ভেতরে সে হাঁটছে। এবং সত্যি এটি এক ভয়ানক গোরস্তান যে কবরখানায় কোনো কবর নেই।

জেলেদের কাছে জমিন সীমাবদ্ধ কিন্তু রাতের বেলা অমাবস্যার কালে নদী মনে হয় সীমাহীন। সাগরের প্রতি নাবিকদের কোনো অনুভূতি নেই। সমুদ্র মাঝে মধ্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তর্জন গর্জন করে, আবার আপনার সঙ্গে ভদ্র আচরণও করে। কিন্তু নদী নিরব এবং বিশ্বাসঘাতক। এটি কখনো ফিসফাস শব্দ করে না, নিঃশব্দে বয়ে চলে এবং নিরন্তর এই বয়ে চলা আমাকে সাগরের বড় বড় ঢেউয়ের চেয়েও বেশি আতঙ্কিত করে তোলে।

স্বপ্নচারীরা ভান করে সমুদ্র তার বুকে নীল দিগন্তকে লুকিয়ে রাখে যেখানে ডুবন্ত মানুষ বড় বড় মাছদের সঙ্গে সামনে-পেছনে পাক খায়। কিন্তু নদীর রয়েছে কেবল নিঃসীম কালো গভীরতা, যেখানে পিচ্ছিল কাদার মধ্যে পচে যায় লাশ। এর সমস্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে যখন ভোরের সূর্যের আলোয় চিকমিক করে জল অথবা নলখাগড়ার গায়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিসানির সঙ্গে তীরে ছলাৎ ছলাৎ বাড়ি মারে জল।

তবে আপনি আমার স্মৃতিকথা জানতে চেয়েছেন। আপনাকে আমার জীবনের একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলব যেটি ঘটেছিল দশ বছর আগে।

তখন আমি বাস করতাম, এখনও করি, বুড়ি ল্যাফনের বাড়িতে। আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু লুইস বানেট, সে এখন সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে বলে নৌকা চালানোর শখ বাদ দিয়েছে, বাস করত সি গাঁয়ে–এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে। আমরা প্রতিদিন একসঙ্গে ডিনার করতাম– কখনও ওর বাড়িতে, আবার কখনও ও আমার বাড়িতে আসত মেহমান হয়ে।

একা রাতে আমি একা একা বাড়ি ফিরছি, বেজায় ক্লান্ত, আমার বারো ফুট লম্বা ভারী নৌকাখানার দাঁড় বাইছি শ্রান্ত দেহে, যেটি আমি সাধারণত রাতের বেলাতেই করে থাকি, কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেলাম রেলরোড সেতু থেকে শ দুই মিটার দূরের ঘন নলখাগড়ার ঝোঁপটার ধারে, খানিক দম নেয়ার জন্য। চমৎকার সুন্দর রাত; ঝলমলে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল নদীর জল, বাতাস শান্ত এবং মৃদু। এমন চমৎকার পরিবেশে মনের সুখে ধূমপান করার মজাই আলাদা। আমি নদীতে নোঙর ছুঁড়ে দিলাম পাইপ ধরিয়ে টানবার জন্য।

নৌকা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলছিল, নোঙর সাঁ সাঁ করে নিচে নামতে নামতে একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল; আমি স্টার্নে, ভেড়ার চামড়ার গালিচার ওপর আরাম করে বসলাম। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু তীরে ঢেউয়ের বাড়ি খাওয়ার মৃদু ছলাৎ ছলাৎ ছাড়া। ওখানে মানুষ সমান লম্বা নলখাগড়াগুলো অদ্ভুত সব আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মধ্যে দোল খাচ্ছে বাতাসে।

নদী একদম স্থির এবং নিশ্চল, তবে চারপাশের অস্বাভাবিক নীরবতা আমি উপভোগই করছিলাম। সকল প্রাণীকুল –কোলা ব্যাঙ এবং সোনা ব্যাঙ, জলার নৌকা সঙ্গীত শিল্পী যারা –চুপ করে আছে। হঠাৎ আমার ডান দিকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডেকে উঠল একটা ব্যাঙ। চমকে উঠলাম আমি। তারপর আবার অটুট নিস্তব্ধতা। আমি আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি ধূমপানে মনোনিবেশ করলাম। স্বভাবে অতিশয় ধূমপায়ী হলেও সে রাতে ধূমপান করতে পারছিলাম না। দ্বিতীয়বার পাইপে টান দেয়ার পরেই গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠল। আর মুখ দিলাম না পাইপে। গুণগুণিয়ে একটি গানের সুর ভাঁজতে লাগলাম। নিজের গলার সুর নিজের কাছেই বড্ড বেসুরো ঠেকল। তাই আমি নৌকার তলায় হাত-পা টান টান করে শুয়ে নিবিষ্টচিত্তে আকাশ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপই শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ নৌকাটি দুলতে শুরু করলে অস্বস্তি বোধ হলো আমার। মনে হলো এপাশে-ওপাশে ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর মনে হলো কোনো অদৃশ্য শক্তি এটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়, তারপর আবার তুলে ফেলছে ওপর দিকে। আমি যেন ঝড়ের মাঝখানে হুটোপুটি খাচ্ছি; চারপাশে নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম; দারুণ চমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। দেখি নদীর জলে রূপালি চাঁদের আলো গলে গলে পড়ছে, সবকিছু আশ্চর্য শান্ত।

আমার স্নায়ুগুলো অস্থির হয়ে উঠছিল। ঠিক করলাম এখান থেকে চলে যাব। নোঙরের শিকল ধরে টান দিলাম। দুলে উঠল নৌকা তখন বাধাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। আমি জোরে জোরে টানতে লাগলাম শিকল। কিন্তু নোঙর তো উঠে আসে না। নদীর তলায় কোনো কিছুতে ওটা আটকে গেছে। আমি টেনেও তুলতে পারছি না। আবার

মারলাম টান- বৃথা চেষ্টা। বৈঠা দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম উজানের দিকে নোঙরের অবস্থান পরিবর্তন করতে। কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। নোঙর এখনও নদীর তলায় গেঁথে বা আটকে রয়েছে। রাগের চোটে আমি শিকল ধরে সজোরে নাড়া দিলাম। কিছুই ঘটল না। এ শিকল ভেঁড়ার সাধ্য আমার নেই কিংবা নৌকা থেকে এটা ছুটিয়ে নিতেও পারব না কারণ জিনিসটা ভয়ানক ভারী এবং ওটা নৌকার গলুইতে আমার বাহুর চেয়েও মোটা কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে বোলটু দিয়ে আটকানো। তবে যেহেতু আবহাওয়া ছিল চমৎকার তাই ভাবছিলাম আমাকে বেশিক্ষণ হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। কোনো না কোনো জেলে নৌকার চোখে পড়ে যাব। আমাকে দেখলে তাদের কেউ এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে। আমার দুর্বিপাক আমাকে শান্ত করে রাখল। আমি বসলাম এবং পাইপ ফুকলাম। আমার সঙ্গে ব্রান্ডির একটি ফ্লাস্ক ছিল। দুই-তিন গ্লাস ব্রান্ডি পান করলাম। প্রচুর গরম পড়েছে। প্রয়োজন হলে নক্ষত্ররাজির নিচে শুয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়েই পার করে দিতে পারব রাত।

হঠাৎ নৌকার পাশে একটা শব্দ হতেই আমি দারুণ চমকে গেলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শীতল স্রোতধারা বইল। শব্দটির উৎস, কোনো সন্দেহ নেই, স্রোতে ভেসে আসা কোনো কাঠের টুকরো, তবু একটা অদ্ভুত অস্থিরতা আমাকে গ্রাস করল। আমি নোঙরের শিকল চেপে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগলাম। নোঙর স্থিরই রইল। আমি ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে বসে পড়লাম।

তবে ধীরে ধীরে নদী ঢেকে যাচ্ছিল ঘন সাদা কুয়াশার অবগুণ্ঠনে, জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছিল। আমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েও না নদী, না আমার পা অথবা নৌকা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু নলখাগড়ার ডগা এবং তার পেছনে চাঁদের আলোয় ম্লান সমভূমি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেদিকে বড় বড় কালো কালো বিন্দু সটান ঊর্ধ্বমুখী। ওগুলো ইটালিয়ান পপলার গাছের সারি। আমার কোমর পর্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল সাদা কাপড়ের মতো। অদ্ভুত কুয়াশায়। তখন উদ্ভট সব চিন্তা খেলছিল মাথায়। কল্পনা করছিলাম কেউ আমার নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছে। তবে কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। নদী অদৃশ্য অস্বচ্ছ কুয়াশার পর্দার আড়ালে। মনে হচ্ছিল ওই পর্দার পেছনে কিম্ভুত সব প্রাণী সাঁতরে আসছে আমার দিকে। ভয়ানক একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল আমাকে। খুলির মাঝখানে শিরশিরে একটা অনুভূতি, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে; আমার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। আমি সাঁতার কেটে পালাবার কথা ভাবছিলাম। তক্ষুণি একটা চিন্তা ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল। দেখলাম আমি যেন হারিয়ে গিয়েছি, দুর্ভেদ্য কুয়াশার মধ্যে এদিক সেদিক ভেসে চলেছি, চলেছি লম্বা লম্বা ঘাস আর নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে, ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, তীর দেখতে পাচ্ছি না, নৌকা খুঁজে পাচ্ছি না। এই কালো জলের অতলে কেউ আমার পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামাচ্ছে।

আমার আসলে আগেই উচিত ছিল সাঁতরে নদীর পাঁচশো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে নলখাগড়ার ঝোঁপের মধ্যে উঠে পড়া। ওখানে পায়ের নিচে মাটি থাকত আমার। তবে

আমি যত ভালো সাঁতারুই হই না কেন দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ ঝুঁকিই থাকত নদীতে ডুবে মরার।

আমি যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার ইচ্ছাশক্তি ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে; তবে ইচ্ছাশক্তির পাশে আরেকটি জিনিস ছিল যেটির মধ্যে কাজ করছিল ভয়। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম কীসে ভয় পাচ্ছি। আমার মনের সাহসী অংশ মনের ভীরু অংশকে তীব্র ভৎর্সনা করছিল; এবং আমি এর আগে এত ভালোভাবে কখনো উপলব্ধি করিনি যে আমাদের মনের মধ্যে বিপরীতধর্মী দুটি জিনিস সারাক্ষণ লড়াই করছে এবং একটি অপরটির ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইছে।

এই নির্বোধ এবং ব্যাখ্যাতীত ভীতি আতঙ্কে পরিণত হলো। আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম, চক্ষুজোড়া বিস্ফারিত, উৎকর্ণ কান। কীসের আওয়াজ বা শব্দ শুনব বলে আশা করছিলাম আমি? জানি না। তবে বোধহয় ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে বলে আশঙ্কিত ছিলাম। ওই সময় যদি কোনো মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠত, যা সচরাচর ঘটে, আমি বোধকরি আঁতকে উঠে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম।

তবু, প্রাণপণ চেষ্টায় আমি আমার বোধবুদ্ধি প্রায় ফিরে পেলাম যা আমার কাছ থেকে পালিয়েই যাচ্ছিল। আবারও ফ্লাস্কটি তুলে নিলাম হাতে, বড় বড় ঢোকে পান করতে লাগলাম পানীয়। তারপর একটি বুদ্ধি এল মাথায়। আমি শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে ঘুরে ঘুরে চিৎকার দিতে লাগলাম। গলা যখন পুরোপুরি

ভেঙে গেল চিৎকার করতে করতে চুপ হয়ে গেলাম। পাতলাম কান। অনেক দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের ডাক।

আবার ব্রান্ডি পান করলাম এবং নৌকার তলায় শুয়ে পড়লাম পিঠ দিয়ে। ঘণ্টাখানেক কিংবা দুই ঘণ্টাও হতে পারে ওভাবে শুয়ে রইলাম আমি চোখ মেলে তাকিয়ে। নানান দুঃস্বপ্ন ঘিরে থাকল আমায়। উঠে বসার সাহস হচ্ছিল না। যদিও প্রবল একটা ইচ্ছা জাগছিল মনে। মনে মনে নিজেকে বলছিলাম ওঠ! উঠে পড়! কিন্তু নড়াচড়া করতে বিষম ভয় লাগছিল। অবশেষে অনেক সাবধানে এবং নিঃশব্দে শরীরটাকে টেনে তুললাম আমি। উঁকি দিলাম নৌকার কিনার দিয়ে।

অমন অপূর্ব সুন্দর এবং মনোহর দৃশ্য জীবনে দেখিনি। ঘণ্টা দুই আগেও যে কুয়াশা ভাসছিল জলের ওপর তা ক্রমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নদী তীরে স্তূপ হয়ে জমে আছে। নদী এখন ঝকঝকে। কুয়াশা নদীর দুই পাশে ছয়-সাত মিটার উচ্চতায় নিচু দুটি পাহাড় তৈরি করেছে। পূর্ণিমার আলোয় মনে হচ্ছিল যেন বরফ পাহাড়। আমার মাথার ওপর নীল দুধ সাদা আকাশে বিশাল জ্বলজ্বলে চাঁদ।

জলের প্রাণীগুলো এবার যেন ফিরে পেল প্রাণ, কোলা ব্যাঙ ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ করে ডাকতে লাগল, আমার ডান এবং বাম দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল জলার ব্যাঙদের কোরাস। অদ্ভুত ব্যাপার আমার আর ভয় করছিল না। ওই অপরূপ দৃশ্যপট আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দেয়।

দৃশ্যটি কতক্ষণ দেখেছি মনে নেই। কারণ এক সময় আমি ঘুমে ঢুলতে থাকি। আবার চোখ মেলে দেখি চাঁদ নেই আকাশে, চারদিকে মেঘের ভেলা। নদীর জলে ছলাৎ ছলাৎ, বাতাসের কানাকানি, শীত শীত লাগছে, নিবিড় হয়ে এসেছে আঁধার।

ফ্লাস্কে যেটুকু ব্রান্ডি তখনও অবশিষ্ট ছিল পুরোটা গিলে নিলাম ঢকঢক করে। তারপর কম্পমান দেহে শুনতে লাগলাম নলখাগড়ার ঝোঁপের মধ্যে শরশর শব্দ আর নদীর ভুতুড়ে আওয়াজ। আমি চোখ কুঁচকে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভীষণ অন্ধকারে আমার নৌকা কিংবা নিজের হাত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হাত চোখের সামনে এনেও দেখতে। পাচ্ছিলাম না।

যাহোক, আস্তে আস্তে আঁধারের কালো পর্দাটি কেটে যেতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো একটা ছায়া চলে এসেছে আমার পাশে। ভয়ে চিৎকার দিলাম! সাড়া দিল একটি কণ্ঠ-একজন জেলে। আমি তার উদ্দেশে হাঁক ছাড়লাম। সে এগিয়ে এল। আমার অসহায়ত্বের কথা তাকে জানালাম। সে তার নৌকা নিয়ে এল আমার নৌকার পাশে। দুজনে মিলে শিকল ধরে টানতে লাগলাম। কিন্তু নোঙর নড়ে না।

অবশেষে ফর্সা হলো। ধূসর, শীতল, বৃষ্টির একটি দিনের আবির্ভাব ঘটল। এরকম দিন সবসময়ই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। আমি আরেকটি জেলে নৌকা দেখতে পেয়ে ডাক দিলাম। এগিয়ে এল সে। ওই লোকটিও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। তিনজনে মিলে

টানতে শুরু করলাম শিকল। একটু একটু করে আত্মসমর্পণ করল নোঙর। টের পাচ্ছিলাম খুব ভারী কিছু নিয়ে ওটা ওপরে উঠে আসছে। অবশেষে ওটাকে টেনে তুললাম কালো আবর্জনার একটা পিন্ডসহ।

আর আবর্জনার পিন্ডটি হলো এক বৃদ্ধার লাশ, গলায় মস্ত একটি পাথর বাঁধা!

–গী দ্য মোপাসাঁ

পাদশব্দ

এক

বাড়িটি দেখলেই বোঝা যায় বহু প্রাচীন। মফস্বল শহরটির এ মহল্লার বেশিরভাগ বাড়িঘর পুরানো। তবে ১৯ নম্বর বাড়িটি পুরানোদের মধ্যেও পুরানো। গির্জার গাম্ভীর্য ধারণ করে রয়েছে বাড়িটি, ভীষণ ধূসর এবং ভীষণ ঠান্ডা। বাড়িটির মধ্যে কেমন নিষিদ্ধ একটি ভাব আছে, গা ছমছমে একটি ব্যাপার রয়েছে। অন্য কোনো শহরে হলে এ বাড়িটি সহজেই ভুতুড়ে তকমা পেয়ে যেত কিন্তু ওয়েমিনস্টারে কোনো ভূতের উপদ্রবের কথা কস্মিনকালেও শোনা যায়নি। ১৯ নম্বর বাড়িটি কোনো ভৌতিক বাড়ি নয় তবু বছরের পর বছর ধরে এ বাড়ির সামনে ঝুলে আছে একটি সাইনবোর্ড :

এ বাড়িটি ভাড়া অথবা বিক্রি করা হবে

দুই

মিসেস ল্যাংকাস্টার বাড়িটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। বাড়ির বাঁচাল এজেন্টটি সেই থেকে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেই। ১৯ নম্বর বাড়িটি ভাড়া দেবার একটা মওকা মেলার সুযোগেই বোধহয় তার এমন খুশি। সে দরজার তালা খোলার সময়ও বকবক থামাল না।

বাড়িটি কদ্দিন ধরে খালি পড়ে আছে? জানতে চাইলেন মিসেস ল্যাংকাস্টার।

এজেন্ট র‍্যাডিস জবাব দিতে গিয়ে একটু তোতলাল। আ-উ-কয়েক বছর ধরে।

আমিও তা-ই ভেবেছি, শুকনো গলা মিসেস ল্যাংকাস্টারের।

আধো আলোয় হলঘরটি বিশ্রীরকম ঠান্ডা। কল্পনা পিয়াসী কোনো নারী হলে হয়তো শিউরে উঠত কিন্তু মিসেস ল্যাংকাস্টার অন্য ধাঁচের মানুষ। ভীষণ রকম বাস্তববাদী। তিনি বেশ লম্বা, কোমর ছাপানো বাদামী কেশ, চক্ষু দুটি নীল এবং শীতল।

তিনি বাড়ির চিলেকোঠা থেকে সেলার পর্যন্ত সব ঘুরে দেখলেন, এজেন্টকে মাঝেমাঝে প্রাসঙ্গিক দুএকটি প্রশ্ন করলেন। বাড়ি দেখা শেষ হলে ফিরে এলেন রাস্তার দিকে মুখ ফেরানো একটি ফ্রন্ট রুমে। গম্ভীর চেহারা নিয়ে এজেন্টের মুখোমুখি হলেন।

এ বাড়ির সমস্যা কী?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল র‍্যাডিস। আসবাবহীন বাড়ি একটু গা ছমছমে মনে হবেই, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে।

ধ্যাত্তেরি, বললেন ল্যাংকাস্টার। আমি তা জিজ্ঞেস করিনি। এরকম বিশাল একটি বাড়ি অথচ ভাড়া অবিশ্বাস্য কম। এর নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। বাড়িটি কি ভুতুড়ে?

আবারও চমকাল এজেন্ট, তবে তক্ষুণি কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ল্যাংকাস্টার। একটু পরে কথা বললেন তিনি আবার।

ভূত প্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। আর এ বাড়ি নিয়ে আমি কোনো অভিযোগও করছি না। তবে জানেনই তো ভৃত্যরা কুসংস্কার কীরকম বিশ্বাস। করে এবং ভয়ও পায়। আপনি আমাকে খোলা মনে বলতে পারেন এ বাড়িটিকে কোনো অপ্রাকৃত শক্তি তাড়া করে ফিরছে কি না।

আ-ইয়ে-আমি ঠিক জানি না, আবার বিড়বিড় করল এজেন্ট র‍্যাডিস। অবশ্যই জানেন, শান্ত গলায় বললেন মিসেস ল্যাংকাস্টার। আমি সত্যি কথাটি না জেনে এ বাড়ি ভাড়া নেব না। কী ছিল ঘটনা? খুন খারাবী?

আরে! না, প্রায় আর্তনাদ করে উঠল এজেন্ট। ঘটনা একটা একটা বাচ্চাকে নিয়ে।

বাচ্চা? কী?

গল্পটা সত্যি কি মিথ্যা জানি না আমি, কারণ নানাজনে নানা কথা বলে। তবে শুনেছি ত্রিশ বছর আগে উইলিয়ামস নামে এক লোক এ বাড়িটি ভাড়া করেছিল। তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি; সে কোনো চাকর বাকর রাখত না; তার কোনো বন্ধু ছিল না; দিনের বেলা খুব কমই বেরোত সে। তার একটি সন্তান ছিল। একটি বাচ্চা ছেলে। এ বাড়িতে দুমাস থাকার পরে সে লন্ডনে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কীসের অভিযোগে তাও আমার জানা নেই। তবে অভিযোগটা নিশ্চয় গুরুতর ছিল । কারণ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি করে আত্মহত্যা করে। এদিকে বাচ্চাটি তখন এ বাড়িতে ছিল একা। তার বাবা তার জন্য অল্প কিছু খাবার রেখে গিয়েছিল। বাবার ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছিল সে। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো তার বাবা তাকে কঠোরভাবে বারণ করেছিল সে যেন কোনো অবস্থাতেই ঘরের বার না হয় এবং কারও সঙ্গে কথা না বলে। বাচ্চাটি ছিল ভীষণ দুর্বল এবং ভীতু প্রকৃতির। বাবার আদেশ অমান্য করার সাহস তার ছিল না। পড়শীরা জানত না যে তার বাবা তাকে রেখে চলে গেছে। তারা মাঝে মাঝে খালি বাড়িতে ছেলেটির কান্নার আওয়াজ শুনত।

বিরতি দিল র‍্যাডিস।

এবং-আ-ছেলেটি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে, নিরুত্তাপ গলায় উপসংহার টানল সে।

এবং সেই বাচ্চাটির ভূত এখন এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ল্যাংকাস্টার।

না, না, সেরকম কিছু না, দ্রুত বলে উঠল এজেন্ট। কেউ কিছু বা কাউকে দেখেনি এখানে। শুধু লোকে বলে, তাদের কথা হাস্যকর অবশ্যই, তারা বলে তারা নাকি মাঝে মাঝে বাচ্চাটির কান্না শুনতে পায়।

সদর দরজার দিকে পা বাড়ালেন ল্যাংকাস্টার।

এ বাড়িটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, বললেন তিনি। এ ভাড়ায় এত সুন্দর বাড়ি আর পাব বলে মনে হয় না। সে যাকগে, আপনাকে আমি শীঘ্রি জানাচ্ছি।

তিন

বাড়িটি খুব সুন্দর, তাই না, বাবা?

মিসেস ল্যাংকাস্টার সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছেন তার নতুন বাসস্থান। ধূসর রঙের কার্পেট, নতুন ঝকঝকে ফার্নিচারসহ ঘর সাজানোর নানান উপকরণে বাড়িটির চেহারাই বদলে গেছে। ১৯ নম্বর বাড়ি থেকে সেই গা ছমছমে ভাবটি একেবারেই অদৃশ্য।

তিনি কথা বললেন রোগা-পাতলা, বয়সের ভারে ন্যুব্জ একটি মানুষের সঙ্গে। মেয়ের সঙ্গে বিপত্নীক মি, উইনবানের কোনো মিলই নেই বলতে গেলে।

হুঁ, হাসলেন মি. উইনবার্ন। কেউ কল্পনাই করতে পারবে না বাড়িটি ভুতুড়ে ছিল।

বাবা, বাজে কথা বলবে না। আজ সবে এলাম আমরা এ বাড়িতে।

আবারও হাসলেন উইনবার্ন সাহেব।

ঠিক আছে, আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই।

এবং প্লিজ, বললেন ল্যাংকাস্টার। নিষাদের সামনে যেন এসব নিয়ে কিছু বোলো না। ও ভয় পাবে।

জফ মিসেস ল্যাংকাস্টারের একমাত্র ছেলে। জফের জন্মের বছরখানেক বাদে তার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। পরিবারে সদস্য এখন জফ, তার মা আর দাদু। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানালার কাঁচে ফোঁটা পড়ে শব্দ তুলছে– টুপটাপ, টুপটাপ।

শোনো, বললেন উইনবার্ন, বৃষ্টির শব্দটা মনে হচ্ছে না বাচ্চা ছেলের পায়ের আওয়াজ?

ওটা বৃষ্টির শব্দই, বাবা, হাসলেন ল্যাংকাস্টার।

উঁহু, আমি যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কৃত্রিম ভয়ে চিৎকার দিয়ে কান খাড়া করলেন উইনবার্ন সাহেব।

হাসতে হাসতে খুন হলেন ল্যাংকাস্টার। বাবার রসিকতার অভ্যাসটা যত বয়স বাড়ছে তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হেসে ফেললেন মি. উইনবার্নও। হলরুমে বসে চা পান করছিলেন বাবা ও মেয়ে। সিঁড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন উইনবার্ন। এবারে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন সিঁড়ি অভিমুখে।

তার নাতি জিওফ্রি ওরফে জফ সিঁড়ি বেয়ে ধীর গতিতে নেমে আসছে। অচেনা জায়গা দেখলে বাচ্চাদের চেহারায় যেমন একটা কৌতূহল এবং ভয়ের ভাব থাকে, সেরকম একটা ভাব তার চেহারায়। সিঁড়িগুলো ওক কাঠের তবে ওতে এখনও কার্পেট পাতা হয়নি। জফ সিঁড়ি বেয়ে নেমে মায়ের কাছে চলে এল। উইনবার্ন সাহেব একটু চমকে উঠলেন। জফ যখন মেঝেতে পা ফেলে হেঁটে আসছিল ওই সময় তিনি সিঁড়িতে আরেকটি পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন, যেন কেউ পিছু নিয়েছে তাঁর নাতির। টেনে টেনে পা ফেলছিল কেউ, যেন হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকালেন মি. উইনবার্ন। নিশ্চয়ই বৃষ্টির শব্দ মনে মনে বললেন।

আমি স্পঞ্জ কেক খাব, বলে প্লেট থেকে এক টুকরো কেক তুলে নিয়ে মুখে পুরল জফ।

নতুন বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে, সোনা? জানতে চাইলেন ল্যাংকাস্টার।

খুব, কেক চিবোতে চিবোতে সংক্ষেপে জবাব দিল জিওফ্রি। পুরোটা খাওয়ার পরে এক গ্লাস পানি খেল সে ঢকঢক করে। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে কথার তুবড়ি ছোটাল।

মাম্মি, এ বাড়িতে চিলেকোঠা আছে আমাকে বলেছে জেন। আমি ওখানে যেতে পারি, মা? নিশ্চয় ও ঘরে কোনো গোপন দরজা আছে যদিও জেন বলছে নেই। কিন্তু আমি জানি আছে। ওখানে পানির পাইপও আছে নিশ্চয়। ওগুলো নিয়ে আমি খেলব? প্রত্যাশা নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল জফ।

নিশ্চয় খেলবে, সোনা। বললেন ল্যাংকাস্টার। কাল আমরা চিলেকোঠায় যাব, কেমন? এখন তুমি ইট দিয়ে বাড়ি বানাও গে।

খুশি মনে চলে গেল জফ।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে সমানে। বৃষ্টির শব্দ শুনছেন মি. উইনবার্ন। তিনি তখন কাঁচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দই হয়তো শুনেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর মন খচখচ করতে থাকে।

বারবার মনে হচ্ছিল কোনো বাচ্চার পায়ের আওয়াজই আসলে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।

সে রাতে অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখলেন মি. উইনবার্ন।

স্বপ্নে দেখলেন তিনি একটি শহরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। বড় একটি শহর। কিন্তু মনে হচ্ছিল এটি শিশুদের শহর, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নেই এখানে, শুধু শিশু ছাড়া। শত শত শিশু। স্বপ্নের মধ্যে সবাই তাঁর কাছে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করছিল, তুমি কি ওকে নিয়ে এসেছ? ওরা কাকে নিয়ে আসতে বলছে তা যেন বুঝতে পারলেন উইনবার্ন সাহেব। করুণ মুখ করে ডানে বামে মাথা নাড়লেন। আনেননি। তখন বাচ্চাগুলো উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল তাঁর কাছ থেকে।

শহর এবং শিশুরা অদৃশ্য হয়ে গেল। জেগে গেলেন উইনবার্ন সাহেব। দেখলেন বিছানায় শুয়ে আছেন। কিন্তু বাচ্চাদের কান্না, ফোঁপানির আওয়াজ এখনও যেন ভেসে আসছে কানে। পুরোপুরি জেগে গেছেন তিনি তবু কান্নার আওয়াজটা শুনতে পেলেন পরিষ্কার। ভেসে আসছে দূর থেকে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে কেউ। শিশু কণ্ঠের কান্না। জফ নিচতলায় ঘুমায়। কান্নার শব্দটা ওখান থেকে আসছে না। আসছে ওপরতলা থেকে। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। একটি দেশলাই কাঠি জ্বাললেন। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কান্নার আওয়াজ।

চার

স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্ন পরবর্তী ঘটনার কথা মেয়েকে কিছুই বললেন না উইনবার্ন সাহেব। তিনি জানেন ওটা তার কল্পনা ছিল না এবং দিনের বেলা আবারও পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। চিমনি থেকে হাওয়ার গোঙানি শোনা যাচ্ছিল তবে ওই আওয়াজ ছাপিয়েও পরিষ্কার শব্দটা শুনতে পেলেন। তিনি– ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে কেউ।

এবং উইনবার্ন সাহেব শীঘ্রি আবিষ্কার করলেন শিশু কণ্ঠের কান্না তিনি ছাড়া আরও দুএকজন শুনেছে। কাজের বুয়া জেন পার্লার মেইডকে বলছিল, জফ বাবুকে সে সকালবেলায় কাঁদতে শুনেছে। আড়াল থেকে কথাটা শুনে ফেললেন উইনবার্ন সাহেব। তবে জফ যখন নাশতা খেতে এল তাকে দারুণ সজীব দেখাচ্ছিল, দেখে মনে হলো না সে সকালবেলায় কান্নাকাটি করেছে। মি. উইনবার্ন ভালো করেই জানেন কাজের বুয়া জফ নয় সেই বাচ্চাটির কান্না শুনেছে যে বাচ্চাটির পায়ের শব্দ শুনে গতকাল বিকেলে তিনি চমকে উঠেছিলেন।

তবে মিসেস ল্যাংকাস্টার কিছু শুনলেন না। অন্য ভুবনের কোনো শব্দ শোনার জন্য সম্ভবত তৈরি করা হয়নি তাঁর কান।

তবে একদিন বিকেলে তিনি তড়িতাহতের মতো চমকে উঠলেন।

মাম্মি, আবদারের গলায় ডাকল জফ। আমাকে ওই ছোট্ট বাবুটার সঙ্গে তুমি খেলতে দেবে?

গল্প লেখায় মগ্ন ছিলেন ল্যাংকাস্টার, ছেলের ডাকে চমকালেন।

কোন্ ছেলে, সোনা? মুখ তুলে চাইলেন তিনি জফের দিকে।

ওর নাম জানি না। তবে চিলেকোঠায় থাকে, মেঝেয় বসে কাঁদছিল। আমাকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। মনে হয় খুব লাজুক ছেলে, আমার মতো এখনও বড় হয়নি। আমি নার্সারি বিল্ডিং বানাচ্ছি, দেখি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভীষণ একা লাগল বাচ্চাটাকে। মনে হলো আমার সঙ্গে খেলতে চায়। আমি বললাম, এসো, একসঙ্গে বিল্ডিং বানাই। কিন্তু ও কিছু বলল না। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে একটা চকোলেটের বাক্স দেখছে কিন্তু তার মা তাকে বাক্সটা ধরতে মানা করেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জফ। কিন্তু আমি যখন জেনকে ছেলেটার কথা বললাম, জানালাম আমি ওর সঙ্গে খেলতে চাই, সে আমাকে বলে কিনা এ বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলে নেই। আমাকে চোখ রাঙাল যেন বানিয়ে কিছু না বলি। জেনটাকে আমার একদম ভাল্লাগে না।

চেয়ার ছাড়লেন জিওফ্রির মা।

জেন ঠিকই বলেছে। এ বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলে থাকে না।

কিন্তু আমি যে ওকে স্পষ্ট দেখলাম। ও মা, আমাকে ওর সঙ্গে খেলতে যেতে দাও না! ছেলেটা খুবই একা আর বড় দুঃখী। ওর জন্য কিছু করতে চাই আমি, যাতে ওর মনটা ভালো হয়ে যায়।

ল্যাংকাস্টার কড়া গলায় সন্তানকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মাথা নেড়ে তাকে মানা করলেন উইনবার্ন সাহেব।

দাদু, কোমল গলায় বললেন তিনি নাতিকে, ওই বাচ্চাটা নিশ্চয় খুব দুঃখী আর ওর দুঃখ দূর করার জন্য তোমারও কিছু করা উচিত। কিন্তু আগে ভেবে বের করতে হবে কী করলে ওর মন ভালো হয়ে যাবে, দূর হয়ে যাবে একাকীত্ব। মনে করো এটা একটা ধাঁধা। এবং এ ধাঁধার জবাব তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

বড়দের মতো করে ধাঁধার জবাব খুঁজব? তার মানে কি আমি বড় হয়ে যাচ্ছি?

হ্যাঁ, তুমি বড় হয়ে যাচ্ছ।

নিঃসঙ্গ ছেলেটার জন্য কিছু একটা করতে পারবে এ খুশিতে চলে গেল জফ। মিসেস ল্যাংকাস্টার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ফিরলেন বাবার দিকে।

বাবা, দিস ইজ অ্যাবসার্ড। ছেলেটাকে ওভাবে উৎসাহিত করা মানে চাকর-বাকরদের গল্পে ওকে বিশ্বাসী করে তোলা।

না, ওরা কিছু ওকে বলেনি, বললেন বৃদ্ধ। ও দেখেছে আমি যা শুনেছি, মানে ওর বয়সী হলে আমিও একই জিনিস হয়তো দেখতাম।

কী আবোল তাবোল বকছ! আমি কেন কিছু দেখিনি কিংবা শুনিনি? মি. উইনবার্ন তাঁর ব্যাংকার এবং পার্টটাইম লেখক মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলেন কেবল, জবাব দিলেন না।

কেন?

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন ল্যাংকাস্টার। আর তুমি ওকে বলতেই বা গেলে কেন ওই ওকে-ওটাকে সাহায্য করতে পারবে?

বললাম কারণ তোমার সেই ওটার ব্যাপারে জফের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস জন্মেছে। সকল শিশুর মধ্যেই দারুণ কল্পনাপ্রবণ একটা মন থাকে। কিন্তু আমরা যত বড় হই, এ কল্পনা থেকে ততই দূরে সরে যাই এবং এক সময় কল্পনাপ্রবণ মনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই। আর মাঝে মাঝে, খুব যখন বুড়িয়ে যাই, একটা হালকা আলোকরেখা ফিরে আসে

আমাদের কাছে, মনে করিয়ে দেয় শৈশবের অনেক স্মৃতি। এজন্যই আমার মনে হয়েছে জফ সাহায্য করতে পারবে।

ঠিক বুঝলাম না, অস্পষ্ট গলায় বললেন ল্যাংকাস্টার। আমিও যে ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝতে পেরেছি তা নয়। ওই-ওই বাচ্চাটা বিপদে আছে- সে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু কীভাবে মুক্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। তবে একটা বাচ্চা অসহায়ের মতো শুধু কেঁদে চলেছে, কথাটা ভাবলেও বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

পাঁচ

এ ঘটনার এক মাস পরে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল জিওফ্রি। ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে জানালেন কেস খুব খারাপ। ছেলের মাকে বললেন, আপনার ছেলের লাং-এ অনেকদিন ধরেই সমস্যা। ও আর সুস্থ হবে বলে মনে হয় না।

ছেলের শুশ্রূষা করতে গিয়ে অন্য আরেকটি বাচ্চার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন ল্যাংকাস্টার। ফোপানি বা গোঙানির আওয়াজটাকে তিনি প্রথমে বাতাসের আর্তনাদ ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে শব্দটা ক্রমে আরও জোরাল এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেন ইনিয়ে বিনিয়ে অসহায় গলায়, হৃদয় ভেঙে দেয়া স্বরে কাঁদছে একটি শিশু।

প্রচন্ড জ্বরে প্রায় বেহুঁশ জফ এ সময় ককিয়ে উঠে বারবার বলতে লাগল, আমি ওকে সাহায্য করতে চাই। আমি ওকে সাহায্য করতে চাই!

কান্নার চোটে হেঁচকি উঠে গেল ছেলেটার, তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শরীর হয়ে উঠল শক্ত, নিঃশ্বাস প্রায় নিচ্ছেই না বলা চলে, নিশ্চুপ হয়ে গেল। এখন ওকে চুপচাপ দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তারপর রাত এল। স্থির রাত। বাতাসের আন্দোলন নেই কোথাও।

হঠাৎ নড়ে উঠল জিওফ্রি। চাইল চোখ মেলে। মাকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেল খোলা দরজায়। কথা বলার চেষ্টা করল, জফের দিকে ঝুঁকে এলেন ছেলের কথা শুনতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে জফ বলল, ঠিক আছে। আমি আসছি। বলেই মাথাটা এলিয়ে পড়ল বালিশে।

দারুণ ভয় পেলেন ল্যাংকাস্টার, এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে মি. উইনবার্নের কাছে গেলেন। কাছে পিঠে কোথাও থেকে ভেসে এল সেই বাচ্চার খলখল হাসি। হাসছে আনন্দে, বিজয়ের উল্লাসে। তার খুশি ভরা হাসির আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

আমার ভয় লাগছে, বাবা! আমার ভয় করছে! গুঙিয়ে উঠলেন মিসেস ল্যাংকাস্টার।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন বাবা। অকস্মাৎ এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া চমকে দিল দুজনকেই। দমকা বাতাসটি মুহূর্তেই উধাও। আবার আগের মতোই স্থির হাওয়া।

থেমে গেছে ভৌতিক হাসি। এবারে শোনা গেল মদু একটি শব্দ। এমনই আবছা, কানে প্রায় শোনাই যায় না, তবে আওয়াজের মাত্রা ক্রমে বেড়ে চলল এবং তারা শব্দটিকে চিনতে পারলেন। পায়ের আওয়াজ হালকা পদশব্দ এবং দ্রুত।

কাঁচের গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার মতো শব্দ- টুপ-টাপ-টুপটাপ ।

থেমে থেমে শব্দটা হচ্ছে। এবারে এ শব্দের সঙ্গে যোগ হলো নতুন আরেক জোড়া পায়ের আওয়াজ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দুটি শিশু হাঁটছে।

শব্দগুলো এগিয়ে এল দরজার কাছে।

দরজা পার হলো পায়ের শব্দ। টুপটাপ, টুপটাপ, থপথপ থপথপ দুজন মানুষের পায়ের শব্দ মিশে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

মিসেস ল্যাংকাস্টার উন্মাদের মতো মুখ তুলে তাকালেন। ওরা এখন দুজন!

ভয়ে সাদা হয়ে জফের ঘরের দরজায় ছুটে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তার বাবা তাকে ধরে রাখলেন জোর করে। হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন সিঁড়ির দিকে। ওই শোনো, স্বাভাবিক গলায় বললেন তিনি।

দুজোড়া পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে।

টুপটাপ, টুপটাপ, থপথপ, থপথপ ।

তারপর কেবলই নিরবতা।

–আগাথা ক্রিস্টি

প্রেতিনীর প্রেম

ছেলেবেলায় বেটসভিলের মরগান প্ল্যানটেশন হাউসটিকে আমরা ভাবতাম হানাবাড়ি।

তবে ভূতের ভয় আমাকে কখনও কাবু করতে পারেনি। তাই যখন সুযোগ পেলাম, গত শরতে বাড়িটি কিনে ফেললাম।

নিউ ইয়র্ক শহর আমার আর ভাল্লাগছিল না–এর তীব্র দাবদাহ, মাথা খারাপ করে দেয়া চিৎকার চেঁচামেচি আর শব্দ এবং প্যাঁচপেঁচে গরমে প্রায় শূন্য থিয়েটারে হপ্তায় নটি করে শশা পরিচালনা করে আমি বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

নাটকের আয়ের পাঁচ শতাংশ আয় আমার ভাগে আসে। এ নাটক আরও বছরখানেক চলবে–সে আমি থাকি আর না-ই থাকি–কাজেই বোঁচকা নিয়ে ফিরে এলাম বেটসভিল।

রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যখন আমাকে মরগান প্ল্যানটেশনের কথা বলল তখনই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা বড়ই সাদাসিধা। বৃক্ষ আচ্ছাদিত একটি রাস্তা দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, মাঠ ঘাট পেরিয়ে, নিদ্রিত একটি নদীর ওপরের কাঠের পুরানো সেতু পার হয়ে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে।

গাড়ি থামল। আঙুল তুলে দেখাল এজেন্ট। দীর্ঘদিন অবহেলিত পড়ে থাকা একটি ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় নিতান্তই অসুখী চেহারার প্রকাণ্ড বাড়িটি আমার দৃষ্টিগোচর হলো। বাড়ির লম্বা লম্বা জর্জিয়ান কলাম বা থামগুলো যথেচ্ছ বেড়ে ওঠা গাছপালার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়েছে। বৃত্তাকার ড্রাইভওয়েটি আগাছাভরা রাস্তার মাঝ দিয়ে চলে গেছে। দেখে বিশ্বাস করা মুশকিল এখানে একদা পান্না সবুজ রঙের লন ছিল, পায়ের নিচে শোভা পেত মখমল ঘাসের কার্পেট।

ম্যাগনেলিয়া গাছও রয়েছে প্রচুর মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে, বাড়ির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে ফুলভরা পাহারাদের চেহারা নিয়ে।

আর এসবের মাঝখানে, উঁচু উঁচু ঘাস ছাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে পাথরের এক নিগ্রো, দুহাত দুপাশে ছড়ানো তার, যেন দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে।

আমি এ বাড়িটা নেব, বললাম আমি।

লম্বা, ঢালু কাঁধের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট তার টাক মাথায় খড়ের টুপিটি ঠেলে দিয়ে টেনে টেনে বলল, আপনি একবার বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখবেন না?

দরকার নেই– অ্যাপ্রেইজার বলেছে বাড়ির অবস্থা ভালো।

সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল। এ জায়গা ঠিকঠাক করতে কিন্তু কিছু খরচাপাতি হবে।

আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম। শহুরে রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো ওরা যেভাবেই হোক ক্রেতার কাছে মাল গছিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে, বাড়ির ভালোমন্দ দিকগুলোর কথা তারা বলেও না। কিন্তু সরল লোকটি আমার সঙ্গে কোনরকম ফাঁকিবাজির চেষ্টা করছে না।

বাড়িটির দিকে আবার তাকালাম আমি। শেষ বিকেলের নরম রোদের রেখা পড়েছে ম্যানসনটির ওপর। সিভিল ওঅরের আগে এ বাড়িটির চেহারা কেমন ছিল কল্পনায় দেখতে পেলাম আমি সাজানো গোছানো হলে একে হয়তো আবার আগের মতই লাগবে। আমি এ বাড়ি কিনব, পুনরাবৃত্তি করলাম।

ঠিক আছে, মিস্টার স্পোর। আমি আগামী সপ্তাহে কাগজপত্র রেডি করছি।

দশদিন পরে বাড়িটির মালিক হয়ে গেলাম আমি। আধ ডজন লোক ভাড়া করলাম এর নানারকম সংস্কার এবং বাগানটি ঠিকঠাক করার জন্য, তিন মহিলা ভেতরের কামরাগুলো পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল। পরবর্তী দুই হপ্তা ঝোঁপঝাড় এবং বাড়ির পঞ্চাশ বছরের ধুলো আকাশের বুকে ভারী একটি আচ্ছাদন হয়ে ঝুলে রইল।

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য নিউ ইয়র্ক থেকে উড়ে এল পিয়েরে স্যাভর। ছোটখাট ফরাসীটি যখন এ বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি, রিসেপশন হলের শতবর্ষী পারস্য টাইল ফ্লোর ইত্যাদি দেখল ঘনঘন টুসকি বাজাতে শুরু করল। বাড়িটির দশখানা শয্যাকক্ষ, ৩৫ বাই ৩৫ ফুট আয়তনের ভোজন কক্ষ এবং নিউ ইয়র্কে আমার পেন্টহাউজ সমান পাঠকক্ষ সাজাতে ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হলো পিয়েরেকে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকবারই নানান জিনিস কিনতে দোকানে গেল ও।

এসব যখন চলছে, এমন একদিনে আমি হাঁটাহাঁটি করছি বাইরের জমিনে, আমার প্রথম দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখি আমার বাড়ির পুকুর পাড়ে বসে দুটি বাচ্চা ছেলে ভীতচকিত ভঙ্গিতে মাছ ধরছে।

ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের আমি হাই বলেছি, ওরা বঁড়শি ফেলে দে ছুট। আমি কত ডাকাডাকি করলাম কিন্তু ওরা আর ফিরলই না। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম ওদের যখন খুশি এখানে এসে মৎস্য অভিযান চালাতে পারে।

ওখানে আরেক লোক ছিল, এক সাংবাদিক, নাম টড জনসন। এ সারাক্ষণ মদ নিয়ে আছে। কৈশোরে আমি বেটসভিল বিকন পত্রিকার ডেলিভারি বয় ছিলাম। সে এ পত্রিকায় কাজ করে। মহল্লার ছেলে মরগান ম্যানসন কিনেছে, এরকম একটি শিরোনাম দিয়ে সে আমাকে নিয়ে একটি আর্টিকেল লিখতে চাইছিল।

সামনের বারান্দায় বসে, তিন গ্লাস মদ পেটে যাওয়ার পরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল টড জনসন। আমি যাদেরকে প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম তাদের নিয়ে শুরু করল গল্প।

জো ডর যুদ্ধে মারা গেছে শুনে আমি মর্মাহত হওয়ার ভান করলাম– যদিও এ লোক কিংবা তার নাম কোনটিই আমার স্মরণে আসছিল না।

তারপর ধরো গে ভারননের কথা ভারনন মুর যার সঙ্গে তুমি স্কুলে যেতে। সে মন্টোগোমারি কাউন্টিতে টাকার লোভে এক বিধবাকে বিয়ে করে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যায়। ওখানে এখন একটি মোটেল চালাচ্ছে! সে বকবক করেই যেতে লাগল শুধু বিরতি দিল জানতে সে আরেকটি ড্রিংক খেতে চাইলে আমি কিছু মনে করব কিনা।

টড জনসনের কচকচানি আমার আর ভাল্লাগছিল না। যখন মরগান প্ল্যানটেশন নিয়ে গপ্পো ফেঁদে বসল, ভাবছিলাম কোন্ ছুতোয় ওকে বিদায় করা যায়।

তুমি ওকে দেখনি, দেখেছ কি? চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাল টড। বলিরেখা ভরা মুখে প্রত্যাশা।

কে? আমি একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলাম।

স্যালি-স্যালি মরগান! মনে নেই –ও তো এখানকার ভূত।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না...।

আরি, ঠিকই মনে আছে তোমার, উদাস গলায় বলল সে।

ও গৃহযুদ্ধের সময় জনি মরগানকে বিয়ে করেছিল। ও ভালবাসত জনিকে। অবশ্য জনির আরও অনেক কাজিন এবং তার বেশিরভাগ বন্ধুকেই ভালবাসত স্যালি। এমনকী কয়েকটা নিগারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল ওর। ওরা বলে ওর স্বামী নাকি জানত না কী ঘটছে। পরে জনি যখন যুদ্ধ করতে দূরের শহরে চলে যায় এবং ইউনিয়ন সোলজাররা এখানে আসে– স্যালি ইয়াংকি অফিসারদের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রায় গোটা ইউনিয়ন আর্মিই তার মধু পান করেছে। খ্যাক খ্যাক করে হাসতে গিয়ে শ্বাসনালীতে মদ ঢুকে বিষম খেল টড।

কিছুক্ষণ খকরখকর কেশে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নিল সে। সে যাকগে, জনির কানে যখন এসব যায় ওইসময় সে উত্তরের হাসপাতালে শয্যাশায়ী। সে ওখান থেকে পালায়, ২৫০ মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছয় এবং স্যালিকে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে গুলি করে। স্যালি গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। টড হাত নেড়ে নেড়ে দেখাল কীভাবে স্যালি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সিঁড়ির নীচে এসে চিৎ হয়ে পড়ে যায়

ও এবং অভিশাপ দেয় জনিকে। বলে জনি ইহজীবনে আর কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারবে না। তারপর সে মারা যায় এবং ওরা তাকে ওইদিনই কবর দেয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল টড। ঢক ঢক করে মদ গিলছে, কণ্ঠমণিটা ওঠানামা করছে। গ্লাস শেষ করল সে। তবে বুড়ো জনি ওসবে মোটেই পাত্তা দেয়নি এবং যুদ্ধের পরে সে বিয়ে করে। হানিমুন শেষে তারা এ বাড়িতে ফিরে আসে। নতুন মনিবনীকে স্বাগত জানাতে ভূত্যের দল দাঁড়িয়ে ছিল সার বেঁধে। জনি এবং তার বধূ বেডরুমের দিকে পা বাড়িয়েছে, সিঁড়ির মাথায় হাজির হয়ে যায় স্যালি। তাকে দেখে নতুন বউ ভয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং সে ও ভূত্যের দল তাড়া খাওয়া শেয়ালের মতো বাড়ি থেকে ছুটে পালায়। জনি তো একদম হতভম্ব এবং বিবশ –সে নিজের হাতে স্যালিকে কবর দিয়েছে– জানে স্যালি মৃত। জনি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, নড়াচড়া করতে পারছিল না। স্যালি, পরনে পাতলা নাইট গাউন, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তার স্বামীকে আলিঙ্গন করে। জনির বাটলার বব রয় বুকে সাহস এনে বাড়ি ফিরে এসেছিল কী ঘটছে দেখতে। সে বলেছে তার প্রভু নাকি ভূতটাকে বহুবার চলে যেতে বলেছে কিন্তু সে যায়নি। অবশেষে দুজনে মিলে ওপরতলায় তাদের বেডরুমে চলে যায়। ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে জনি যখন নিচে নেমে আসে ততক্ষণে সে পরিণত হয়েছে বদ্ধ উন্মাদে–কয়েক মুহূর্ত পরে আস্তাবলে ঢুকে সে আত্মহত্যা করে। গুলির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরে চাকরবাকররা শুনতে পাচ্ছিল হাসছে স্যালি। তারপর থেকে সে কুড়ি জনেরও বেশি পুরুষকে শয্যাসঙ্গী করেছে, এদের মধ্যে একজন ধর্মযাজকও ছিল। সে এখানে এসেছিল তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ নিশুপ হয়ে রইলাম। এবারে সব কথা মনে পড়ে গেছে। তখন অবশ্য ছোট ছিলাম বলেই হয়তো স্যালির নষ্টামির কেচ্ছাকাহিনি আমার কানে আসেনি। নিউ ইয়র্কে আমার বন্ধুরা এ গল্পটি খুব পছন্দ করবে, ভাবলাম আমি। এক হানাবাড়িতে এক কামুকী প্রেতিনী।

টড আমাকে লক্ষ করছিল। আমার চেহারায় অবিশ্বাস এবং মুখে মুচকি হাসি দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমিও এ গল্প বিশ্বাস করতাম না যদি না সেই ঘটনাগুলো ঘটত।

বলতে থাকো, মজা করে বললাম আমি।

সে আঙুলের কড় গুনতে লাগল। এক–স্যালিকে তারপর থেকে বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে, অতি সম্প্রতি দেখা মিলেছে বছরখানেক আগে; দুই- গত কুড়ি বছরে তুমি হলে পঞ্চম ব্যক্তি যে এই বাড়িটি কিনলে; তিন–এর আগের মালিকদের সবাই বলেছে এটি একটি ভূতুড়ে বাড়ি, একজন ছাড়া। সে কিছু বলেনি সে আত্মহত্যা করেছিল!

টড চলে যাওয়ার পরে স্কচের খালি বোতলটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালাম আমি। বুঝতে পারছিলাম সাংবাদিকটা কেন ভূতে বিশ্বাস করে।

মাসের শেষে প্ল্যানটেশন খানিকটা এস্টেটে রূপ নিতে লাগল। পিয়েরে নিউ ইয়র্ক থেকে হাজির হলো ফ্যাব্রিক স্যাম্পল নিয়ে, চেকে সাইন করার জন্য এবং তার সঙ্গী হলো আধ ডজন লোক যারা ড্যান স্পেন্সারের নির্বুদ্ধিতার গল্প শুনেছে।

সেই রাতে ওদের আমি হোটেলের ডাইনিংরুমে অ্যাপায়িত করলাম, কফি খেতে খেতে বললাম স্যালির গল্প। সবাই গল্প শুনে খুশি। জানি আগামী সপ্তাহে এ গল্প নিয়ে নিউ ইয়র্কের পার্টিগুলোয় অনেক হাসাহাসি চলবে। আর্ল উইলসন এবং উইঞ্চলের কলামেও যে এ গপপো স্থান পাবে তা আর বিচিত্র কী!

গৃহসজ্জার কাজ চমৎকার এগোচ্ছিল এবং সপ্তাহখানেক পরেই ওই বাড়িতে উঠে গেলাম আমি।

নতুন বাড়িতে প্রথম রাতে স্টাডিরুমে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আমার এজেন্টের পাঠানো একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলাচ্ছিলাম। সন্তুষ্টি এবং শান্তি ঘিরে ছিল আমাকে। নিজেকে সুখি মনে হচ্ছিল।

বাইরে গাছের ডালে বাতাসের ফিসফিস ভেসে আসছিল, অলস জিভ বের করে অগ্নিশিখা কীভাবে লাকড়িগুলোকে চেটে দিচ্ছে দেখছিলাম মাঝে মাঝে এবং ভাবছিলাম কেন বাড়িঘর নিয়ে এত এত পদ্য লেখা হয়েছে।

জীবনে এই প্রথমবার বাড়িতে আছি আমি!

এরপরে বিছানায় গেলাম। মস্ত খাটে শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আলো চোখে পড়তে জেগে গেলাম আমি। এক মুহূর্ত সময় লাগল ঠাহর হতে কোথায় আছি। তারপর আমি তাকে দেখতে পেলাম এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। তার টসটসে ওষ্ঠদ্বয় ভেজাভেজা, পিঠে চুল নয় যেন স্ট্রবেরী রঙের জলপ্রপাত, ঝকঝকে সবুজ চোখ, আশ্চর্য ভরাট দুই বক্ষ সগৌরবে নিজেদের তেজ এবং যৌবন ঘোষণা করছে।

মহিলাটির পরনের নেগলিজি খুবই পাতলা। রুদ্ধশ্বাস দেহবল্লরীর মাথা নষ্ট করা প্রতিটি খাঁজভাজ তাতে দারুণভাবে প্রস্ফুটিত।

আমি উঠে বসলাম, নিতান্তই আহাম্মকের মতো প্রশ্ন করলাম। কে.. এখানে কী করছ? ঠিক এভাবে বলিনি তবে হঠাৎ শুকিয়ে আসা গলা দিয়ে চিচিঁ করে এরকম কোনও কথাই বোধকরি বেরিয়ে এসেছিল।

মোমের আলো প্রতিফলিত ঠোঁট ফাঁক করে দারুণ আবেদনভরা খসখসে গলায় সে বলল, তুমি ড্যান স্পেন্সর, পরিচালক- তাই না?

তখনই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেল। পেশীতে ঢিল পড়ল আমার, মুখে হাসি ফোঁটানোর চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটি এখন বুঝতে পেরেছি। যদিও প্রথম দর্শনে ভয়ের চোটে ভেবেছিলাম ওটা বুঝি স্যালি। এখন সব খাপে খাপে বসে গেছে। মেয়েটা আমার নাম জানে; সন্দেহ নেই নিউ ইয়র্কের ওই দলটাই একে পাঠিয়েছে ফাজলামি করে।

তোমাকে কে পাঠিয়েছে, হানি, অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম আমি, সেলোফোনের মতো পোশাকটির ওপর থেকে আমার দৃষ্টি সরছেই না।

আমার প্রশ্ন শুনে যেন মেয়েটি থতমত খেয়ে গেল –সরল বিস্ময় ফুটল চোখে, আপত্তির সুরে বলল, কে পাঠিয়েছে মানে? আমি নিজেই এলাম।

উচ্চারণেও কোনও খামতি নেই। হয় সে খুব ভাল কোনও অভিনেত্রী, যদিও এতে সন্দেহ আছে কারণ একে আমি আগে কখনও দেখিনি; অথবা স্থানীয় কেউ যার স্বপ্ন পাদপ্রদীপের আলোয় আসা এবং এজন্য যোগাযোগের দ্রুততম রাস্তাটিই সে বেছে নিয়েছে।

আমি ওকে দেখতে দেখতে এসব কথাই ভাবছিলাম। ওর দেহ, রূপ, কণ্ঠ... অভিনয়ে সুযোগ পাবার জন্য একে পরিচালকের অংকশায়িনী না হলেও চলে; আমি কোনকিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই ওর জন্য সপ্তাহের একটি দিন ব্যয় করতে রাজি!

অবশেষে আমি আবার কথা বললাম তবে তাতে আবেগের স্পর্শ থাকল না। তুমি ভুল করছ। আমার নাম স্পেন্সার সে ঠিক আছে এবং আমি একজন পরিচালকই বটে, তবে তোমাকে আমি তো চিনলাম না, মিস.. মিস?

আরি, এক উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী যখন হাঁপাতে শুরু করে তখন আপনি তো বিনয়ের অবতার হয়েই উঠবেন, নাকি?

...লোল্যান্ড– মিস লোল্যান্ড! আমার এটাই নাম! চাদরের নিচে আমার দেহরেখার ওপর তার চোখ ঘুরছে। সে হাসল, তারপর ঝুঁকে এল সামনে এবং ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মোমবাতি। প্রথমে আঁধার গ্রাস করল কামরা তারপর আমার গায়ের ওপর থেকে টান মেরে সরিয়ে ফেলা হলো চাদর এবং মৃদু দুলে উঠল খাট। মেয়েটি আমার পাশে চলে এসেছে- উষ্ণ এবং বাস্তব, মোটেই ভূত-প্রেত কিছু নয়।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি চলে গেছে মিস লোল্যান্ড। কাল রাতে কী ঘটেছিল বিস্তারিত মনে নেই তবে এটুকু স্মরণে আছে সারা রাত আমি যেন খাঁচাবন্ধ কতগুলো নখ ও দাঁতঅলা বাঘিনীর সঙ্গে কুস্তি লড়েছি।

আর সে অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

পরের দিন সন্ধ্যায় তার দেখা মিলল না। আমি বড়ই হতাশ হলাম। কয়েকদিন তার বিরহে নিঘুম রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পরে ঠিক করলাম ওর ব্যাপারে কিছু খোঁজ খবর নেব। জানার চেষ্টা করব কোথায় থাকে সে।

উঠোনে যারা কাজ করে তারা আমার প্রশ্ন শুনে মাথা চুলকাল, পিচিক করে থুতু ফেলল, তাদের বিমূঢ় দেখাল এবং বলল বেটসভিলে তারা ওই নামের কোনও মহিলাকে চেনে না। বাড়ির ভৃত্যরা কোনও সাহায্য করতে পারল না।

সুখের স্বপ্ন হয়ে পঞ্চম রাতে ফিরে এল মিস লোল্যান্ড –ধীরে দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তখন বিছানায় বসে বই পড়ছি।

তুমি আমার খোঁজ করছিলে? প্লেটে গরম দুধ পেয়ে তৃপ্ত বেড়ালের মতো গরগর করল সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। মেয়েটি তার গুরু নিতম্বে হাত রেখে মাথাটি একদিকে কাত করে প্রশ্ন করল, আমার মত অচেনা-অজানা একটি মেয়ের কেন তুমি খোঁজ করছিলে? উমম?

বললাম আমি তাকে।

হাসল সে, তারপর ঝট করে খুলে ফেলল পরনের গাউন, নিভিয়ে দিল বাতি এবং ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে ওঠার আগেই এক লাফে চলে এল আমার পাশে।

তারপর দুজনে মিলে বিছানায় তুললাম তাণ্ডব।

আমার দর্শনার্থী পরের রাতে এল, তার পরের রাতে এবং তার পরের রাতেও। তার সঙ্গে প্রতিটি মিনিট আমি উপভোগ করছিলাম।

এভাবে বারোটি রাত কাবার হয়ে গেল অথচ আমি মেয়েটি সম্পর্কে এখনও কিছু জানি না। তবে যতবারই আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেছি প্রতিবারই সে দক্ষিণী টানে টেনে টেনে বলেছে, আমার সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ নয়, হানি।

তারপর হুট করেই একদিন উধাও হয়ে গেল মিস লোল্যান্ড। আমি আবার ওর সম্পর্কে নানাজনকে নানান প্রশ্ন করে বেড়াতে লাগলাম এবং আগের বারের মতোই কোনও তথ্য মিলল না। মেয়েটিকে আমার বিভিন্ন কারণে সন্ধান পাবার দরকার ছিল, এবং তার সবগুলোই শারীরিক। তার অনুপস্থিতিতে আমার দুচোখ থেকে বিদায় নিল ঘুম এবং আশ্চর্যের ব্যাপার আমি খুব একাকী বোধ করছিলাম।

তবে বাড়ির নির্জনতার অবসান ঘটল যখন পিয়েরে এবং তার তিনজন হেল্পার দুটো ভ্যানে চাপিয়ে দরজা জানালার পর্দা, নতুন আসবাব, পেইন্টিং, কার্পেটসহ ঘর সাজানোর

আরও টুকিটাকি গৃহস্থালী সামগ্রী নিয়ে এল। ফরাসী মানুষটি নিজের কাজটি ভালোই বোঝে। সে গোটা বাড়িতে চক্কর দিতে লাগল, শ্রমিকদের হুকুম করছে, হেল্পারদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, যেন এক সার্জেন্ট।

এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ির ভোল বদলে গেল। এক বৃহস্পতিবার তার সহকারীদের বিদায় করল পিয়েরে ।

আর সেই রাতে মেয়েটি এল–সেই দম বন্ধ করা রূপ নিয়ে, তার চোখে কী এক আলো ঝকমক করছিল, সঙ্গে সাত দিনের জমানো তীব্র কামনা।

তোমার কিউট চেহারার বন্ধুটি কে? কোনও ভূমিকা ছাড়াই জানতে চাইল সে।

কোন্ বন্ধু?

বড় বড় বাদামী চোখের ছোটখাট মানুষটি, মুচকি হাসল সে, ঠোঁটে জিভ বুলাচ্ছে।

ওকে একা থাকতে দাও, বেবি। তুমি তো আমাকে পেয়েছ, বললাম আমি।

ঠোঁট ফোলাল ও। জানি আমি তোমাকে পেয়েছি। তার চক্ষু সরু হয়ে এল। কিন্তু সে নিজেকে ধরা দিতে চায় না। আমি এরকমটাই পছন্দ করি... আর তুমি তুমি বড্ড অধীর।

আমি অধীর, বিস্ফোরিত হলাম আমি। মাই গড, উওম্যান, আমার পিঠের নখের খামচিগুলো কি আমি নিজে দিয়েছি!

মেয়েটিকে যেন এক মুহূর্তের জন্য উদ্বিগ্ন দেখাল তারপর ঘুরে এল আমার পেছনে ভালবাসার ক্ষত দেখার জন্য। পুওর বেবি, কুঁইকুঁই করল সে, চুমু খেল দাগগুলোর ওপর। তারপর জোরে কামড় বসিয়ে দিল।

সেই রাতে সে চলে যাওয়ার আগে তাকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে বোস্টনে যেতে। ওখানে আমার নতুন নাটকের উদ্বোধনী হবে। লাল চুলের মাথাটি নেড়ে সে দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, ওহ নো, আমি যেতে পারব না।

কেন পারবে না? গোঁ ধরলাম আমি।

আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, কাঁদতে শুরু করল ও। প্লিজ তুমি যেয়ো না। আমি জানি না পুরুষ মানুষ ছাড়া আমি কীভাবে চলব... মানে তুমি পাশে না থাকলে...

বিছানায় উঠে বসল ও, প্রবল আকুলতা নিয়ে তাকাল আমার দিকে। বলো তুমি আমাকে ভালবাস। বলো তুমি আমাকে সবসময় ভালবাসবে। প্লিজ.... ড্যান। মন থেকে বলার দরকার নেই, মুখে বলো।

জানালার শাটার দিয়ে ভেসে আসা চাঁদের আলোয় তার চোখের জল চিকচিক করছে। মেয়েটি আক্ষরিক অর্থেই সুন্দরী –এমন রূপবতী আমি জীবনে দেখিনি। আমি চুম্বনে চুম্বনে ওর অশ্রু পান করতে করতে বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি... আমি তোমাকে ভালবাসি... ভালবাসব সবসময়।

কিছুক্ষণ পরে শিহরিত সুখ নিয়ে ও শয্যা ত্যাগ করল।

আমি এখন যাব। বোস্টনে গিয়ে নিজের প্রতি যত্ন নিও। আর আমার কাছে ফিরে এসো। প্লিজ... আমি জীবনেও কাউকে এতটা ভালবাসিনি, ড্যান। বিশ্বাস করো– এর আগে আমি এমন করে কারও প্রেমে পড়িনি।

ওর পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আই লাভ য়ু, ফিসফিস করে বললাম আমি। এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এক সেকেন্ডের জন্য কথাটি আমি বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম।

পরদিন সকালে পিয়েরে ডাইনিংরুমে ঢুকল যুঁসতে ফুঁসতে যেন রোয়া তোলা মোরগ।

আমি ওকে গুড মর্নিং বলতে যাচ্ছিলাম, সে বাধা দিয়ে ঢেঁকিয়ে উঠল, অলরাইট, ড্যান। ঠাট্টা ঠাট্টাই কিন্তু তুমি বড় বেশি মশকরা করে ফেলেছ। মেয়েটা কে?

বেকুব বনে গেলাম আমি শুধু বিড়বিড় করে বললাম, কোন্ মেয়ে? সাধু সেজো না! যে মেয়েটাকে.. যে মেয়েটাকে আজ সকালে তুমি আমার বিছানায় পাঠিয়েছ।

পিয়েরে সিরিয়াস এবং খাপচুরিয়াস মানে ক্ষেপে বোম হয়ে আছে। মেয়েটা! ও নিশ্চয় রাতের বেশিরভাগ সময় আমার সঙ্গে কাটিয়ে তারপর পিয়েরের ঘরে যায়নি। এ অসম্ভব! মেয়েটার বর্ণনা দাও তো শুনি, বললাম আমি।

চেপে রাখা রাগে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটির বর্ণনা দিল পিয়েরে... সেই একই নারী।

কী ঘটেছে? প্রশ্নটি আমাকে করতেই হলো যদিও এর জবাব আমি চাই না।

কী ঘটবে? কিছুই ঘটেনি। তোমার কি ধারণা একটা মেয়ে হুট করে আমার বিছানায় উঠে এল আর আমি তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করব? আমি কিছু নীতি মেনে চলি! আমার নৈতিকতা আছে! ওটা তো একটা বেবুশ্যে! সাহস কত বলে কিনা আমি কেন ওর কাছে ধরা দিচ্ছি না!

তাহলে ব্যাপার এই! আমাকে দিয়ে ওর মনের আশ পুরোপুরি মেটেনি তাই গিয়েছিল পিয়েরের কাছে।

আমি দুঃখিত, পিয়েরে । আন্তরিক দুঃখিত। তবে সত্যি জানি না মেয়েটা কে। জানার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কেউ ওর পরিচয় বলতে পারল না।

পিয়েরে বুঝল আমি সিরিয়াস। সে এখনও রেগে থাকলেও আমাকে আর ঝাড়ি দিল না। কিছু মহিলা হলো জন্তুর মতো-কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, ঘোঁতঘোঁত করল ও। এদের শরীর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা, সপ্তাহের সাতদিনই গরম হয়ে থাকে।

পিয়েরে শান্ত হলে বললাম আজ রাতেই আমি বোস্টনের উদ্দেশে যাত্রা করছি, ও আমার সঙ্গে যাবে কিনা।

না, ইস্ট উইংয়ের কাজ এখনও শেষ করে উঠতে পারিনি। কালকের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে চাই। ভালো কথা ইস্ট বিউটিফুলের ক্লারা কেনেট আসছে একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে। সে তোমার এবং এ বাড়ির লে আউটের জন্য কিছু ছবি তুলবে। কাজেই যত জলদি পারো ফিরে এসো।

বললাম পরদিনই আমি ফিরে আসছি। বেটসভিল শহর ধরে গাড়ি চালাতে গিয়ে ঠিক করলাম একবার খবরের কাগজের অফিসে থামব। দেখি টড মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানে কিনা।

নাহ, ধীরে ধীরে বলল টড, তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে, লোল্যান্ড নামে কোনও মেয়ে এ তল্লাটে নেই। সন্দেহের সুর ফুটল কণ্ঠে। তুমি জানতে চাইছ কেন? জরুরি কিছু?

আমি একটু চিন্তা করে দেখলাম ওকে এ মুহূর্তে আর কিছু বলা ঠিক হবে না।

না? সে অনিসন্ধিৎসু টেরিয়ারের মতো একদিকে কাত করল মাথা। বেশ তো। তবু আমি একবার খোঁজ নিয়ে দেখব। তুমি বোস্টন থেকে ফিরে এলে জানাব।

বোস্টনে যাওয়াটাই ছিল ভুল– এমন ভুল জীবনে করিনি। নাটক হলো ফ্লপ– এমনই ঢিলা গল্প যে প্রথমবার পর্দা পড়ার আগেই অর্ধেক দর্শক চলে গেল। আর আবহাওয়াটাও ছিল বিশ্রী হোটেল রুমটা ভয়ানক গরম এবং মড়ার ওপর খাড়ার ঘার মতো ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্ত হলাম আমি।

বেটসভিলে যখন ফিরে এলাম, শহরের আকাশ কালো মেঘে থমথম করছে, ঝড়ের পূর্বাভাস। সোজা গেলাম সংবাদপত্রের অফিসে। আমাকে ঢুকতে দেখে উত্তেজনায়

লাফিয়ে উঠল টড, ধাক্কা লেগে একটা চেয়ার পড়ে গেল । ড্যান, চেঁচাল সে। একটা খবর পেয়েছি। সে মদ খাচ্ছিল।

গুড, বললাম আমি।

শোনো- ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এই মেয়েটাকে কোথায় দেখেছ?

সেটা বলা ঠিক হবে না, টড।

আমার দিকে আড়চোখে তাকাল টড। বললে বলবে না বললে নাই। ডেস্ক ড্রয়ারে হাত বাড়িয়ে একটি ছবি বের করল। বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, উত্তেজনায় কাঁপছে হাত, এই মেয়েটা? প্রায় আবছা গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

হ্যাঁ, সেই মেয়েটাই... তবে ছবিতে তার পরনে নাটকের সাজসজ্জা! আমি ভালো করে তাকালাম; আরি, একে দেখতে লাগছে যেন স্কারলেট ওহারার ভূমিকায় অভিনয় করছে।

আমার দিকে এক নজর তাকিয়েই তার জবাব পেয়ে গেল টড। সে একটু নেচে নিল, প্রথমে এক পায়ে, তারপর অন্য পায়ে লাফাতে লাফাতে বলল, জানতাম... আমি জানতাম! ওই বাড়িতে ও এসেছিল, তাই না! মাথায় লাল চুল এবং ফিগারটা এরকম... শূন্যে হাতের ভঙ্গিমায় সে খাজভাঁজগুলোর আকার দেখাল।

আমি ধপাশ করে বসে পড়লাম চেয়ারে, সামনে কী আসছে ভাবতে গিয়ে হিম হয়ে গেল বুক। ঠিক আছে, টড। তুমি কী জানো, বলো?

এ সেই-স্যালি! তার বাবার পদবি ছিল লোল্যান্ড। স্যালি লোল্যান্ড। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। তুমি ওকে দেখেছ! সে হাসতে হাসতে চড় মারল নিজের পায়ে। তুমি এখন নিশ্চয় বিশ্বাস করবে যে ভূত আছে, আমার গম্ভীর মুখ দেখে থেমে গেল তার হাসি। বলল, আমি দুঃখিত, ড্যান। তোমাকে নিয়ে আমি আমি মজা করতে চাইনি। আমি কোনও কথা না বলে চলে আসছি, তখনও সে বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চলছে।

নীলচে কালো মেঘ স্তূপ হয়ে আছে গোটা দিগন্ত জুড়ে, আকাশে কীসের যেন অশুভ সংকেত। যখন আমি বাড়ি পৌঁছেছি ততক্ষণে নদীর দিক থেকে গুড়গুড় মেঘের ডাক ভেসে আসতে শুরু করেছে। পিয়েরেকে কাছে পিঠে কোথাও দেখতে পেলাম না। দোতলায় উঠে এলাম আমি। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শেষ করেছি মাত্র, হাউহাউ করে হামলে পড়ল ঝড়।

শাটারের ভেতর থেকে গোঙাতে লাগল বাতাস, অঝোর ধারায় শুরু হয়ে গেছে বর্ষণ, বুনো জন্তুর মতো ছাদের ওপর যেন আঁচড়াতে, খামচাতে লাগল। দপদপ করে উঠল বাতিগুলো, নিভু নিভু হয়ে এল, তারপর আবার জ্বলে উঠল পূর্ণশক্তিতে। বাইরে কান

ফাটানো শব্দে বাজ পড়ছে... আমি যেন হঠাৎ করেই একটা গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গিয়েছি।

কী করব মাথায় আসছিল না তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম এ বাড়ি থেকে এখুনি পালাতে হবে। তারপরের করণীয় সম্পর্কে পরে চিন্তা করা যাবে। চাকরগুলো কাজ শেষে চলে যাওয়ার আগে স্টাডিরুমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে বসলাম। ভাবছি কী করা যায়। আমার মাথাটা কেন জানি কাজ করছিল না, ভোঁতা লাগছিল সবকিছু। এমনসময় পিয়েরের গোঙানি শুনতে পেলাম।

দৌড় দিলাম সিঁড়িতে। ফার্স্ট ল্যান্ডিংয়ে আধখাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে। আছে পিয়েরে, রক্তশূন্য মুখ, একেবারেই বিধ্বস্ত চেহারা। পাগলা বাছুরের মত বনবন করে ঘুরছে চোখের মণি। ড্যান, গলা নয় যেন ব্যাঙের ডাক। ভেঙ্গে গেছে স্বর। এক কদম এগোল আমার দিকে, মিস করল সিঁড়ি এবং গড়াতে গড়াতে নেমে এল নিচে।

পিয়েরে, মাই গড, কী হলো তোমার?

মেয়েটা.. ওই মেয়েটা, শিউরে উঠল ও, শরীর এমনভাবে কাঁপছে যেন হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের তার স্পর্শ করেছে।

সিধে হওয়ার চেষ্টা করল ছোটখাট ফরাসি মানুষটা। আমার ট্রাউজার্স খামচে ধরল। ওকে দূর করো। ও যেন আর আমার কাছে আসতে না পারে। ফোঁপাতে লাগল সে।

ওকে ধরে একটা ঝাঁকি দিলাম যাতে হুঁশ ফিরে আসে।

আসল কথায় এসো। কী হয়েছে?

ও... ও গত রাতে আমার বিছানায় এসেছিল... তারপর সারারাত ধরে... ও, হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চোখ ঘোরাল পিয়েরে। আমি অত বলবান পুরুষ নই, ড্যান। ও আমাকে মেরে ফেলবে! আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো, প্লিজ!

আমি ওকে টেনে তুললাম। ঠিক আছে, চলো যাই। তোমার ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নাও।

ওর আতংকটা ফিরে এল। না, না। ব্যাগ গোছাতে হবে না। এখুনি চলল। ও ওখানে।

ওর ভয় সংক্রামক। আমিও যেন স্যালির উপস্থিতি অনুভব করছিলাম; আর কোনও উষ্ণ অনুভূতি নয়, ভীতিকর কিছু একটা, যেন খুলে দেয়া হয়েছে নরকের দুয়ার এবং ওখানকার বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে।

আবার তেজ হারাতে লাগল বাতিগুলো–ত্রিশ সেকেন্ড স্তিমিত হয়ে রইল– তারপর ধীরে ধীরে নিভে গেল। আলো বলতে শুধু ফায়ারপ্লেসের আগুনের আভা।

ড্যান, ভয়ে চিৎকার দিল পিয়েরে। ও আসছে!

ঠিক আছে ঠিক আছে! ওকে কম্পিত গলায় সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। আমি ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে গাড়িতে যাচ্ছি।

কিন্তু পিয়েরে আমার সঙ্গে সেঁটে রইল। বজ্রের আলোয় দেখলাম লন ভেসে যাচ্ছে জলাতে। মুহূর্তেই দুজনে কাকভেজা। হঠাৎ বাড়ির পাশের ম্যাগনোলিয়া গাছের ওপর তীব্র আলোর একটা ঝলকানি ছুটে এসে ঝলসে দিল আমার চোখ। আঁধারে তখনও সয়ে ওঠেনি চাউনি, পলকে গাছটা বিকট শব্দে হুড়মুড় করে পড়ে গেল আমার গাড়ির ওপর, কয়েক ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেলাম দুজনেই।

অবিশ্বাস্য ভয়ের একটা অনুভূতি আমাকে গ্রাস করল। আমি বড় শহরে বাস করে অভ্যস্ত –সেখানে ভূত-প্রেতের কোনও জায়গা নেই। কিন্তু স্যালি নামের প্রেতিনীর সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে। এখন আর আমার কোনই সন্দেহ নেই যে ও-ই একটু আগে বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমার মন আমাকে সাবধান করে দিল যদি আমরা লন পার হওয়ার চেষ্টা করি অশুভ শক্তিটা আবার বাধা দেবে হয়তো আগেরবারের চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে।

পর্চে দাঁড়িয়ে আমার বাড়িটিকে চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখে অসুস্থবোধ করতে লাগলাম আমি। লন, ফুলগাছ, ঝোঁপঝাড় কিছুই আস্ত রইল না। ভয়ানক বৃষ্টি আর শিলা পড়ে সবকিছু একেবারে তছনছ হয়ে গেল। কাঁচ ভাঙার তীব্র ঝনঝন জানিয়ে দিল আমার নতুন গ্রীন হাউসটিকেও শেষ করেছে স্যালি।

আমি এক ছুটে বাড়িতে ঢুকলাম; গোঙাতে গোঙাতে পিয়েরে আমার পিছু নিল। একা থাকতে ভয় করছে ওর। আমাদের পেছনে এত জোরে বন্ধ হয়ে গেল দরজা যে সেই শব্দে লাফিয়ে উঠল কলজে।

বাতাসে স্যালির শরীরে গন্ধ, ঝড়ের তাণ্ডব ছাড়িয়ে তার যৌনাবেগ যেন দপদপ করছিল। ভয় এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে আমি সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে গলা বাড়িয়ে ডাক দিলাম, স্যালি! স্যালি লোল্যান্ড, কোথায় তুমি?

জবাবে শুধু জানালার গায়ে আছড়ে পড়া বাতাসের হুংকার আর শাটারের কাঁচকোচ আওয়াজ শোনা গেল।

আবারও ডাকলাম আমি। কাজটা এমন নির্বোধের মতো এবং মেলোড্রামাটিক মনে হচ্ছিল যে নিজেকে স্রেফ একটা গবেট লাগছিল। তবে আমার ভয়ে প্রায় অসার হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের একটি অংশ জানত স্যালি আমার কথা শুনছে... কোথাও বসে। আমি ওক কাঠের প্রকাণ্ড দরজাটির দিকে ঘুরলাম। মনে হলো চাপা গলায় যেন হেসে উঠল

ও। বাতাসে ভেসে আসা জলের ছাঁট লেগে পুরানো কাঠ খানিকটা ফুলে উঠেছে তবে কপাট খুলবে না- সে আমরা যতই ঠেলাঠেলি কিংবা টানাটানি করি না কেন। অবশ্য চেষ্টা করার আগেই বুঝে গেছি স্যালি আমাদের পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে রেখেছে।

আমি সিঁড়ি গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। স্যালি, আমাদের যেতে দাও... প্লিজ, আমাদের ছেড়ে দাও।

আবার ভেসে এল ভৌতিক চাপা হাসি– তবে এবারে আগের চেয়ে জোরে। সেই হাসি যেন আতঙ্কের বিরাট একটা হাত হয়ে আমার নাড়িভুঁড়ি চেপে ধরল।

পিয়েরে অসহায়ের মতো সিঁড়ি গোড়ায় পড়ে গেল। সে ভয়ানক কাঁপছে। ভয়ে বারবার মুঠো খুলছে এবং বন্ধ করছে।

স্যালি, হাঁক ছাড়লাম আমি। আমার কথা শোনো... প্লিজ। প্রথমে কিছু শোনা গেল না, তারপর ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে আমি শুনতে পেলাম ওটা।

গুণগুণ করছে কেউ অমানুষিক এবং প্রচণ্ড ভীতিকর একটা গুণগুণানি যেন একটা ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা তার দুর্ভাগা সঙ্গীকে নিজের জালে আটকে ফেলে তাকে গলাধঃকরণ করতে যাচ্ছে।

এখন একটাই মাত্র কাজ আছে করার।

আমি পিয়েরেকে মেঝেতে ফেলে রেখে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

গুণগুণানির সুরটা বদলে গেল... যে গাইছে সে যেন একটু অবাকই হয়েছে। ভয়ে আমার কলজে উড়ে গেছে। কিন্তু স্যালির সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে ওরই নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্রে।

মাস্টার বেডরুমে ঢুকে আমি শুয়ে পড়লাম। বাইরে ম্যানিয়াকের মতো দাপাদাপি করছে ঝড়, বাড়ির অপরপাশের ম্যাগনেলিয়া গাছটি এবারে ধরাশায়ী হলো ওয়েস্ট উইং এবং গোটা কিচেনসহ।

আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, একপাশে হেলানো মাথা, বিস্মিত।

হ্যালো, স্যালি লোল্যান্ড, আমি উচ্চস্বরে ডাকলাম ওকে।

এক সেকেন্ডের জন্য ঝিকিয়ে উঠল সবুজ চোখ, তারপর সরু হয়ে এলো। সে বিস্ময় এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি ভয় পাওনি?

আমি ডানে বামে মাথা নাড়লাম, তার পাতলা নেগলিজির ওপর আঠা হয়ে লেগে আছে দৃষ্টি। আতঙ্ক সত্ত্বেও আমার ভেতরে জেগে উঠতে লাগল কামনা। আমি বিছানা থেকে নেমে ওর দিকে এক কদম বাড়ালাম। বাইরে চিৎকার দিল বাতাস, ছাদের ওপর কী যেন পড়ল দুম করে, এতই জোরে যে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল।

স্যালি এক হাত তুলে ইশারা করল আমাকে থামতে। ড্যান, ওর গলার স্বরে এমন অনিশ্চয়তার সুর আগে কখনও শুনিনি। তুমি এখানে কেন এসেছ?

তোমার কী মনে হয়?

বলো আমাকে, গর্জন করল স্যালি।

কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

আঘাত পাওয়া, হতভম্ব ছোট্ট মেয়েটির মতো স্যালি বলল, আমাকে কেউ কোনদিন ভালবাসেনি... শুধু আমার শরীরটাকে ভালবেসেছে! তুমিও তাদের থেকে আলাদা নও... অন্তত আমি তা মনে করি না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, স্যালি। আমি তোমার সব কথাই জানি... গত একশ বছরে কারা তোমার প্রেমিক ছিল তাদের কথা। যদিও তুমি মৃত। কিন্তু আমার কাছে তুমি যে

কোনও নারীর চেয়েও বেশি জীবিত। আমি সবকথাই জানি আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি। হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি যা বলছি তা সত্যি এবং আমার এ উপলব্ধি হয়তো প্রকাশও পেল আমার গলার স্বরে।

স্যালি আমার চোখে গভীরভাবে তাকাল, তার চাউনি যেন ভেদ করে গেল আমার হৃদপিণ্ড, তারপর সে ঠোঁট কামড়ে ধরে পিটপিট করল চোখ অশ্রু ঠেকাতে।

আমাকে কেউ কোনদিন কখনও ভালবাসেনি, ড্যান।

আমি ওকে আমার বুকে নিতে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে চট করে একপাশে সরে গিয়ে আমাকে ধাক্কা মারল। দাঁড়াও, প্লিজ... আমাকে একটু ভাবতে দাও।

আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। নরম এবং গরম। ও গুঙিয়ে উঠল। না... এখন না।

তারপর হাসল স্যালি, সিরিয়াস গলায় বলল, চলো, নিচে যাই, ড্যান।

আমরা হাত ধরাধরি করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে, পিয়েরে যেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, সেখানে চলে এলাম।

তুমি এ বেচারাকে ভয়ে আধমরা করে ফেলেছ, জোর করে মুখে হাসি ফোঁটালাম আমি। আমি তোমাকে যেভাবে সামাল দিতে পারি ও তা পারে না।

তুমি সবসময়ই বড় অধীর আর ব্যাকুল, ড্যান । কিন্তু ও আমার কাছে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। সবসময় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা। অন্যমনস্কভাবে বলল স্যালি, ফিরিয়ে দিল না আমার হাসি। বাড়ির পেছন দিকটায় ফিরল। ওখানে মাতামাতি করছে ঝড়। স্যালি যখন কথা বলল, গলার স্বর খসখসে। শোনাল, আরেকবার বলো আমার জন্য তুমি কতটা ফিল কর, ড্যান।

আমি তোমাকে ভালবাসি, স্যালি। ভালবাসব সবসময়। একদম সত্যি কথা!

স্যালি আবার পিটপিট করল চোখ, তারপর যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, এমন ভঙ্গিতে হাঁটা দিল সদর দরজায়। এদিকে এসো, আদেশ করল ও। আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। খোলো এটা।

অবাক আমি তবু ওর হুকুম পালন করলাম। দরজাটি সহজেই খুলে গেল। শটগানের গুলির মত বৃষ্টির ধারাল ফোঁটাগুলো আঘাত হানল আমার মুখে, ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলছিলাম। বাইরের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে নজর বুলালাম। খুবই ভয়াবহ অবস্থা। স্যালির গলার স্বর ভেসে এল পেছন থেকে, আশ্চর্য করুণ এবং একাকি, বিদায়, ড্যান। তারপরই দরজা বন্ধ করে দিল সে।

স্যালি, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও, চেঁচালাম আমি।

জবাবে আর্তনাদ ছাড়ল বাতাস।

স্যালি, পিয়েরের কী হবে?

পাগলের মত এক দৌড়ে বাড়ির পেছনে চলে এলাম, ভেতরে ঢুকবার রাস্তা খুঁজছি। কোনও লাভ নেই। এ বাড়ি ফোর্ট নক্সের চেয়েও দুর্ভেদ্য। ঢোকার কিছু উপায় নেই।

আবছা মনে পড়ে জলকাদা, মাটিতে পড়ে থাকা গাছপালা, বেড়া ইত্যাদির মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে অবশেষে হাইওয়েতে উঠে পড়ি আমি। তখন প্রায় মাঝরাত। হোঁচট খেতে খেতে রওনা হই বেটসভিলের দিকে।

টডকে ওর অফিসেই পেয়ে গেলাম; সে অপ্রত্যাশিত হারিকেন ঝড় নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বিস্তারিত একটি লেখা লিখবে ঠিক করেছিল। আমি বললাম আমার এক বন্ধু সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে। ওকে একা সরিয়ে নিতে ভয় পাচ্ছি পাছে ইন্টারনাল কোনও ইনজুরি হয়। টড অবশ্য আমার চোখমুখ দেখেই বুঝে ফেলেছিল আমি মিথ্যা বলছি। আমার মিথ্যাচারিতার সঙ্গে ভৌতিক কোনও বিষয় জড়িত।

টড, একজন ডেপুটি শেরিফ এবং একজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্টকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম মরগান ম্যানসনে। চার মাইল রাস্তা পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল।

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে টড ফিসফিস করে বলল, মাই গড! আমার মুখে তখন কোনও রা নেই। বাড়িটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পাঁচশ বছর ধরে এর গায়ে কোনও রঙের প্রলেপ পড়েনি। প্রলয়ংকরী বাতাসে জানালা ভেঙে কজার সঙ্গে ঝুলে আছে, বাড়ির পশ্চিম অংশের ছাদ পুরোটাই ধসে গেছে, যেখানে লন আর বাগান ছিল সেখানে এক পুকুর কাদাজল থই থই... আর সদর দরজাটা ভেঙে বাতাসের বাড়িতে ডানে-বামে শুধু মুখ নাড়ছে।

পিয়েরের কোনও চিহ্নই নেই... তখনও পেলাম না, পরেও নয়।

ডেপুটি এবং করোনার বলল তাদের ধারণা পিয়েরে ঝড়ো বাতাসে বেরিয়ে পড়েছিল এবং দুর্ঘটনাবশতঃ ডুবে মরেছে।

কিন্তু আমার ধারণা আসল সত্যটি আমি জানি আসলে কী হয়েছে পিয়েরের সম্ভবতঃ টডও কিছু সন্দেহ করেছে তবে সে মুখ বুজে রইল।

আমি একটা প্রবাদে খুব বিশ্বাস করি কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। আমি স্যালির ওই ছোট্ট সেক্সি স্বর্গে সুখেই থাকতে পারতাম।

ও ছিল দারুণ কামুকী এক নারী –একটু হিংস্র তবে চমৎকার –ওর চাহিদাও ছিল প্রচুর। তবে আমার চাহিদা ছিল আরও বেশি।

বিকৃত কিছু কারণে ও হয়তো আমার প্রেমেও পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্যালি তার কামনার নেশা মেটাতে পিয়েরেকে ধরে নিয়ে গেছে ভূত প্রেতদের প্রেতলোকে যেখান থেকে বেচারা কোনদিন ফিরে আসতে পারবে না। ওখানে সে থাকবে ভূতপেত্নীদের খেলার সঙ্গী হয়ে।

ব্যাপারটি আমার কাছে মস্ত একটা ঠাট্টার মতো লাগছে। ঠাট্টাটির কথা মনে হলেই আমি হাসতে শুরু করি, উন্মাদের মতো হাসতেই থাকি কেবল সে হাসি আর থামে না। ও আমাকে... নিজেকে এবং পিয়েরেকে নিয়ে দারুণ একটি ঠাট্টা করেছে।

স্যালি-উষ্ণ, যৌনাবেদনময়ী স্যালি চেয়েছিল কেউ তার সঙ্গে প্রেম করবে... সবসময়! তাই সে দুর্ভাগা পিয়েরেকে বাছাই করেছে। দেখুন, আবারও আমি হাসতে লেগেছি!

স্যালি ভেবেছে পিয়েরে তার খেলার পুতুল হবে কিন্তু ছোট ফরাসী মানুষটিকে সে কিছুতেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারছিল না। সেজন্যই শোধ নিতে হয়তো...

আর স্যালির সবসময়ের ভালবাসার খিদে মেটাতে গিয়ে পিয়েরে বেচারার যে কী দশা হবে তা-ই ভাবছি এখন! এবং কেবলই হাসি পেয়ে যাচ্ছে।

–অ্যাডোবি জেমস

ফাঁসি

এক

পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এলে ম্যালকম ম্যালকমসন ঠিক করল কোথাও নিরিবিলিতে গিয়ে পড়াশোনা করবে। তবে সাগর সৈকতের ধারে কিংবা গ্রামের কোনো সম্পূর্ণ নির্জন বাড়িতে বসে পড়ার কোনো খায়েশ তার নেই। জানে এসব জায়গাগুলো বেশ আকর্ষণীয়। তাই লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তার চেয়ে বরং কোনো অচেনা-অজানা মফস্বল শহরে যাওয়া যেতে পারে যেখানে তার মনোসংযোগ বিঘ্নিত হওয়ার সুযোগ নেই। বন্ধুদের কাছ থেকে কোনোরকম পরামর্শ চাওয়া থেকে বিরত রইল সে। কারণ এরা হয়তো এমন কোনো জায়গার নাম বলবে যা ম্যালকমের চেনা বা জানা এবং সে হয়তো ওসব স্থানে আগেই ঢু মেরেছে। তাই নিজেই নিজের জায়গা খুঁজে নিতে মনস্থির করল সে। সুটকেসে কিছু জামাকাপড় এবং প্রয়োজনীয় বইপত্তর ভরে নিয়ে লোকাল টাইম টেবিলে প্রথম যে জায়গাটির নাম দেখল সেখানকার একটি টিকিট কিনে ফেলল। ওই জায়গার নাম সে কস্মিনকালেও শোনে নি।

ঘণ্টা তিনেকের ট্রেন ভ্রমণ শেষে বেনচার্চে নামল ম্যালকমসন। সন্তুষ্ট বোধ করল এখন পর্যন্ত সে তার পথের নিশানা মুছে ফেলতে সমর্থ হয়েছে। কারণ কেউ জানে না পড়াশোনার জন্য তার গন্তব্য কোথায়। একটি নির্জন জায়গার সরাইখানায় রাত্রিযাপন

করার জন্য গেল সে। বেনচার্চ একটি মার্কেট টাউন, তিন হপ্তায় একবার এখানে হাটবাজার বসে, বাকি একুশ দিন শহর যেন মরুভূমি।

শহরে আসার পরদিন ম্যালকমসন ঘুরতে বেরুল দ্য গুড ট্রাভেলার সরাইখানার চেয়ে নিরিবিলি কোনো বাসস্থান মেলে কিনা। একটি মাত্র জায়গা তার নজর কেড়ে নিল। দেখামাত্র পছন্দ হয়ে গেল বাড়িটি- একা থাকার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা হতে পারে না। জ্যাকোবিয়ান স্টাইলে তৈরি, যেন অপরিকল্পিতভাবে গজিয়ে উঠেছে দারুণ মজবুত চেহারার প্রাচীন বাড়িটি। ঢালু পুরু ছাদ এবং অস্বাভাবিক ছোট ছোট জানালা, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে যাদের অবস্থান, বাড়িটি ঘিরে রেখেছে ইটের মস্ত প্রাচীর। সাধারণ মানুষের বাসস্থানের চেয়ে দুর্গের সঙ্গেই এটার মিল বেশি। তবে এসব বিষয়ই ম্যালকমসনকে আকৃষ্ট করল বেশি। এরকম একটি জায়গাই আমি খুঁজছিলাম, মনে মনে বলল সে। এখানে থাকার সুযোগ পেলে খুশিই হব। তার আনন্দ বর্ধিত হলো দ্বিগুণ যখন বুঝতে পারল বর্তমানে এখানে কেউ থাকছে না।

ডাকঘর থেকে এজেন্টের নাম ঠিকানা পেল ম্যালকমসন। ইনি মি. কার্নফোর্ড, স্থানীয় আইনজীবী এবং এজেন্ট। খুবই সদাশয় ভদ্রলোক। খোলা মনেই স্বীকার করলেন কেউ ওই বাড়িটি ভাড়া নিতে চায় জেনে তিনি যারপরনাই আনন্দিত। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল অনেকদিন ধরেই বাড়িটি খালি পড়ে আছে। ফলে ও বাড়ি নিয়ে আজগুবি সব কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে।

তবে আজগুবি কুসংস্কার নিয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না ম্যালকমসন। কারণ জানে সে চাইলে অন্য লোকজনের কাছ থেকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। সে এজেন্ট ভদ্রলোককে তিন মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে রশিদ নিল। মি. কার্নফোর্ড তাকে এক বৃদ্ধার নাম বললেন যে ম্যালকমসনের ঘরকন্নার কাজ করে দেবে। বাড়ির চাবি পকেটে ঢুকিয়ে এজেন্টের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সোজা চলল সরাইখানায়, ল্যান্ডলেডির সঙ্গে দেখা করতে। ইনি ভারী হাসিখুশি এক ভদ্রমহিলা এবং অতিশয় সজ্জন। তার কাছে জানতে চাইল প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনতে হলে কোন দোকানে যাবে। সে কোথায় উঠছে জানালে ভদ্রমহিলা বিষম চমকে গেলেন।

বিচারকের বাড়ি নিশ্চয় নয়। কথা বলার সময় ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার চেহারা। ম্যালকমসন বাড়ির ঠিকানাটা বলল তবে নামটি জানাতে পারল না। তার কথা শেষ হলে মহিলা বললেন :

অয়ি, অয়ি, বুঝতে পেরেছি সেই বাড়িটাই! ওটা বিচারকের বাড়ি।

ম্যালকমসন সরাইউলির কাছে বাড়িটি সম্পর্কে জানতে চাইল। কেনই বা ওই বাড়ির নাম বিচারকের বাড়ি এবং কেন লোকে বাড়িটির বিপক্ষে কথা বলে। ভদ্রমহিলা জানালেন স্থানীয়ভাবে ওটি বিচারকের বাড়ি নামেই পরিচিত। কারণ অনেক বছর আগে কত বছর আগে তিনি নিজেও জানেন না, কারণ তিনি এসেছেন দেশের আরেক প্রান্ত থেকে, তবে তার ধারণা বাড়িটির বয়স একশো বা তার বেশি তো হবেই –ওখানে এক

বিচারপতি বাস করতেন যিনি আসিজের কয়েদীদের জন্য ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। কারণ কঠিন সাজা দিতেন তিনি সবাইকে। তবে বাড়িটির বদনাম কেন রটে গেছে তা ল্যান্ডলেডি জানেন না। অনেককেই এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। কেউ সদুত্তর দেয় নি। তবে সকলেরই ধারণা ওখানে অশুভ এবং ভয়ানক কিছু একটা আছে। ল্যান্ডলেডিকে যদি ড্রিংকওয়াটার ব্যাংকের সমস্ত টাকাও দেয়া হয় তবু তিনি ওই বাড়িতে এক ঘণ্টার জন্যও যাবেন না। তবে পরক্ষণে তিনি ম্যালকমসনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এসব কথা বলার জন্য।

আপনাকে এরকম কথা বলা আমার মোটেই উচিত হচ্ছে না, স্যার আপনি একজন তরুণ ভদ্রলোক- তবু বলি ওখানে একা গিয়ে থাকবেন বিষয়টি ঠিক ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। আপনি যদি আমার ছেলে হতেন- এ কথা বলার জন্য মাফ চাইছি- আপনাকে আমি ওখানে একটি রাতও কাটাতে দিতাম না আর আমি নিজে তো যেতামই না। ভদ্রমহিলার আকুতি এবং আন্তরিকতা ছুঁয়ে গেল ম্যালকমসনকে। তার প্রতি মহিলার এহেন সদিচ্ছার প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে সে বলল :

ডিয়ার মিসেস উইদ্যাম, আমাকে নিয়ে একদমই দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আমার পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকব যে রহস্যময় কোনোকিছু, আমার কাজে একেবারেই ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

ওর কাজগুলো এমন কঠিন এবং বিরস যে তার মনের কোনাতেও কোনো রহস্যময় বিষয় স্থান পাবার অবকাশ নেই। সে বলল, হার মোনিকাল প্রোগ্রেশন, পারমুটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন এবং ইলিপটিক ফাংশন আমাকে যথেষ্ট রহস্যের রসদ জোগায়!

ম্যালকমসন এরপর গেল সেই বৃদ্ধার কাছে যে তার বাসার গৃহস্থালী কাজকম্মগুলো করে দেবে। মহিলাকে নিয়ে বিচারকের বাড়িতে ফিরল সে বেশ কিছুক্ষণ ইন্টারভিউ করার পর। এসে দেখে মিসেস উইদ্যাম কয়েকজন লোক এবং ছেলে ছোঁকড়া নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদের সঙ্গে নানারকম বাক্স পেটরা, একজন গাড়িতে করে বিছানাপত্তরও নিয়ে এসেছে। মিসেস উইদ্যাম ব্যাখ্যা দিলেন বিচারকের বাড়িতে চেয়ার টেবিলের অবস্থা ভালো থাকলেও গত পঞ্চাশ বছর ধরে ওখানে বিছানার কোনো ব্যবস্থা নেই। যাতে একজন তরুণ আরাম করে একটু শুতে পারে। তিনি বাড়ির ভেতরে উঁকি দিতে খুবই আগ্রহী; তবে কিছু একটার ভয়ে তিনি এতটাই ভীত যে সামান্য শব্দেও আঁতকে উঠে ম্যালকমসনের হাত খামচে ধরলেন এবং গোটা বাড়ি ঘুরে দেখার সময় একবারের জন্যও হাতখানা ছাড়লেন না।

বাড়ি পরিদর্শন শেষ করে ম্যালকমসন সিদ্ধান্ত নিল প্রকাণ্ড ডাইনিংরুমে বসেই সে পড়ালেখা করবে। সুপরিসর এ কক্ষটি তার সকল প্রয়োজন মেটাবে। এবং মিসেস উইদ্যাম ঠিকা কাজের বুয়া মিসেস ডেম্পস্টারকে নিয়ে ঘর গোছাতে লেগে গেলেন। প্যাকিং বাক্স পেঁটরা, ঝুড়ি ইত্যাদি এনে খোলা হলো। ম্যালকমসন দেখে আগামী কয়েকদিন ভালভাবে চলে যাওয়ার মতো খাবার দাবার পাঠিয়েছেন মিসেস উইদ্যাম।

বিদায়বেলায় তিনি সকলরকম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে দরজায় এসে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

ঘরটি যেহেতু বিশাল এবং ঠান্ডা, কাজেই স্যার, আপনার জন্য ভাল হবে যদি রাতে ঘুমাবার সময় আপনার বিছানার ধারের বড় পর্দাগুলো টেনে দেন- যদিও সত্যি বলতে কী এরকম একটা জায়গায় ওইসব কিছু যেগুলো মাথার ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে উঁকি দেয়, তার মধ্যে আমাকে বন্দি থাকতে হলে দম বন্ধ হয়ে মারাই যেতাম! এসব ছবির কথা কল্পনা করেই তাঁর কাঁপুনি উঠে গেল। তিনি একরকম পালিয়েই বাঁচলেন।

ল্যান্ডলেডি চলে গেলে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে নাক টানল মিসেস ডেম্পস্টার এবং বলল সে এসব জুজুর ভয়ে ভীত নয়।

বিষয়টি কী আপনাকে আমি বলছি, স্যার, বলল সে। জুজু নানারকমেরই আছে। ইঁদুর, গুবড়ে পোকা, কাঁচকোচ শব্দ করা দরজা, আলগা স্লেট পাথর, ভাঙা কাঁচের জানালা, আটকে যাওয়া দেরাজের হাতল যা দিনের বেলা টেনেও খোলা যায় না অথচ গভীর রাতে আপনা-আপনি খুলে গিয়ে দড়াম শব্দে পড়ে যায়–এসবই জুজুর ভয়। এ ঘরের কাঠের আচ্ছাদন দেখুন! অনেক পুরানো–শত বছরের পুরানো তো হবেই! আপনার কি ধারণা ওখানে কোনো ইঁদুর এবং গুবড়ে পোকা নেই? এবং আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, স্যার, যে ওদের দেখতে পাবেন না? ইঁদুর হলো জুজু, স্যার, আর জুজুই হলো ইঁদুর। এছাড়া এদের আর কী বলা যায়!

মিসেস ডেম্পস্টার, গম্ভীর গলায় বলল ম্যালকমসন। আপনি অনেক খোঁজখবর রাখেন বুঝতে পারছি। আমি যখন চলে যাব আপনি এ বাড়িতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আমার এখানকার কাজ সপ্তাহ চারেকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তারপর বাকি দুই মাস আপনি মাগনা থাকতে পারবেন।

ধন্যবাদ, স্যার, প্রত্যুত্তরে বলল মহিলা। তবে বাড়ির বাইরে একটি রাত্তিরও থাকার জো নেই আমার। আমি থাকি গ্রীন হাউসের চ্যারিটিতে। এক রাত বাইরে কাটিয়েছি কী আমার সবকিছু হারাতে হবে। ওখানকার আইনকানুন বড় কড়া। আর আমার জায়গাটি দখল করার জন্য অনেকেই মুখিয়ে আছে। শুধু এ কারণেই, স্যার, দিনের বেলাটা আমি দিব্যি সময় দিতে পারব।

কিন্তু আমি এখানে এসেছি পুরোপুরি নিরিবিলি থাকার জন্য, দ্রুত বলে উঠল ম্যালকমসন।

কর্কশ গলায় হেসে উঠল মহিলা। আপনাকে সেজন্য ভাবতে হবে না। আপনি এখানে পুরোপুরি নিরিবিলিই থাকতে পারবেন।

মহিলা ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়ল। সন্ধ্যার পরে বৈকালিক ভ্রমণ শেষে (ম্যালকমসন হাঁটতে হাঁটতে বই পড়ে) বিচারকের বাড়িতে ফিরে এসে ম্যালকমসন দেখে

ঘর চমৎকার ঝাঁট দেয়া হয়েছে, সবকিছু সুন্দর গোছগাছ করা, পুরানো ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে আগুন, বাড়ি জ্বালানো এবং মিসেস উইদ্যামের দেয়া খাবার দিয়ে টেবিলে সাপার সাজানো। সে খুব খুশি হয়ে গেল।

নৈশভোজ সেরে, মস্ত ডাইনিং টেবিলের আরেক মাথায় ট্রেটি ঠেলে সরিয়ে রেখে আবার বই নিয়ে বসল ম্যালকমসন। ফায়ারপ্লেসে শুকনো লাকড়ি ঢোকাল, বাতির শিখা বাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পড়াশোনার জগতে। রাত এগারোটা পর্যন্ত টানা পড়ালেখা করল সে। তারপর উঠল অগ্নিকুণ্ডের আগুনটা উস্কে দিতে। এক কাপ চা বানাল নিজের জন্য। সে চা খেতে খুব ভালবাসে। কলেজ জীবনেও অনেক রাত অবধি পড়ত ম্যালকমসন এবং চা বানিয়ে খেত। গভীর রাতে চা পানের বিষয়টি তার কাছে চমৎকার এক বিলাসিতা। ব্যাপারটি সে খুব উপভোগ করে। তাজা। লাকড়ি পেয়ে আগুন দাউ দাউ জ্বলছে, প্রকাণ্ড প্রাচীন কক্ষটির দেয়ালে ফেলছে অদ্ভুত দর্শন সব ছায়া। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে এই নির্জনতাটুকু বেশ উপভোগ্য মনে হচ্ছিল ম্যালকমসনের। হঠাৎ প্রথমবারের মতো সে সচেতন হয়ে উঠল ইঁদুরের শব্দে।

আমার বই পড়ার সময় ইঁদুরগুলো এখানে ছিল না, ভাবছে সে। তাহলে নিশ্চয় ওদের সাড়া পেতাম। তবে এখন শব্দের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে নিজেকে এই বলে বোঝাল ম্যালকমসন যে এসব শব্দ নতুন। অচেনা একজন লোকের আগমনে মূষিককূল নিশ্চয় ভয় পেয়েছে, আগুন এবং বাতির আলোও তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে; কিন্তু সময় যত

বয়ে যেতে লাগল শব্দ ততই বাড়তে থাকল, এরা যেন তাদের অভ্যস্ত খেলায় আনন্দ পেতে শুরু করেছে।

কী যে ব্যস্ত ওরা! আর বিচিত্র সব শব্দ করছে! পুরানো কাঠের আচ্ছাদনের পেছনে, ছাতের ওপর এবং মেঝের নিচে ওরা ছোটাছুটি করছে, দাঁত বসাচ্ছে, খামচি কাটছে! মিসেস ডেম্পস্টারের কথা মনে পড়তে আপন মনে হাসল ম্যালকমসন, জুজু ইঁদুর, ইঁদুরই জুজু!

চায়ের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেহ মনে। প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত কাজ করার মতো উৎসাহ পাচ্ছে সে। তার আগে কামরাটিতে একবার ভালভাবে চোখ বুলালে কেমন হয়, ভাবল ও। হাতে ল্যাম্প তুলে নিয়ে ও গোটা ঘরে চক্কর দিতে লাগল। ভাবছে এমন চিত্তাকর্ষক এবং সুন্দর বাড়িটি কী করে এতদিন ধরে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। ওক কাঠের দেয়ালের গায়ের ভাস্কর্যগুলো চমৎকার। দরজা এবং জানালার কারুকাজগুলোও দেখার মতো। দেয়ালে পুরানো কিছু ছবি ঝুলছে তবে এমন ধুলো ময়লা জমে গেছে যে মাথার ওপর বাতিটি তুলে ধরেও বোঝা গেল না ওগুলো কীসের চিত্র। ফাটল বা গর্তে আলোতে মাঝে মধ্যেই ধরা পড়ল ইঁদুরের জ্বলজ্বলে চক্ষু। তবে ওগুলো আলো দেখে ভয় পেয়ে কিচকিচ শব্দ তুলে মুহূর্তে উধাও।

তবে ম্যালকমসনকে সবচেয়ে আকর্ষণ করল ঘরের কিনারে, ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের একটি মস্ত ঘণ্টা। ওটা অ্যালার্ম বেল। ছাদ থেকে রশিতে ঝুলে আছে ঘণ্টাটি

ফায়ারপ্লেসের ওপর। ওক কাঠের অলংকৃত, খাড়া পিঠের একটি বিশাল চেয়ার অগ্নিকুণ্ডের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে ওতে বসল ম্যালকমসন। বসে বসে শেষ কাপ চা পান করল। চা শেষ করে আগুনটা উস্কে দিয়ে ফিরে গেল কাজে। অগ্নিকুণ্ড বাম পাশে রেখে টেবিলের একটা কিনারা দখল করল সে। ইঁদুরগুলোর কিচকিচ তাকে খানিকক্ষণ বিরক্ত করল তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এ শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেল ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ কিংবা স্রোতের শোঁ শোঁ শব্দের মতো। নিজের কাজে এমনই মশগুল হয়ে গেল ম্যালকমসন যে অঙ্কের জটিল সমস্যার সমাধান ছাড়া দুনিয়াদারীর অন্য সবকিছু বিস্মৃত হলো।

সে হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল, অঙ্কের সমস্যাটির সমাধান এখনও হয়নি, বাতাসে কেমন থম মেরে গেছে। ভোরের পূর্বাভাস সূচিত হওয়ার আগে এরকম স্তব্ধ থাকে বাতাস। ইঁদুরের কিচকিচানি থেমে গেছে। আকস্মিক এক নিরবতা ওকে কেমন অস্বস্তিতে ফেলে দিল। আগুন নিভু নিভু তবে এখনও লাল টকটকে কয়লা জ্বলছে। ওদিকে তাকাতে সে দারুণ। চমকে উঠল।

ফায়ারপ্লেসের ডান দিকে, খাড়া পিঠের ওক কাঠের প্রকাণ্ড চেয়ারটির ওপর বসে আছে মস্ত এক ইঁদুর, কটমট করে তাকিয়ে আছে ম্যালকমসনের দিকে। দৃষ্টিতে প্রবল ঘৃণা। ওটাকে মারার ভঙ্গিতে হাত তুলল ম্যালকমসন। কিন্তু একচুল নড়ল না ইঁদুর। উল্টো সাদা, তীক্ষ্ণ দাঁত খিচাল ক্রুদ্ধ হয়ে, তার নির্দয় চোখে ঝলসাল প্রতিহিংসা।

বিস্ময়বোধ করল ম্যালকমসন। চুল্লি থেকে পোকারটা তুলে নিয়ে ছুটল ওটাকে হত্যা করতে। কিন্তু আঘাত হানার আগেই কিচকিচ করে উঠল ইঁদুর, গলার স্বরে তীব্র ঘৃণা, লাফিয়ে পড়ল মেঝেয়, ঘণ্টার রশি বেয়ে আঁধারে উধাও হয়ে গেল। ওখানে সবুজ শেডের বাতির আলো পৌঁছায়নি। অদ্ভুতই বলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের কাঠের আচ্ছাদনের আড়াল থেকে ইঁদুরগুলোর ছোটাছুটির শব্দ শুরু হয়ে গেল।

তবে এবারে ওদিকে মনোযোগ দিল না ম্যালকমসন। কারণ তীক্ষ্ণ গলায় একটা মোরগ ডেকে উঠে জানান দিয়েছে ভোর সমাগত। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে গেল।

এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ম্যালকমসন যে টেরই পেল না মিসেস ডেম্পস্টার এসেছে তার ঘর ঝাট দিতে। মহিলা ঘরদোর পরিষ্কার করে, ওর নাশতা বানিয়ে তারপর খাটের স্ক্রীণে টোকা দিয়ে ওকে ঘুম থেকে জাগাল। রাতে অনেকক্ষণ কাজ করেছে বলে ক্লান্তিটা পুরোপুরি দূর হয়নি। তবে কড়া লিকারের এক কাপ চা নিমিষে ওকে সতেজ করে তুলল। একখানা বই হাতে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়ল ম্যালকমসন। সঙ্গে খানকয়েক স্যান্ডউইচও নিয়েছে যদি দুপুরে বাড়ি ফেরা না হয় তো রাস্তায় বা অন্য কোথাও বসে খেয়ে নেবে।

উঁচু উঁচু দেবদারু বৃক্ষের সারির মাঝ দিয়ে পথ চলে গেছে শহরের বাইরের দিকে। এখানকার নির্জনতাটুকু বেশ উপভোগ করল ম্যালকমসন। দিনের বেশ অনেকটা অংশ এদিকটাতেই ব্যয় হলো ওর পড়াশোনার খাতিরে।

পড়াশোনা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সে মিসেস উইদ্যামের সঙ্গে দেখা করতে গেল তার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ দিতে। খাস কামরার হিরক আকৃতির কাঁচের জানালা দিয়ে ওকে আসতে দেখে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। স্বাগত জানালেন ম্যালকমসনকে। ওর আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন :

এত পরিশ্রম করা উচিত নয়, স্যার। আপনার মুখচোখ কেমন শুকনো লাগছে। রাত্রি জাগরণ এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম কোনো মানুষের জন্যই ভাল নয়। সে যাকগে, স্যার, বলুন রাতটি কেমন কাটল? আশা করি ভাল? আপনাকে নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছিল। কিন্তু মিসেস ডেম্পস্টার যখন বলল আপনি সুস্থ আছেন এবং আপনাকে সে মরার মতো ঘুমাতে দেখেছে তখন একটু স্বস্তি পেয়েছি।

আমি ঠিকই আছি, হাসতে হাসতে বলল ম্যালকমসন। কিছুটা আমাকে বিরক্ত করে নি। শুধু কতগুলো ইঁদুর ছাড়া। সারা কামরা জুড়ে ওগুলো দাপিয়ে বেড়িয়েছে। একটা ধাড়ি শয়তান ফায়ারপ্লেসের ধারে আমার চেয়ারে বসেছিল। পোকার হাতে ধাওয়া করলে ওটা অ্যালার্ম বেলের রশি বেয়ে দেয়াল কিংবা ছাদের কোথাও ছুটে পালিয়েছে- আমি ঠিক দেখতে পাই নি। বেশ অন্ধকার ছিল।

ঈশ্বর রক্ষা করুন, বললেন মিসেস উইদ্যাম, একটা ধাড়ি শয়তান ইঁদুর ফায়ারপ্লেসের ধারের চেয়ারে বসেছিল! সাবধান, স্যার! সাবধান! যা রটে তার কিছু হলেও ঘটে।

মানে? আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ধাড়ি শয়তান! ওখানে হয়তো বুড়ো শয়তানটা আছে! না, না, হাসবেন না। ম্যালকমসনকে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে দেখে দ্রুত বললেন মহিলা। বুড়োরা যাতে ভয় পায় সেসব কথা আপনারা তরুণরা হেসেই উড়িয়ে দিতে চান।

আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, বলল ম্যালকমসন। আমাকে রূঢ় প্রকৃতির বলেও দয়া করে ভাববেন না। তবে আপনার কথা মেনে নেয়া আমার জন্য সত্যি কষ্টকর- বুড়ো শয়তানটা নিজে গত রাতে চেয়ারে বসেছিল। হা! হা! হা! হাসতে হাসতেই ওখান থেকে চলে এল ম্যালকমসন। বাড়ি চলল লাঞ্চ করতে।

দুই

রাতে ইঁদুরদের ছোটাছুটি একটু আগেই শুরু হয়ে গেল। বলা উচিত ও ঘরে প্রবেশের আগে থেকেই তারা দৌরাত্ম আরম্ভ করেছে। ম্যালকমসন ঘরে ঢুকতে তাদের দৌড়ঝাঁপে

সাময়িক ছেদ পড়ল। ডিনার সেরে আগুনের পাশে খানিক বসে ধূমপান করল ম্যালকমসন। তারপর টেবিল পরিষ্কার করে গত রাতের মতো পড়তে বসল।

ইঁদুরের দল গত রাতের চেয়ে আজ বেশি বিরক্ত করছে। ওপরে-নিচে, ডানে-বামে তাদের অবিরাম ছোটাছুটি চলছেই। সেই সঙ্গে কিচকিচানির তো বিরামই নেই। তারা নখের আঁচড় কাটছে কাঠে, দাঁত বসাচ্ছে। ক্রমে তাদের সাহস বেড়ে গেল। কাঠের আচ্ছাদনের ফাঁক ফোকর, ফাটল এবং গর্ত দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। আগুনের আলোয় তাদের ছোট ছোট চোখগুলো যেন বাতির মতো জ্বলজ্বল করছে। তবে চাউনিতে বদমায়েশি নেই। এরা শুধু খেলছে। সবচেয়ে সাহসী দুএকটা ইঁদুর মেঝেতেও চলে আসছে অথবা কাঠের আচ্ছাদনের আনাচে-কানাচে উঠে পড়ছে। তবে ম্যালকমসন খুব বেশি বিরক্ত বোধ করলে হুশ হাশ শব্দ করে অথবা টেবিল চাপড়ে ওগুলোকে ভয় খাইয়ে দিল। ওরা পড়িমড়ি করে সেঁধুলো গর্তে।

রাত যত গম্ভীর হলো, ইঁদুরদের শোরগোল সত্ত্বেও ম্যালকমসন তার কাজের মধ্যে গভীর মনোযোগে ডুবে যেতে থাকল।

গত রাতের মতো হঠাৎ করে সে কাজে বিরতি দিল আকস্মিক নিরবতা টের পেয়ে। কিচকিচ, নখ আঁচড়ানো কিংবা দাঁতে কামড়ানোর কোনোরকম শব্দ নেই। গোরস্তানসম নিস্তব্ধতা। আগের রাতের কথা মনে পড়তে সহজাত প্রকৃতিতে তার চোখ চলে গেল

ফায়ারপ্লেসের পাশে দন্ডায়মান চেয়ারখানার দিকে। একটা অদ্ভুত শিহরণ প্রবাহিত হলো তার গোটা শরীর বেয়ে।

ফায়ারপ্লেসের পাশে, পিঠখাড়া ওক কাঠের বিরাট চেয়ারটিতে বসে আছে সেই বিশালদেহী ইঁদুর। হিংস্র, কুটিল চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ম্যালকমসনের দিকে।

সহজাত প্রবৃত্তি ওকে হাতের কাছে যা পেল তা-ই তুলে নিতে দিল লগারিদমের একখানা বই। সে ওটা ছুঁড়ে মারল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো টার্গেট। ইঁদুর নড়ল না এক চুল। আবার পোকার হাতে গত রাতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবং ইঁদুরটা ম্যালকমসনকে অস্ত্র হাতে ছুটে আসতে দেখে অ্যালার্ম বেলের রশি বেয়ে পগাড়পার হলো। আর ওটা চলে যাওয়া মাত্র উঁদুরকুলের হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। বিশালদেহী ইঁদুরটা কামরার কোন্ অংশে কেটে পড়েছে দেখতে পায়নি ম্যালকমসন। কারণ তার সবুজ শেডের বাতির আলো শুধু ঘরের ওপরের অংশ আলোকিত করে রেখেছে এবং ফায়ারপ্লেসের আগুনও তেজ হারিয়ে ধুকছে।

ঘড়ি দেখল ম্যালকমসন। প্রায় মাঝরাত্তির। সে অগ্নিকুণ্ডে আগুন উস্কে দিয়ে রাতের বেলার জন্য চা বানাল। অনেক কাজ পড়ে আছে। একটু ধূমপান করলে মন্দ হয় না। সে ওক কাঠের চেয়ারে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ভাবল ইঁদুরটা কোথায়

সেঁধিয়েছে সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে। কাল ইঁদুর ধরার ফাঁদ কিনে আনার চিন্তাটাও বাতিল করে দিল না।

ম্যালকমসন আরেকটি ল্যাম্প জ্বালাল। রাখল এমন জায়গায় যাতে ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের দেয়ালে আলো পড়ে। তারপর হাতের কাছে সমস্ত বইপত্র জড় করে রাখল যাতে অনিষ্টকর প্রাণীটাকে দেখা মাত্র ওগুলো ওটার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পারে। সবশেষে অ্যালার্ম বেলের রশি টেনে এনে গোড়াটা রাখল টেবিলের ওপর, ল্যাম্পের নিচে। রশিটা বেশ প্যাচানো এবং মজবুত। এ দিয়ে তো মানুষের ফাঁসি দেয়া যায়, মনে মনে বলল ও। কাজ শেষ করে চারপাশে তাকিয়ে তৃপ্তি সহকারে বলল :

এবারে বন্ধু তোমাকে একটা শিক্ষা দেয়া যাবে! ও আবার পড়তে বসল যদিও শুরুতে ইঁদুরগুলোর ছোটাছুটিতে খানিকটা বিরক্ত বোধ করলেও কাজে এমন ডুবে গেল যে ওগুলোর কথা মনেই রইল না।

আবারও সে পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সচেতন হয়ে উঠল। এবারে আকস্মিক নৈশব্দ নয়, তার মনোযোগ আকর্ষণ করল রশিতে সামান্য আন্দোলন। টান খেয়েছে ওটা, সরে গেছে ল্যাম্প। নড়ল না ম্যালকমসন শুধু তাকিয়ে দেখল তার বইয়ের গাদা ঠিকঠাক আছে কিনা, তারপর তার দৃষ্টি অনুসরণ করল রশি।

চোখ তুলে তাকাতেই দেখে অতিকায় ইঁদুরটা রশি দিয়ে লাফ মেরে ওক কাঠের আরামকেদারায় বসেছে এবং তার দিকে রোষকষায়িত নয়নে তাকিয়ে আছে। ডান হাতে একখানা বই তুলে নিল ম্যালকমসন, লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ছুঁড়ে মারল ইঁদুরটাকে। ঝট করে লাফিয়ে সরে গিয়ে মিশাইলের নিশানা ব্যর্থ করে দিল ইঁদুর।

আরেকটা বই নিল ম্যালকমসন, তারপর আরেকখানা এবং একের পর এক বই ছুঁড়তেই লাগল কিন্তু একবারও টার্গেটের গায়ে লাগাতে পারল না। অবশেষে সে বই নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল নিশানা ভেদ করতে। কিচকিচ আওয়াজ করল ইঁদুর। মনে হয় ভয় পেয়েছে। এতে আরও উৎসাহ পেয়ে গেল ম্যালকমসন। ছুড়ল বই। ওটা ইঁদুরটার গায়ে লাগল থ্যাচ শব্দ করে। বিকট আর্তনাদ করল ইঁদুর, একবার তীব্র বিবমিষায় তার হামলাকারীকে দেখে নিয়ে চেয়ারের পিঠ বেয়ে উঠে মস্ত লাফ দিল অ্যালার্ম বেলের রশি লক্ষ্য করে এবং বিদ্যুতগতিতে দৌড়ে গেল। আকস্মিক টান খেয়ে দুলল বাতি তবে ওজনে বেশ ভারী বলে উল্টে পড়ল না। ইঁদুরটার ওপর চোখ রেখেছে। ম্যালকমসন। দ্বিতীয় বাতির আলোয় দেখল ওটা কাঠের আচ্ছাদনের কিনারে লাফিয়ে উঠে দেয়ালে ঝোলানো বিরাট আকারের ছবিগুলোর একটির নিচের গর্ত দিয়ে সুড়ৎ করে উধাও হলো। ধুলো আর কালি ঝুলি মাখা ছবির কারণে ওটাকে আর দেখা সম্ভব হলো না।

সকাল বেলায় আমি ইঁদুরটার নিবাসে খোঁজ লাগাব, মেঝে থেকে বই তুলতে তুলতে আপন মনে বলছে ম্যালকমসন। ফায়ারপ্লেসের ওপরে তিন নম্বর ছবিটি। মনে থাকবে।

সেই রাতে গভীর ঘুম হলেও বেশ কয়েকবারই কয়েক সেকেন্ডের জন্য অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল ম্যালকমসনের নানান দুঃস্বপ্ন দেখে। মিসেস ডেম্পস্টার ওকে ডেকে তুলল সকালে। শরীরটা কেমন অসুস্থ লাগল ওর, প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত বুঝতেই পারল না কোথায় আছে। মিসেস ডেম্পস্টারকে সে যে অনুরোধটা করল তা শুনে বিস্ময়বোধ করল মহিলা।

মিসেস ডেম্পস্টার, আজ যখন বাইরে যাব আপনি তখন ওই ছবিগুলোর ময়লা ধুলা পরিষ্কার করে ফেলবেন। বিশেষ করে ফায়ারপ্লেসের ওপরের তিন নম্বর ছবিটা থেকে। ওগুলো কীসের ছবি আমি দেখতে চাই।

সেদিন বিকেলে বই নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে বেশ ফুর্তিই লাগছিল ম্যালকমসনের। দিন যত গড়াচ্ছিল আগের দিনের উফুল্লভাব ফিরে আসছিল তার মাঝে। বইয়ের যে সব সমস্যা নিয়ে সে বিচলিত ছিল তার অনেকগুলোরই সমাধান করা গেছে। সে খুশি মনে মিসেস উইদ্যামের দ্য গুড ট্রাভেলার সরাইখানায় গেল। আরামদায়ক বসার ঘরে ডা. থর্নহিল নামে এক আগন্তুকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন ল্যান্ডলেডি। তবে ডাক্তার যখন ম্যালকমসনকে একগাদা প্রশ্নে জেরবার করতে লাগলেন, ভদ্রমহিলা একটু বিব্রতই হলেন। তবে প্রশ্নের ধরন শুনে ম্যালকমসন বুঝতে পারল ভদ্রলোকের উপস্থিতি নিতান্তই কাকতালীয় নয়। তাই সে বলল :

ড. থর্নহিল, আমি আপনার সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দেব যদি আপনি আমার একটি প্রশ্নের অন্তত জবাব দেন।

ম্যালকমসনের প্রশ্নে বিস্মিত দেখাল ডাক্তারকে তবে তিনি হেসে তাৎক্ষণিক বললেন, নিশ্চয়! কী প্রশ্ন?

মিসেস উইদ্যাম কি আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন এবং আমার। সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন?

একটু চমকেই গেলেন ডা. থর্নহিল । মিসেস উইদ্যামের মুখ লাল হয়ে গেল, তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তবে ডাক্তার সাহেব বেশ আমুদে মানুষ এবং সকল রকম পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত। তিনি খোলাখুলিই ওর প্রশ্নের জবাব দিলেন।

হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে আপনি জেনে যাবেন তা চান নি। আমার তাড়াহুড়োর কারণেই আপনি আসলে আমাকে সন্দেহ করে বসেছেন। বলেছেন আপনি যে ওই বাড়িতে একা একা থাকেন সেটি তাঁর একদমই পছন্দ নয়। আর তাঁর ধারণা আপনি বড্ড বেশি কড়া লিকারের চা পান করছেন। আসলে তিনি চাইছেন আমি যেন আপনাকে বেশি বেশি চা খেতে বারণ করি এবং বেশি রাত জাগতেও মানা করি। কলেজ জীবনে আমিও বইপোকা ছিলাম। কাজেই একজন সাবেক কলেজ ছাত্র হিসেবে এটুকু স্বাধীনতা নিতেই পারি এবং আশা করি আমাকে স্রেফ একজন আগন্তুক ভাববেন না।

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ম্যালকমসনের মুখ। হাত বাড়িয়ে দিল সে। আসুন, হাত মেলাই! আমেরিকায় এভাবেই বলে ওরা। আপনার এবং মিসেস উইদ্যামের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ। কথা দিচ্ছি আমি আর কড়া লিকারের চা পান করব না। আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আর চা-ই খাব না– এবং খুব যদি দেরিও করি তাও রাত একটার মধ্যে ঘুমাতে যাব। চলবে?

খাসা, বললেন ডাক্তার । এখন আমাদের বলুন তো পুরানো বাড়িটিতে কী কী দেখলেন।

ম্যালকমসন সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল গত দুরাতে কী ঘটেছে। তার কথা বলায় মাঝে মধ্যেই ব্যাঘাত ঘটল মিসেস উইদ্যামের ভয়ার্ত চিৎকারে । নিজেকে সামলে নিতে তিনি এক গ্লাস ব্রান্ডি এবং পানি পান করলেন। তারপর তাঁর ফ্যাকাশে মুখে রক্ত ফিরে এল। ম্যালকমসনের কথা শুনতে শুনতে ডা. থর্নহিলের মুখ গম্ভীরতর হলো এবং বর্ণনা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইঁদুরটা কি সবসময়ই অ্যালার্ম বেলের রশি বেয়ে উপরে উঠে যায়?

সবসময়।

আশা করি আপনি জানেন, একটু বিরতি দিয়ে বললেন ডাক্তার। রশিটা কীসের?

না!

এটা সেই রশি যা দিয়ে জল্লাদ বিচারপতির রায়ে সাব্যস্ত অপরাধীদের ফাঁসি দিত, ধীরে ধীরে বললেন থর্নহিল। এখানে তিনি আবার বাধা পেলেন মিসেস উইদ্যামের চিৎকারে। সামলে উঠতে তাঁকে আবার ব্রান্ডি এবং পানি পান করতে হলো। ঘড়ি দেখল ম্যালকমসন। ডিনারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। সে আর দেরি করল না। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

ম্যালকমসন চলে যাওয়ার পরে ডাক্তারের ওপর প্রায় হামলে পড়লেন মিসেস উইদ্যাম। ক্ষিপ্ত গলায় জানতে চাইলেন বেচারা তরুণটিকে অমন ভয়ঙ্কর একটা কথা শোনাবার মানে কী! এমনিতেই ওখানের নানান ঘটনায় বেচারা বিপর্যস্ত, যোগ করলেন তিনি।

ডা. থর্নহিল জবাব দিলেন, ম্যাডাম ওই কথাটি বলার পেছনে আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আমি ঘণ্টার রশির দিকে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছি যাতে ওই ঝামেলাটা সে নিজেই মিটিয়ে নিতে পারে। হয়তো ও একটু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত এবং ক্লান্ত, খুব বেশি পড়াশোনা করছে, যদিও ওকে আমার সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান বলেই মনে হলো, মানসিক এবং শারীরিক উভয় দিক থেকেই কিন্তু ওই ইঁদুরগুলো –আর ধেড়েটাকে শয়তান বলে মনে করা! ডানে বামে মাথা নাড়লেন তিনি। বলে চললেন, আমি ওর সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারতাম রাতটা একসঙ্গে কাটানোর জন্য কিন্তু তাতে সে অপমান বোধ করত। রাতের বেলা হয়তো ওর মধ্যে অদ্ভুত কোনো ভীতি কাজ করে কিংবা

দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হয়। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আমি চাই ও রশিটা ধরে টানুক। ঘণ্টার শব্দ পেলেই আমরা ওখানে চলে যাব। আমি আজ অনেক রাত অবধি জেগে থাকব এবং কান সজাগ থাকবে।

ডাক্তার, আপনি এসব কী বলছেন? আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?

আমি বলতে চাইছি যে সম্ভবত আজ রাতে আমরা বিচারকের বাড়ি থেকে অ্যালার্ম বেলের শব্দ শুনতে পাব। বললেন ডাক্তার।

তিন

সাধারণত যে সময়ে বাড়ি ফেরে ম্যালকমসন আজ তার চেয়ে একটু দেরি হয়ে গেল। মিসেস ডেম্পস্টার কাজ টাজ সেরে চলে গেছে- গ্রীনহাউস চ্যারিটির নিয়মকানুন খুব কড়া। ম্যালকমসন খুশি হয়ে গেল দেখে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে এবং বাতিও জ্বলছে। এখন এপ্রিল মাস। অথচ ঠান্ডাটা আজ একটু বেশিই পড়েছে মনে হয়। জোর হাওয়া বইছে বাইরে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে শক্তি ঝড়ের আশংকা নিয়ে।

ম্যালকমসন ঘরে ঢোকার পরে কিছুক্ষণ ইঁদুরের দৌরাত্ম থেমে ছিল। ওর উপস্থিতির সঙ্গে নিজেদের সমঝে নিয়ে আবার শুরু হয়ে গেল তাদের হুটোপুটি। ইঁদুরদের সাড়া পেয়ে আজ অবশ্য খারাপ লাগছে না ম্যালকমসনের, বরং ওদের সঙ্গ উপভোগই করছে।

রিডিংল্যাম্পটি শুধু জ্বলছে। ওটার সবুজ শেড সিলিং এবং রুমের ওপরের অংশ আলোকিত করে রেখেছে। চুল্লির আগুনের আলো ছড়ানো মেঝেয় এবং টেবিলে পেতে রাখা সাদা কাপড়টি তাতে ঝকমক করছে।

পেটে বেশ খিদে নিয়ে খেতে বসল ম্যালকমসন। খাওয়া শেষ করে। একটি সিগারেট ধরাল। তারপর বসে পড়ল কাজে। কোনোকিছুই সে আজ তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে দেবে না কারণ ডাক্তারকে তেমনই কথা দিয়েছে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে অনেকটা পড়া শেষ করবে ও।

ঘণ্টাখানেক একটানা পড়াশোনা করল ম্যালকমসন। তারপর বই থেকে তার চিন্তাভাবনাগুলো অন্যত্র সরে যেতে লাগল। আশপাশের পরিবেশ, আড়ষ্ট শরীর, নার্ভাসনেস কোনোকিছুই অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বাতাস এতক্ষণে দমকা হাওয়ার রূপ নিয়েছে, সেখানে ঝড়ে রূপান্তর ঘটল। প্রাচীন বাড়িটি যতই নিরেট এবং মজবুত হোক না কেন, ওটার ভিত ধরে যেন নাড়া দিল ঝড়ো হাওয়া। কেঁপে কেঁপে উঠল। বাড়িটির অসংখ্য চিমনির ভেতরে হুংকার ছাড়ছে বাতাস, খালি কামরা এবং করিডরগুলোতে বিচিত্র শব্দ তুলছে। ছাদের প্রকাণ্ড অ্যালার্ম বেলটিও নিশ্চয় বাতাসের শক্তি টের পেয়েছে, রশিটি ঈষৎ ওপরে উঠল এবং নামল, যেন ঘণ্টাটি এদিক-ওদিক দুলল। ওক কাঠের মেঝেতে রশির বাঁকানো অংশ পড়ল থপ শব্দ করে।

রশি পড়ার শব্দে ম্যালকমসনের মনে পড়ে গেল ডাক্তারের কথা ওই রশিতেই জল্লাদ বিচারকের ফাঁসির আসামীদের ফাঁসিতে ঝোলাত। সে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে রশিটি তুলে নিল হাতে। আশ্চর্য আগ্রহ বোধ করছে রশিটির প্রতি। ওটার দিকে তাকিয়ে ভাবল ফাঁসির এ রজ্জু না জানি কত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বিচারক নিজ চোখে দেখেছেন তাঁর আসামীদের ফাঁসিতে ঝুলতে। ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ছাদের ঘণ্টাটা দুলে উঠে রশিটিকে এদিক-ওদিক দোলাল। রশিটি কেমন কেঁপে উঠল।

অজান্তেই ওপরের দিকে চোখ চলে গেল ম্যালকমসনের। দেখল বিশালদেহী ইঁদুরটা রশি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে তার দিকে, স্থির চোখে জ্বলন্ত চাউনি। সঙ্গে সঙ্গে রশিটি হাত থেকে ফেলে দিল ম্যালকমসন। পিছিয়ে এল সভয়ে অস্ফুট চিৎকারে। ইঁদুর এবার রশি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেল এবং পরক্ষণে অদৃশ্য এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যালকমসন শুনতে পেল ইঁদুরের দল থেমে থাকা কোলাহল শুরু করে দিয়েছে আবার।

ম্যালকমসন ভাবছিল ধেড়ে ইঁদুরটার বাসস্থান খুঁজে দেখার কথা ছিল ওর, সেই সঙ্গে ছবিগুলোও দেখতে ঠিক করেছিল। শেডবিহীন একটি বাতি জ্বালাল ও। বাতিটি হাতে উঁচিয়ে ধরে ফায়ারপ্লেসের ডানদিকের তৃতীয় ছবিটির নিচে এসে দাঁড়াল। এ ছবিটির নিচেই গত রাতে ইঁদুরটাকে উধাও হতে দেখেছে সে।

প্রথমে দর্শনেই এমন চমকে গেল ম্যালকমসন যে আরেকটু হলেই বাতিটি ফেলেই দিচ্ছিল হাত থেকে। ওর মুখ শুকিয়ে গেল। হাঁটু কাঁপছে, কপালে ফুটল ভারী ঘামের

ফোঁটা, বেতসলতার মতো থরথরিয়ে কাঁপছে। তবে তরুণ এবং তেজি ম্যালকমসন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। উঁচু করে ধরল ল্যাম্প এবং ছবিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আগে ওতে ধুলো পড়া ছিল। এখন পরিষ্কার করা হয়েছে।

লাল টকটকে রোব পরা বিচারপতির ছবি। কঠোর, মজবুত, নির্দয় একটা মুখ। চেহারায় ফুটে আছে চতুরতা, শয়তানী এবং প্রতিহিংসা। ইন্দ্রিয়াসক্ত মুখ, শিকারী পাখির বাঁকানো ঠোঁটের মতো লালচে নাক। মুখের বাকি অংশ পান্ডুর, বিবর্ণ। চোখ জোড়া ঝকঝকে তাতে অত্যন্ত অশুভ ছাপ। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ম্যালকমসনের গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। কারণ ওই চোখজোড়ার সঙ্গে অতিকায় ইঁদুরটার চোখের আশ্চর্য মিল। হাত থেকে বাতিটি প্রায় পড়েই যাচ্ছিল যখন দেখল ছবির পাশের একটি গর্ত দিয়ে তীব্র ঘৃণামিশ্রিত একজোড়া চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক ওই মুহূর্তে অন্য ইঁদুরগুলোর কিচকিচানি থেমে গেল। যাহোক, নিজেকে সামলে নিল ম্যালকমসন এবং ছবিটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বিচারক খাড়া পিঠের ওক কাঠের অলংকৃত বিরাট একটি চেয়ারে বসে আছেন। ডান পাশে পাথরের তৈরি বড়সড় একটি ফায়ারপ্লেস। ওটার কিনারায়, ছাদ থেকে একটি রশি ঝুলছে। রশির শেষ মাথা কুন্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। আত্মা শুকিয়ে গেল ম্যালকমসনের কামরাটির দৃশ্য চিনতে পেরে। সে ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল যেন আশঙ্কা করছে কেউ তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ফায়ারপ্লেসের কিনারায় তাকাতেই আঁতকে উঠল সে এবং হাত থেকে পড়ে গেল বাতি।

ওখানে, বিচারকের আসনে, পেছনে ঝুলছে রশি, বিচারপতির বিষ দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে ইঁদুরটা, তার চেহারায় এখন উদগ্রতা এবং নিষ্ঠুর এক কদর্যতা। বাইরে বাতাসের মাতামাতি ছাড়া আর সব নিরব, নিস্তব্ধ।

বাতিটি ধাতব নির্মিত বলে ভাঙেনি, তেলও ছলকে পড়েনি মেঝেয়। ওটার গড়াগড়ির শব্দে যেন সম্বিত ফিরে পেল ম্যালকমসন। বাতিটি নিভিয়ে দিল ও। কপালের ঘাম মুছল। তারপর একটু চিন্তা করে আপন মনে বলল, এভাবে চলতে পারে না। এভাবে চললে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। আমি ডাক্তারকে কথা দিয়েছে চা খাব না। আমার স্নায়ুর ওপর নিশ্চয় অনেক চাপ পড়েছে যা খেয়াল করি নি। তবে আমি এখন ঠিক আছি। নির্বোধের মতো আর এমন ভয় পাব না।

সে ব্রান্ডির সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করল এবং মাথা ঠান্ডা করে পড়তে বসল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে, আকস্মিক নিরবতায় অস্বস্তি বোধ করে বই থেকে মুখ তুলে চাইল ম্যালকমসন। বাইরে হাউ মাউ শব্দে গজরাচ্ছে বাতাস, আগের চেয়েও জোরে ছাড়ছে হুংকার, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে বৃষ্টি, শিলাখণ্ডের মতো আছড়ে পড়ছে জানালার কাছে। তবে চিমনি থেকে ভেসে আসা হাওয়ার প্রতিধ্বনি এবং মাঝে মধ্যে দুএক ফোঁটা বৃষ্টি গরম চিমনির গায়ে আছড়ে পড়ে হিশ শব্দ তোলা ছাড়া ঘরের ভেতরে আর কিছুর শব্দ নেই। আগুনের তেজ কমে এসেছে যদিও লাল দপদপে আভা ছড়াচ্ছে কয়লা।

উৎকর্ণ ম্যালকমসন একটা পাতলা, খুবই আবছা খচখচ শব্দ শুনতে পেল। রশিটা যেখানে ঝুলছে, ঘরের সেই কিনারে আওয়াজটা হয়েছে। ও ভাবল রশি মেঝেয় ঘষা খেয়ে অমন শব্দ তুলেছে।

মাথা তুলে তাকাল ম্যালকমসন। স্বল্প আলোয় দেখতে পেল বিরাট ইঁদুরটা রশিতে ঝুলে ওটাকে চিবুচ্ছে। দড়িটা অবশ্য অনেকখানি কেটে গিয়ে ভেতরের সুতোও বেরিয়ে পড়েছে। ও যখন ওদিকে তাকিয়েছে ততক্ষণে রশির দফা সারা। দড়ির কাটা অংশটি ঝপাৎ করে পড়ল ওক কাঠের মেঝেতে। এক মুহূর্তের জন্য বিশালদেহী ইঁদুর রশির সুতোযুক্ত ছেঁড়া মাথায় ঝুলে রইল। ছেঁড়া রশিটা এদিক ওদিক দুলছে। ম্যালকমসন আতঙ্কবোধ করল ভেবে যে বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ মাধ্যমটি শেষ হয়ে গেল। রশি ধরে টান মেরে ঘণ্টা বাজানোর সুযোগটি আর রইল না, আর এ আতঙ্ক ওর মধ্যে সৃষ্টি করল ক্রোধ এবং সে যে বইটা পড়ছিল ওটা তুলে নিয়ে ইঁদুরের গায়ে ছুঁড়ে মারল।

লক্ষ্য নির্ভুলই ছিল। কিন্তু মিসাইল তার টার্গেটে পৌঁছানোর আগেই ইঁদুর রশি ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল মেঝেতে। ম্যালকমসন ছুটে গেল ওটার দিকে। কিন্তু ইঁদুর তিড়িং করে এক লাফে কামরার অন্ধকার ছায়ায় উধাও হয়ে গেল।

পড়ার মুড নষ্ট হয়ে গেছে ম্যালকমসনের। ইঁদুরটাকে সে আজ ছাড়বে । ল্যাম্পের সবুজ শেডটা খুলে নিল যাতে আলোটা ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ল্যাম্পের আলোয় রুমের

ওপরের অংশ উদ্ভাসিত হলো, নতুন আলোর বন্যায় আগেকার অন্ধকারের তুলনায় দেয়ালের ছবিখানা আরও পরিষ্কার পরিস্ফুটিত হলো। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ম্যালকমসন, তার বিপরীতে ডানদিকে, ফায়ারপ্লেসের ডানে দেয়ালে ঝুলছে তৃতীয় ছবিখানা। অবাক বিস্ময়ে চোখ ঘষল ম্যালকমসন। একটা বিকট ভয় চেপে বসল ওকে।

ছবির মাঝখানে বাদামী ক্যানভাস তাতে ব্যাকগ্রাউন্ড আগের মতোই আঁকা আছে, ছবিতে খাড়া পিঠের চেয়ার, চিমনি এবং রশি সবই দেখা যাচ্ছে, কেবল বিচারকের ছবিটি নেই!

ভয়ের শীতল একটা স্রোত ম্যালকমসনকে প্রায় জমিয়ে দিল। সে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। ওর শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো কাঁপতে লাগল। দেহের সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে, নড়াচড়াও করতে পারছে না। চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাও হারিয়েছে ম্যালকমসন। সে শুধু দেখছে এবং শুনছে।

কারুকাজ করা ওক কাঠের খাড়া পিঠের প্রকাণ্ড চেয়ারটাতে লাল আলখাল্লা পরা বিচারক বসে আছেন। কুটিল চোখজোড়া প্রতিহিংসায় জ্বলছে, নির্দয় মুখে বিজয়ের দৃঢ় সংকল্পের হাসি ফুটিয়ে তিনি হাতে একটি কালো টুপি তুলে নিলেন।

ম্যালকমসনের মনে হলো ওর বুকের মধ্যে প্রবল বেগে বইছে রক্তস্রোত, প্রলম্বিত সাসপেন্সের সময় মানুষের ভেতরে যেরকম অনুভূতির সঞ্চার ঘটে। তার কানে ঝিন ঝিন

শব্দ। প্রচণ্ড ঝড়ের হু হুংকার শুনতে পাচ্ছে ও, বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে বাজার এলাকা থেকে ঘড়ির ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে এল। টং টং শব্দে ঘোষণা করছে মাঝ রাত।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল ম্যালকমসন। যেন অনন্তকাল ওভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। হাঁ করা মুখ। বিস্ফোরিত চোখ বন্ধ করে আছে নিঃশ্বাস। ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজে বিচারকের মুখের বিজয়ীর হাসিটি তীক্ষ্ণ হলো, শেষ ঘণ্টাটি বাজার পরে তিনি কালো টুপিটি মাথায় পরলেন।

ধীরে সুস্থে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লেন তিনি। মেঝেয় পড়ে থাকা অ্যালার্ম বেলের খন্ডিত রশিটি তুলে নিলেন। হাত বোলালেন যেন ওটার স্পর্শ উপভোগ করছেন। তারপর রশিটির এক প্রান্তে গিটঠু মেরে তৈরি করতে লাগলেন ফাস। টেনেটুনে দেখলেন ফাঁসটি যথেষ্ট মজবুত হয়েছে কিনা। তারপর ওটা নিয়ে এগোলেন ম্যালকমসনের বিপরীত দিকের টেবিল ঘেঁষে। হাঁটার সময় তরুণ হাতটির ওপর অপলক দৃষ্টি থাকল তার। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

ম্যালকমসনের মনে হচ্ছিল সে ফাঁদে পড়েছে। কী করবে চিন্তা করার চেষ্টা করল। বিচারকের চোখে কীরকম যেন আর্কষণ আছে, চলৎশক্তি রহিত করে দেয়। সে একবারের জন্যও বিচারকের চোখ থেকে নিজের চোখ সরাতে পারেনি। যেন বাধ্য হয়েই তাকিয়ে থেকেছে।

বিচারককে এগিয়ে আসতে দেখল ম্যালকমসন। হাতে দড়ির ফাঁস। তিনি রঙ্কুটি ছুঁড়ে দিলেন ওকে লক্ষ্য করে যেন গলায় ফাঁস পরাবেন। বহু কষ্টে এক দিকে ঝট করে সরে গেল ম্যালকমসন। রশিটি গিয়ে পড়ল ওর পাশে। আবার রশি তুলে নিয়ে ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করলেন বিচারক। তাঁর হিংস্র, কুটিল চোখ স্থির হয়ে আছে ম্যালকমসনের চোখে। প্রতিবারই বিপুল চেষ্টায় দড়ির ফাঁদ এড়িয়ে গেল তরুণ ছাত্রটি।

এরকম চলল বহুক্ষণ। বারবার ব্যর্থ হলেও বিচারককে হতোদ্যম লাগল । তিনি যেন ইঁদুর-বেড়াল খেলায় সামিল হয়েছেন। অবশেষে দারুণ হতাশায়, ঘটনা যখন ক্লাইমেক্সে পৌঁছেছে, ম্যালকমসন চট করে একবার চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল।

বাতিটি জ্বলছে। ঘরও বেশ আলোকিত। দেয়ালের কাঠের আচ্ছাদনের অসংখ্য ফাঁকফোকড় দিয়ে উঁকি মারছে ইঁদুরগুলো। ইঁদুরগুলোকে দেখে যেন একটু স্বস্তি পেল ম্যালকমসন। অ্যালার্ম বেলের খণ্ডিত রশিতে চোখ পড়তেই দেখল ওটা ভর্তি হয়ে আছে রাশি রাশি ইঁদুরে। রশির এক ইঞ্চি জায়গা খালি নেই। ঢেকে ফেলেছে ইঁদুরের দল। সিলিং থেকে পিলপিল করে আরও উঁদুর বেরিয়ে আসছে। ওগুলোর ভারে ঘণ্টাটি দুলতে শুরু করল।

ঘণ্টার সঙ্গে যুক্ত দোলকটি দুলতে দুলতে ঘণ্টা স্পর্শ করল। ছোট্ট একটি শব্দ তুলল। তবে ঘণ্টা মাত্র দুলতে শুরু করেছে। ওটার শব্দ আরও বাড়বে।

ঘণ্টার শব্দে বিচারক, যিনি এতক্ষণ ম্যালকমসনের দিকে নজর রাখছিলেন, মুখ তুলে চাইলেন। তাঁর মুখে ক্রোধ ফুটল। ঘেত জাতীয় একটা আওয়াজ করলেন। তাঁর চোখ জোড়া জ্বলন্ত কয়লার মতো ধকধক করে জ্বলছে। তিনি এত জোরে পদাঘাত করলেন মেঝেতে, গোটা বাড়ি যেন কেঁপে উঠল।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল। বিচারক রশিটি আবারও হাতে নিলেন। ইঁদুরগুলো রশি বেয়ে ওপর নিচ করছে। এবারে রঞ্জু না ছুঁড়ে শিকারের দিকে এগিয়ে গেলেন বিচারক। হাত বাড়িয়ে রেখেছেন ফাস। তিনি এগিয়ে আসছেন, তাঁর উপস্থিতির মধ্যে যেন মানুষকে অবশ করে ফেলার একটা শক্তি রয়েছে। ম্যালকমসন স্রেফ একটা লাশের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বিচারকের বরফ শীতল আঙুলের স্পর্শ পেল সে গলায় যখন তিনি ওর ফাঁস পরিয়ে দিলেন। ফাঁসটি ক্রমে শক্ত হয়ে ম্যালকমসনের গলায় চেপে বসতে লাগল।

বিচারক আড়ষ্ট হয়ে থাকা তরুণ ছাত্রটিকে কাঁধে তুলে নিলেন। এগোলেন ওক কাঠের চেয়ারটির দিকে। সেখানে ওকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর নিজে ওর পাশে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে অ্যালার্ম বেলের ঝুলতে থাকা রশির মাথাটি ধরলেন। তাঁকে হাত তুলতে দেখে ইঁদুরের দল কিচমিচ করে পালিয়ে গেল। সিলিংয়ের গর্তে সেঁধুল। বিচারক ম্যালকমসনের গলায় পরানো ফাঁসের রজ্জুর শেষ মাথা বেঁধে দিলেন ঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা দড়ির সঙ্গে। তারপর চেয়ার থেকে নেমে গেলেন তিনি। বিচারকের বাড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দে শীঘ্রি লোকজন এসে ভিড় করল। তারা মশাল এবং আলো নিয়ে এসেছে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কাতে থাকল। কিন্তু কোনো সাড়া মিলল না।

দরজা ভেঙে ঢুকল তারা, সবেগে প্রবেশ করল প্রকাণ্ড ডাইনিংরুমে, সবার আগে আছেন ডাক্তার থর্নহিল।

ওখানে, বিশাল অ্যালার্ম বেলের রশির শেষ মাথায় গলায় ফাঁস নিয়ে ঝুলছে তরুণ ছাত্রটি। এবং দেয়ালে ঝোলানো বিচারকের ছবির মুখে ফুটে আছে অশুভ হাসি।

–ব্রাম স্টোকার

বন্ধ ঘরের রহস্য

বলসোভার স্কোয়ারের ১০৯ নম্বর বাড়ির নিচতলার প্যাসেজের শেষ মাথার ঘরটা সবসময় বন্ধ থাকে কেন? জানার খুব ইচ্ছা এমেলিয়া জেঙ্কিনসের। তবে বন্ধ ঘরের রহস্য জানার সৌভাগ্য হয়তো কোনোদিনই হবে না। কারণ ওর মনিব, মিসেস বিশপ এমন বদমেজাজী মহিলা, এমেলিয়ার কৌতূহলের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পেয়ে গেলে ওকে পিটিয়েই মেরে ফেলবেন।

দিন কয়েক আগে এমেলিয়া চুরি করে স্ট্রবেরি জ্যাম খেতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে যায় ও। মিসেস বিশপ শুধু ঠান্ডা চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতেই হার্টবিট বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল এমেলিয়ার। কঠিন গলায়, চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন– এমেলিয়াকে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর কিছু চুরি করে খেতে দেখলে মুখ ভেঙে দেবেন।

মহিলাকে যমের মতো ডরায় এমেলিয়া। ওর যাবার কোনো জায়গা নেই। নইলে ঠিক কোথায় চলে যেত। বাপ-মা মরা এতিম মেয়ে। পেকহ্যাম থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন মিসেস বিশপ। বিধবা মহিলার বাড়িতে দিনভর খাটে। কিন্তু মহিলা ওর সাথে মোটেও ভালো ব্যবহার করেন না। মহিলার স্বামী মারা গেছেন কবে কে জানে, এখনও উঁটফাট কমেনি। সোনালি চুলগুলো সবসময় পরিপাটি আঁচড়ে রাখেন, কৃত্রিম আইল্যাশ পরেন চোখে। লম্বা, ম্যানিকিউর করা নখ নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা নেই।

মিসেস বিশপকে ভয় পায় এমেলিয়া। তারপরও মহিলা বাইরে গেলে তার বেডরুমে ঢুকে সাজগোজের লোভ সামলাতে পারে না কিছুতেই। সাজ বলতে মিসেস বিশপের লাল রঙের একটা ফ্যান্সি ড্রেস পরা। ওটার হাড়ের তৈরি বোতামগুলো জ্বলজ্বল করে। দেখলেই বোঝা যায় খুব দামি। শার্টটা পরে আয়নার সামনে নিজেকে বারবার দেখে এমেলিয়া। তারপর আবার পোশাকটা খুলে, আগের মতো ভাঁজ করে রেখে দেয় ওয়ারড্রোবে।

মিসেস বিশপ সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না এমেলিয়া। তাই দুধঅলা বা হকারের কাছে তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করে। একদিন দুধঅলাকে সে প্রশ্ন করল, মিসেস বিশপের স্বামী কী করতেন জানো কিছু?

তরুণ এই দুধঅলাটি মনে মনে পছন্দ করে এমেলিয়াকে। প্রায়ই সে ফুল নিয়ে আসে মেয়েটির জন্য।

না, তেমন কিছু জানি না, জবাব দিল দুধঅলা। তবে শুনেছি ব্যবসা করতেন। দেশের বাইরে, ব্যবসার কাজে গিয়ে নাকি মারা গেছেন তিনি। ফ্রান্সের কোথায় যেন। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি সাদা চুল ছিল। মিসেস বিশপের বাবা বলে অনেকেই ভুল করত তাঁকে।

উনি স্বামীকে ভালোবাসতেন কিনা সন্দেহ আছে আমার, বলল এমেলিয়া। ভালোবাসার ব্যাপারটাই বোধহয় ভদ্রমহিলার মধ্যে নেই।

হেসে উঠল দুধঅলা। আজকালকার আধুনিক মেয়েরা তাদের স্বামীদের তেমন পাত্তা টাত্তা দিতে চায় না। মিসেস বিশপও হয়তো তাদের একজন। কেন, এখানে ভালো লাগছে না তোমার?

করুণ মুখ করে জবাব দিল এমেলিয়া, না। তবে বাইরের জগত এর চেয়েও খারাপ। তাই কোথাও যাবার সাহস পাই না।

তাহলে এখানেই থেকে যাও, পরামর্শের সুরে বলল দুধঅলা। অন্তত ভালো কোথাও চলে যাবার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত।

এমেলিয়ার আসলেই কোথাও যাবার জায়গা নেই। টাকা থাকলেও সে হয় কেটে পড়ার ধান্ধা করত। কিন্তু মিসেস বিশপ ওকে এত কম বেতন দেন যে নিজের টুকিটাকি জিনিস কেনার পর হাতে প্রায় কিছুই থাকে না। তারপরও এমেলিয়া সুযোগের অপেক্ষায় আছে। হাতে কিছু টাকা এলেই এখান থেকে চলে যাবে। এমেলিয়ার বিশ্বাস, মিসেস বিশপ ওই বন্ধ ঘরে টাকাপয়সা রাখেন।

একদিন সে এক অদ্ভুত স্বপ্নও দেখে ফেলল ঘরটিকে নিয়ে। দেখল মিসেস বিশপ ড্রইংরুমের ফায়ারপ্লেসের ডানপাশে রাখা একটি সিন্দুক থেকে একজোড়া চাবি নিয়ে সটান ঢুকে পড়লেন সেই বন্ধ ঘরে। তার পিছু নিয়েছিল এমেলিয়া। কিন্তু সে ভেতরে যাবার আগেই দরজা বন্ধ করে দিলেন মিসেস বিশপ। দরজা বন্ধ হবার আগে সে শুধু দেখতে পেল ঘরের মাঝখানে বড় একটা পালঙ্ক। বাইরে দাঁড়িয়ে এমেলিয়া শুনতে পেল ভেতরে যা ভেবেছি তাই, বিড়বিড় করল এমেলিয়া। ও ঘরে টাকা লুকিয়ে রেখেছেন মিসেস বিশপ।

সে ভেতরের দৃশ্য দেখার জন্য চোখ রাখল কী হোলে। সাথে সাথে কী যেন গরম একটা ঢুকে গেল চোখে, ভয়ানক জ্বলতে লাগল। ব্যথাটা এত বাস্তব, ঘুম ভেঙে গেল এমেলিয়ার। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছে বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। বন্ধ ঘরের রহস্য ভেদ করার আগ্রহ বেড়ে গেল কয়েক গুণ। ওখান থেকে কিছু টাকা যদি সরাতে পারি, নিজের মনে বলল এমেলিয়া, তাহলে সাথে সাথে এখান থেকে চলে যাব। লন্ডন বিরাট শহর। লুকোবার অনেক জায়গা আছে। পুলিশ খুঁজেও পাবে না। আর ধরা পড়লেই বা কী, এই নরকের চেয়ে জেলখানা নিশ্চয়ই খারাপ হবে না। সারাক্ষণ ওই মহিলার ধমকের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক ভালো।

স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটানোর চেষ্টা চালাল এমেলিয়া বারকয়েক। কিন্তু যতবার সাহস করে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াল, ততবারই কোনো না কোনো বাধা পেল। একবার হলঘর থেকে সে ড্রইংরুমে ঢুকবে ভাবছে, হঠাৎ মনে হলো মিসেস বিশপ পিছু পিছু আসছেন

ওর, ঘুরলেই তাঁর ঠান্ডা, নীল চোখ জোড়া দেখতে পাবে, কটমট করে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। আরেকবার মাঝরাতে সে চুপি চুপি নেমে এসেছে নিচে, পায়ের শব্দ পেল পেছনে। ঝট করে ঘুরল এমেলিয়া। নাহ্, কেউ নেই পেছনে। কিন্তু এত ভয় লেগে গেল, দৌড়ে সে ঢুকে গেল নিজের ঘরে, নিচতলায় নামার আর সাহসই পেল না। তবে দিনকয়েক পরে এমেলিয়ার বহুল প্রত্যাশার সুযোগটি এল।

আমি বেরুচ্ছি, এমেলিয়া, মিসেস বিশপ বললেন ওকে, ডিনারের আগে ফিরব না। কেউ ফোন করলে মেসেজ নিয়ে রাখবি।

নতুন কেনা কোট আর স্কার্ট পরে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তিনি। তাঁকে রাস্তার মোড় ঘুরতে দেখেই একদৌড়ে তাঁর বেডরুমে ঢুকল এমেলিয়া। নতুন হ্যাট কিনেছেন মিসেস বিশপ। দামি, পার্শিয়ান হ্যাট। কালো হ্যাটটা পরার খুব লোভ এমেলিয়ার। অবশেষে সুযোগ পাওয়া গেছে। সে হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। দেখতে মন্দ নয় এমেলিয়া, কালো হ্যাঁটে মানিয়েও গেছে, মিসেস বিশপের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী লাগল নিজেকে। হাসিমুখে এবার মিসেস বিশপের লাল কলারের নীল রঙের স্কার্টটা পরল ও। মনিবনীর চেয়ে হালকা পাতলা বলে পোশাকটা ঢিলে হলো গায়ে, তবে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ এমেলিয়া। ড্রেসিং টেবিলে থরে থরে সাজানো দামি সব লিপস্টিক আর নেইল পলিশ। ওগুলো ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারল না এমেলিয়া। মিসেস বিশপের ফরাসি হাই হিলও পায়ে গলাল।

তারপর মুচকি হেসে আবার দাঁড়াল আয়নার সামনে। নিজেকে বারবার দেখেও আশ মেটে না এমেলিয়ার।

এখন এমেলিয়াকে দেখলে কে বলবে ও বাড়ির চাকরানি! মনিবনীর চেয়ে শতগুণ সুন্দর লাগছে ওকে। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছে এমেলিয়া, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। আতঙ্কিত হয়ে উঠল এমেলিয়া। একটানে হ্যাটটা ছুঁড়ে ফেলে, পাগলের মতো জামাকাপড় খুলতে লাগল। ওদিকে ফোন বেজেই চলেছে।

এমেলিয়া আধা নগ্ন অবস্থায় গিয়ে ফোন ধরল। ম্যাসেজ রাখার পর শান্ত হলো ও। তারপর আস্তে ধীরে পোশাকগুলো ভাঁজ করে আগের জায়গায় পরিপাটি অবস্থায় রেখে দিল। ওর বুক এখনও ঢিপঢিপ করছে। এমেলিয়া ঠিক করল এখনই সে ড্রইংরুমে অভিযান চালাবে।

বাড়িতে কেউ নেই, তারপরও অভ্যাসমতো চারপাশে চোখ বুলাল এমেলিয়া। এখনও মনে হচ্ছে কেউ ওকে গোপনে দেখছে। অথচ মিসেস বিশপকে দেখেছে সে চলে যেতে। মিসেস বিশপ চুপিচুপি আবার ফিরে আসেননি তো? সন্দেহমুক্ত হবার জন্য এমেলিয়া বার দুই নক করল ড্রইংরুমের দরজায়। কোনো সাড়া নেই। সাহস করে এবার সে দরজা খুলল, পা রাখল ভেতরে। খোলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে, ঘরটা ঝকঝক করছে, এমেলিয়ার ভয় অনেকটাই কেটে গেল। দ্রুত পা চালাল সে ফায়ারপ্লেসের দিকে।

সিন্দুকে তালা মারা নেই। ডালা খুলতেই একটা চাবি চোখে পড়ল। স্বপ্নে দেখা সব ঘটনা বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। ইশ, ওই বন্ধ ঘরে যদি সত্যি টাকা থাকে, মনে মনে বলল এমেলিয়া, তাহলে টাকা নিয়ে এক্ষুণি কেটে পড়ব। স্বাধীন হয়ে যাব আমি। স্বাধীন এবং ধনী।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দৌড় দিল এমেলিয়া প্যাসেজের শেষ মাথায়, বন্ধ ঘরের দিকে। দরজায় তালা মারা। চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা, এমেলিয়ার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হলো ঘরটা। ঘরের মাঝখানে, ওর স্বপ্নে দেখা পালঙ্কটা সত্যি আছে, এককোনায় একটা আয়রন সেফ। এ ছাড়া আসবাব বলতে খানকয়েক চেয়ার এবং আয়না। আয়নার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাল এমেলিয়া। আয়না ওকে সবসময় অভিভূত করে তোলে। আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে কোনো ক্লান্তি নেই ওর। কল্পনায় তো প্রায়ই ও নিজেকে মঞ্চের অভিনেত্রী ভাবে। ভাবে অনেক টাকা থাকলে দামি দামি ড্রেস কিনে, সাজগোজ করলে অভিনেত্রীদের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ দেখাবে না ওকে। ঘরের এই আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইল এমেলিয়া। পালঙ্কের পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি পড়েছে আয়নায়। এমেলিয়া দেখল সাদা চুল, সাদা গোঁফের এক বুড়ো শুয়ে আছে বিছানায়, ঘুমাচ্ছে।

হঠাৎ ফায়ারপ্লেসের পাশে, দেয়ালের সাথে লাগানো আলমারির দরজা ফাঁক হয়ে গেল, ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। মিসেস বিশপ। তবে বিছানায় শোয়া বুড়োর মতো মিসেস বিশপেরও চারপাশে ধোয়াটে একটা পর্দা দেখা যাচ্ছে।

মহিলার পরনে নীল সিল্কের ড্রেসিং গাউন, তাতে বড় বড় মুক্তোর বোতাম, পায়ে উলের জুতো। এক হাতে সোনার বালা, অন্য হাতের আঙুলে অনেকগুলো ঝলমলে আংটি। এমেলিয়া লক্ষ করেছে মহিলা বিছানার দিকে, তারপর একটা বালিশ তুলে নিলেন হাতে। তিনি বালিশটা ঘুমন্ত বুড়োর মুখে চেপে ধরলেন সর্বশক্তি দিয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল এমেলিয়া, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। বিছানা খালি, ঘরও তাই। সে সম্পূর্ণ একা।

এত ভয় পেয়েছে এমেলিয়া যে সামলে উঠতে সময় লাগল। বুঝতে পারল আয়নায় ভৌতিক যে দৃশ্যটা দেখেছে বাস্তবে তাই ঘটেছে। ওই বুড়ো আর কেউ নন, মি. বিশপ স্বয়ং। মিসেস বিশপ তার স্বামীকে খুন করেছেন। হয়তো স্বামীর সাথে তিনি মানিয়ে নিতে পারছিলেন না বা টাকার লোভে, কোনো কারণেই হোক স্বামীকে মেরে ফেলেছেন মিসেস বিশপ। আসল ঘটনা কেউ জানে না। তিনি রটিয়ে দিয়েছেন মি. বিশপ বিদেশে মারা গেছেন। ভয়ঙ্কর সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল এমেলিয়া। মিসেস বিশপ তাহলে খুনি! ওই বড় বড় নীল চোখের ঠান্ডা দৃষ্টি তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

এখন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু টাকা না নিয়ে যাওয়া যাবে না। এমেলিয়া নিশ্চিত আয়রন সেফের মধ্যে টাকা আছে। সে সেফের হাতল ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। কিন্তু খুলছে না সেফ। কোথাও গোপন বোতাম আছে কিনা ভেবে সেফের গায়ে হাত বোলাতে লাগল এমেলিয়া।

সত্যি আছে! বোতামটায় চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল এমেলিয়া। সোনা! ড্রয়ারগুলো সোনার মুদ্রা, সোনার চুড়ি, আংটি, ব্রেসলেট আর নেকলেসে বোঝাই। মিসেস বিশপ কেন এ ঘরটা সবসময় বন্ধ রাখেন সে রহস্য এবার জানা গেল। তিনি শুধু খুনি নন, চোরও। স্বামীকে খুন করে তার সমস্ত সোনাদানা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি।

এ ঘর সবসময় বন্ধ রাখেন যাতে কেউ জানতে না পারে এখানে কী আছে।

আমি এখান থেকে কিছু গহনা সরিয়ে ফেলব, বিড়বিড় করল এমেলিয়া। এগুলো পরলে নিশ্চয়ই আমাকে খুব সুন্দর দেখাবে।

উত্তেজনার চোটে ভয় চলে গেছে এমেলিয়া। সে দ্রুত কয়েকটা চুরি আর ব্রেসলেট পরে নিল হাতে, গলায় পরল নেকলেস। সোনার গহনায় নিজেকে রীতিমতো মুড়ে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়াল আয়নার সামনে। সাথে সাথে মুখ থেকে হাসি মুছে গেল, দৃষ্টিতে ফুটল নির্জলা আতঙ্ক। সে দেখতে পেয়েছে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন রক্তমাংসের মিসেস

বিশপ। তাঁর হাতে লম্বা এক টুকরো তার, মুখটা কঠিন, চাউনিটা শীতল এবং কুর। কিছুক্ষণ আগে অবিকল এই চেহারার ভৌতিক মিসেস বিশপকে দেখেছে সে আয়নায়।

বেশ, স্বভাবসুলভ ঠান্ডা, শান্ত গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি। অবশেষে ধরা পড়ে গেছিস তুই। আমার গোপন ব্যাপারগুলো দেখে ফেলেছিস। আমার গহনাও পরে আছিস দেখছি। এদিকে আয় হারামজাদী।

নীল চোখে কী সম্মোহনী জাদু আছে কে জানে, পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এমেলিয়া। যেন সাপ সম্মোহন করে টেনে আনছে তার শিকারকে।

এমেলিয়ার শরীরের সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার ভাষা এবং শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে, নিরবে সে তার মনিবনীর আদেশ পালন করল। সামনে এসে দাঁড়াল মিসেস বিশপের।

হাঁটু গেড়ে বোস, আদেশ করলেন মিসেস বিশপ।

এমেলিয়া হাঁটু গেড়ে বসল, তার চোখ স্থির হয়ে আছে মিসেস বিশপের ধবধবে সাদা হাত আর টকটকে লাল ড্রেসের ওপর। সাবধানে দরজা বন্ধ করলেন মিসেস বিশপ, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন, হাতের তারটা দেখালেন এমেলিয়াকে।

চিনিস এটা কী? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা নাড়ল এমেলিয়া, কথা বলতে চাইল, কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ, একটা শব্দও বেরুল না। এটা তোর গলায় বাঁধব আমি, বলে চললেন। মিসেস বিশপ, যত্নের সাথে এমেলিয়ার ঘাড় এবং গলায় জড়ালেন তারটা। তোর বাবা-মা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেও কেউ তোর খোঁজ নিতে আসবে না। কাজেই... লম্বা, সরু, সাদা আঙুল দিয়ে তিনি ফাঁসটাকে শক্ত করে টানতে লাগলেন...

–এলিয়ট ও ডোনেল

মুণ্ডহীন প্রেত

এক

ভৌতিক এ কাহিনির পটভূমি আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, আমেরিকার হাডসন নদীর তীরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামটির নাম স্লিপি হলো। যে সময়ের কথা বলছি তখন উনিশ শতকের মধ্যভাগ, কয়েক বছর আগে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেছে। যুদ্ধে অংশ নেয়া কয়েকজন সৈনিক প্রাণের দায়ে পালিয়ে এসে স্লিপি হলোতে আশ্রয় নিয়েছিল।

এ গাঁয়ের প্রায় সকলেই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। ওই সময়ে অবস্থাপন্ন কৃষকরা তাদের বাগানে আপেল চাষও করতেন। গ্রামে একটি স্কুল আছে। আছে চমৎকার একটি গির্জা। এ গির্জাটির একটি ইতিহাস রয়েছে। শোনা যায়, তিনশ বছর আগে গির্জাটি তৈরি করে এক কুখ্যাত ডাচ জলদস্যু গনজালেস। এ গির্জায় প্রতি রোববার গাঁয়ের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় প্রার্থনা করতে যায়, সেখানে নবীন গায়কদের ছোট একটি দল নিয়ে প্রার্থনা সংগীত পরিবেশনা করে গাঁয়ের লজিং মাস্টার রাফায়েল হেরন। তবে তার কথা এখন নয়, পরে।

স্লিপিহলোতে শীতকালে যখন বেশ বৃষ্টি-বাদল হতো, ঝড় গোঁ গোঁ করে গোঙাত, এসব রহস্যময় রাতগুলোতে এ গাঁয়ের লোকেরা চুলোর আগুনের সামনে জড়ো হয়ে গল্প করত

এক রহস্যময় ব্যক্তিকে নিয়ে। তাকে আশেপাশের অনেকেই নাকি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে দেখেছে।

লোকটা এক অশ্বারোহী হোসিয়ান সৈনিক, বলল একজন।

যুদ্ধে মাথা হারিয়েছে সে। কামানের গোলায় উড়ে গেছে মুন্ডু,

লোকটা আসলে ভূত, শিউরে ওঠে আরেকজন। এ গাঁয়ের ভূতেদের রাজা।

লোকটা আসলে কে বা কী জানে না কেউ। যদিও মধ্যরাতে চাষাভুষোদের অনেকেই দেখেছে কালো রঙের মস্ত একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বিশালদেহী ভয়ংকর একটি মূর্তি নিস্তবদ্ধতা ভেঙে খটখটিয়ে চলেছে গাঁয়ের একমাত্র : পাকা রাস্তা দিয়ে।

লোকটার মুন্ডুহীন ধড় কবর দেয়া হয়েছে গির্জায়, জানায় একজন সে এসব খবর ভালোই রাখে। রাতের বেলা বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। সে ভাবে এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল। মাথামোটা আর কাকে বলে। যুদ্ধক্ষেত্রে যায় নিজের কাটা মুণ্ডুর খোঁজে। ভোর রাতে রাস্তায় বেরুলে দেখবে ঘোড়সওয়ার তীরবেগে ছুটে চলেছে। সকাল হওয়ার আগেই তাকে ফিরে যেতে হয় কবরে।

ভুতুড়ে ঘোড়সওয়ার নিয়ে এসব গল্প মনোযোগ দিয়ে শুনছিল রাফায়েল হেরন। সে এ গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারি করে। ভূত-প্রেতে তার প্রবল আগ্রহ। এ বিষয়ে পড়াশোনাও আছে প্রচুর।

বক পাখির সাথে রাফায়েল হেরনের চেহারার বেশ একটা মিল আছে। এ জন্যেই বোধ করি তার পদবি হেরন। সে খুব লম্বা, রোগা, টিংটিঙে হাতে-পা, হাত জোড়া হাঁটু ছাড়িয়েছে, চওড়া পায়ের পাতা কোদালের মতো। হাড্ডিসার লম্বা ঘাড়টার ওপরে বসানো ছোট একটি মাথা। হেরনের কান দুটো বিরাট, নাকটা এমনই লম্বা এবং খাড়া, খাম্বার কথা মনে করিয়ে দেয়। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে রাফায়েলকে দেখলে নাকি শস্য ক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

স্লিপিহলোকে বলা হয় এ অঞ্চলের সবচেয়ে শান্তিময় জায়গা। নদীর তীরে এটি একটি ছবির মতো গ্রাম। নদীর ধারে জঙ্গল আছে, এদিক সেদিক ছড়ানো ছিটানো পাহাড়সদৃশ টিলাও রয়েছে। এমন নির্জন, সুনসান আর স্বপ্নময় এলাকা খুব কমই চোখে পড়ে। কারো কারো ধারণা, এক ডাচ ডাক্তার, সে ডাকিনি চর্চা করত, অনেক দিন আগে এখানে নাকি জাদু করে গেছে। আবার কারও মতে, এক রেড ইন্ডিয়ান ওঝা জাদু করেছে এখানে।

এটা একটা ভূতুড়ে জায়গা, এক রাতে রাফায়েল হেরনকে ফিসফিস করে বলল বুড়ো এক চাষা। এ অঞ্চলে অগণিত উল্কাপাতের ঘটনা ঘটে, তারা খসে পড়ে। এদিকে দুঃস্বপ্নকে হার মানানো এমন সব ঘটনা আছে যা রাতের ঘুম হারাম করার জন্য যথেষ্ট।

দিনের বেলা অবশ্য ভূত-প্রেত নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই হেরনের। সে তখন তার স্কুল নিয়ে ব্যস্ত। তার স্কুলে একটি মাত্র ঘর। স্কুল ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শোনা যায় ছাত্ররা উঁচু গলায় ABCD পড়ছে। আবার কখনো শপাং শপাং ঘা মারার শব্দ ভেসে আসে। শিক্ষক তার অবাধ্য, ছাত্রকে ধরে পিটাচ্ছে।

তবে হেরন একান্ত বাধ্য না হলে ছাত্র পেটায় না। ছাত্র যদি বেজায় দুর্বল হয় আর শিক্ষকের হাতের বেত দেখে ভয়ে কেঁদে ওঠে ভ্যা করে, মন নরম হয়ে যায় তার। ছাত্রকে চোখ রাঙিয়ে, দুএকটা কড়া কথা শুনিয়ে ছেড়ে দেয়। তবে পাজির পা ঝাড়া দুএকটা ছাত্রকে ধরে পেটাতেই হয়। বেত মারার পরে হেরন যুক্তি দেখায় প্রহার করা হয়েছে ছাত্রের মঙ্গলের জন্যেই।

হেরন তার ছাত্রদেরকে পছন্দ করে। স্কুল ছুটির পর তাকে দেখা যায় ছাত্রদেরকে নিয়ে মেতে উঠেছে খেলায়। ছোটদেরকে সে বাড়িও পৌঁছে দেয়, বিশেষ করে সে ছাত্রদের বড় বোন যদি সুন্দরী হয় কিংবা মা ভালো রান্না করতে পারে।

হেরন তার ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। এছাড়া উপায়ও নেই। কারণ বেতন এত কম পায় যে তা দিয়ে তিন বেলা পেট চালানো কষ্ট।

আজকের ডিনারে কী থাকছে? প্রথমেই এ প্রশ্নটা করবে হেরন। রোগা পটকা হলে কী হবে, অজগর সাপের মতোই পেটুক সে। প্রচুর খেতে পারে।

হেরন একেক সপ্তাহে একেক পরিবারে থাকে। লজিং মাস্টার আর কী! বছরব্যাপী সারা গায়ে প্রতিটি পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করা হয়ে যায় তার। তার সঙ্গে মালপত্তরও বেশি নেই। একটা লাঠির ডগায় বড় একটা গামছার মধ্যে বাঁধা থাকে হেরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ওই সব দিনে চাষাভুষোরা ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে চাইত না। পড়াশোনা কিছু হয় না। মাস্টাররা খালি নাক ডেকে ঘুমায়। তবে হেরন যে অলস প্রকৃতির শিক্ষক নয় তা বোঝাতে সে যেসব বাড়িতে লজিং থাকত, তাদেরকে নানা কাজে সাহায্য করত। চাষীদের সাথে মিলে মাঠ থেকে খড় তুলে আনত হেরন, বেড়া বাঁধতে সাহায্য করত, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াত, মাঠে গরু নিয়ে যেত চড়াতে, শীতের জ্বালানির জন্যে বন থেকে কাঠ কেটেও আনত।

বাচ্চা ভেড়াগুলোর দেখাশোনা আমিই করতে পারি, বলত সে ছাত্রদের মায়েদেরকে। সে এক বাচ্চাকে হাঁটুর ওপরে বসিয়ে রেখে একই সঙ্গে আরেক বাচ্চার দোলনায় দোল দিয়ে যেত পা দিয়ে।

হেরন খুব পছন্দ করত শীতের রাতে মালসার সামনে বসে চাষী। বউদের কাছে ভূতের গল্প শুনতে। উল বুনতে বুনতে কিংবা মালসার আগুনে মিষ্টি আলু পোড়াতে পোড়াতে চাষী বউরা ভূত-প্রেতদের গল্প বলত।

ওই মাঠটা কিন্তু ভুতুড়ে, মন্তব্য করত একজন।

ওই সেতুর নিচে একজন ভূত থাকে, বলত আরেকজন। নিজের চোখে ভূতটাকে দেখেছি আমি।

হেরন নিজেও ভূতের গল্প জানত। ডাকিনি চর্চার ওপরে প্রচুর বই পড়েছে সে। মাঝে মাঝে এসব গল্প বলে সে। উল্কাপাত কিংবা আকাশ থেকে তারা ছিটকে পড়া যে অশুভ লক্ষণ, বলে চমকে দিত চাষাদেরকে। পৃথিবী বনবন করে ঘুরছে শুনে তারা সবাই ভয় পায়।

চুলোর ধারে বসে এসব গল্প বলার মজাই আলাদা। চুলোয় আগুন জ্বলছে, মাঝে মাঝে বন্দুকের গুলির আওয়াজ করে ফেটে যাচ্ছে কাঠ, দেয়ালে আলো আঁধারির খেলা। ভূতের গল্প বলার বা শোনার এরকম মোক্ষম পরিবেশ আর হয় না।

তবে ভূতের গল্প শোনার পর বাড়ি ফেরাটা একটু মুশকিলই হয়ে যায় ভীতু স্কুল মাস্টারের জন্যে। তার মাথায় তখন গিজগিজ করছে শত রাজ্যের ভৌতিক কাহিনী। শীতের এক সন্ধ্যায় একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয় পিছু নিয়েছে ভয়ঙ্কর আকৃতির ছায়ামূর্তি। দূরে কোনো বাড়ির জানালায়

ভাগ, আমার কাছ থেকে দূর হ! চেঁচিয়ে ওঠে হেরন। যেটাকে ভূত ভেবে সে ভয় পাচ্ছিল ওটা আসলে বড় একটি ঝোঁপ ছাড়া কিছু নয়।

কী ওটা? আপন মনে ফিসফিস করে হেরন। রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছে সে, জুতোর মচমচ শব্দ ছাপিয়ে মনে হয় আরেকটা কিসের যেন আওয়াজ শুনছে।

এমনই ভয় পেয়ে যায়, হেরন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। ভাবে ঘুরলেই দেখবে কেউ পিছু নিয়েছে তার। অবশ্য হেরনের সবচেয়ে ভয় একজনকে, চাষী বউরা যার নাম দিয়েছে স্লিপিহলোর মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার।

মাঝে মাঝে, যখন অনেক রাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে, অন্ধকার মাঠ ধরে হাঁটছে হেরন, হঠাৎ শুনতে পায় শোঁ শোঁ আওয়াজ উঠেছে গাছে, দমকা একটা হাওয়া যেন ডালপালা ভেঙেচুরে ছুটে যায়।

ওটা বাতাস ছাড়া কিছু নয়, নিজেকে অভয় দেয় হেরন। কিন্তু মন তাতে মানে না, জানে ওটা বাতাস নয়, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার!

দুই

স্কুলে পড়ানো আর যে বাড়িতে লজিং থাকে তাদের গৃহস্থালির কাজে খুঁটিনাটি সাহায্য করার পাশাপাশি রাফায়েল হেরন গানও শেখায়। প্রতিবেশী গ্রামের তরুণ-তরুণীদের গান শিখিয়ে দুপয়সা আয় রোজগার হচ্ছে তার।

প্রতি রোববার অত্যন্ত গর্বের সাথে শিক্ষানবিশ গায়কদের ছোট দলটিকে নিয়ে গির্জায় যায় হেরন। সেখানে প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন করে। তার কণ্ঠের জোর ছাপিয়ে যায় সবাইকে। আধ মাইল দূর থেকেও হেরনের গানের গলা শোনা যায়। যদিও কেউ কেউ তার কণ্ঠ নিয়ে ঠাট্টা করে। বলে রাফায়েল হেরনের গলার এমনই জোর পুরানো গির্জাতেও তার গানের সুর প্রতিধ্বনি তোলে।

শিক্ষিত হেরন তার রুচি এবং জ্ঞান নিয়ে গর্বিত, মূর্খ চাষাদের সমালোচনা সে থোড়াই গ্রাহ্য করে। পাশের গ্রামের মেয়ে ও মহিলা মহলে তার রয়েছে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা। ওই গ্রামে গেলে তারা হেরনকে নানান রকম পিঠা আর মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে।

রোববার গির্জা থেকে সোজা পাশের গায়ে চলে যায় হেরন। যাবার পথে রাস্তার ধারের বৈঁচি গাছে ফুটে থাকা টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলগুলো দিয়ে পকেট বোঝাই করে। মেয়েদেরকে খেতে দেয় ওই বৈঁচি ফল। সমাধি স্তম্ভের কবরে লেখা বিভিন্ন এপিটাফ মুখস্থ শোনায় ওদেরকে। গম্ভীর গলায় বলে, এখানে শুয়ে আছে আমার স্ত্রী। ওকে ঘুমুতে দাও। ও শান্তিতে আছে। আমিও। হেরনের বলার ভঙ্গিতে মেয়েরা হেসে কুটিপাটি।

হেরন মেয়েদেরকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে গাঁয়ের পশ্চিমে দীঘিসম মস্ত পুকুরটার ধারে, দূর থেকে ওদের পেছন নেয় অশিক্ষিত, ভিরু গ্রামবাসী। এসব তরুণ স্বভাবে লাজুক, মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস নেই। তারা ঈর্ষা নিয়ে দেখে পাশের গায়ের হেরন কত সহজে তাদের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মিশছে, কথা বলছে।

মহিলাদের চোখে হেরন মস্ত শিক্ষিত পুরুষ। সে ওদেরকে পড়ে শোনায় ডাকিনি চর্চার ইতিহাস। তার প্রিয় বিষয় হলো ডাইনি, পিশাচ, কালো ঘোড়া ইত্যাদি। এসবে গভীর বিশ্বাস হেরনের। অতিপ্রাকৃত গল্প পড়তে ভালোবাসে বলে স্লিপিহলোর ভূত-প্রেত নিয়েও তার আগ্রহের কমতি নেই। গল্প যত উদ্ভট এবং গা ছমছমে হবে, উত্তেজনা ততই বাড়বে হেরনের।

স্কুল ছুটির পরে নদীর ধারে আসে হেরন। শুয়ে শুয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভৌতিক গল্প-উপন্যাস। পড়তে পড়তে ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। প্রকৃতির প্রতিটি শব্দ তার উত্তেজিত মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে। ভেসে আসা পাখির ডাক, গেছো ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, পেঁচার তীক্ষ্ণ চিৎকার এমনকি ঝোঁপের মধ্যে পাখির ডানা ঝাঁপটানোর আওয়াজেও ঘাড়ের পেছনের চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে যায় হেরনের।

জোনাকি পোকা ভীত করে তোলে তাকে। অন্ধকারে গুবড়ে পোকা গায়ে পড়লে আঁতকে উঠে দশ হাত দূরে ছিটকে যায় হেরন, যেন ডাইনি থাবা বসিয়েছে শরীরে। ভয় তাড়াতে প্রার্থনা সংগীত গাইতে থাকে তার স্বরে। তার বিশ্বাস, ধর্মীয় গান শুনলে ভূত-প্রেত ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

ওই যে রাফায়েল হেরন যায়। রাতের বেলা আগুনের ধারে বসে চাষা বলে তার বউকে, গান গাইছে শুনতে পাচ্ছ?

হেরনের যত ভয় আর আতঙ্ক রাতকে ঘিরে, দিনের বেলা তার মতো সাহসী কেউ হয় না। তবে ভূতুড়ে কল্পনার জগৎ নিয়ে বেশ আছে সে।

তিন

মিস জুলিয়া অগাস্টিন, রাফায়েল হেরন বলল এক সন্ধ্যায়। আজ চমৎকার গান করেছেন আপনি। দারুণ উন্নতি হচ্ছে আপনার।

হেরন তার ছোট গানের দলটির সাপ্তাহিক সংগীত শিক্ষার আসর শেষ করেছে কিছুক্ষণ আগে। যে তরুণীকে উদ্দেশ্য করে সে কথাগুলো বলেছে, সেই মিস জুলিয়া অগাস্টিন গভীর দৃষ্টিতে তাকাল হেরনের দিকে।

ধন্যবাদ, মি. হেরন, বলল মেয়েটি। আপনার খুব দয়া। ভারী মিষ্টি করে হাসল সে। জবাবে হেরনও মধুর হাসল।

আপনার বাবা-মাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, মেয়েটি বাড়ির পথ ধরলে তাকে বলল হেরন।

অবশ্যই, বলল তরুণী, আপনি আমাদের বাড়িতে এলে বাবা-মা খুব খুশি হবেন।

একথা শুনে বার কয়েক ঢোক গিলল স্কুল মাস্টার। খুশিতে উদ্ভাসিত চেহারা। জুলিয়াকে যতক্ষণ দেখা গেল রাস্তায়, তাকিয়ে রইল তার দিকে। মেয়েটি মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে হেরন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জুলিয়া।

জুলিয়া অগাস্টিন ওই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী কৃষকের একমাত্র কন্যা। সে তিতির পাখির মতো কমনীয়, তার নরম গোলাপী গাল জোড়া রসালো পীচ ফলের মতো টসটসে। তার রূপের কথা ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের দুদশ গ্রামে। জুলিয়ার বাপের প্রচুর পয়সা। উত্তরাধিকারসূত্রে সে-ই সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক হবে একদিন।

তবে হেরনের মতো আর কেউ জুলিয়াকে রঙিন গ্লাসের চশমা দিয়ে দেখার সাহস করে না।

জুলিয়াকে গাঁয়ের অনেক চাষী বউ পছন্দ করে না তার কাপড় চোপড়ের ধরনের জন্য। জুলিয়ার পিতামহী নাতনীকে সোনার গহনা বসানো অত্যন্ত দামী একটি জামা কিনে দিয়েছেন। তবে স্কার্টটি বেজায় খাটো। ওই সময় এত খাটো স্কার্ট কোনো মেয়ে পরত না। স্কার্ট জুলিয়ার সুন্দর পা। জোড়া উন্মুক্ত করে রাখে। এটা অনেকের দৃষ্টিতে অশোভন।

প্রতিটি মেয়ের জন্য হৃদয়ের কোণে মমতা জড়িয়ে আছে হেরনের। কাজেই জুলিয়ার মতো সুন্দরী মেয়ের জন্য যে তার অন্তর ব্যাকুল হবে তা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষ করে জুলিয়া ধনী পরিবারের মেয়ে ও সুন্দরী বলে। তাই সে একদিন গেল ও বাড়িতে।

আসুন, মাস্টার সাহেব, হেরনকে দেখে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন বৃদ্ধ রজার অগাস্টিন, জুলিয়া আপনার কথা অনেক বলেছে। জুলিয়ার বাবা আন্তরিকভাবে পিঠ চাপড়ে দিলেন হেরনের।

ও ব-বলেছে? বিড়বিড় করল হেরন। ও তো আমার সবচেয়ে প্রতিভাবান ছাত্রী। ওর কণ্ঠ দোয়েল পাখির মতো।

জুলিয়া বলেছে আপনার মতো স্মার্ট যুবক সে দ্বিতীয়টি দেখে নি, জানালেন রজার অগাস্টিন।

তাই নাকি? শুনে খুব খুশি হেরন।

রজার হেরনকে তার খামারবাড়ি ঘুরে দেখার অনুমতি দিলেন। শ্রীমন্ত নদীর আধমাইল দক্ষিণে, চমৎকার একটি জায়গায় খামার বাড়িটি। গোলাঘরটি গির্জার মতোই প্রকাণ্ড, খড়ের গাদা আর শস্য ভর্তি। গোলাঘরের ছাদে বসে মনের সুখে বাকবাকুম করে চলছে অনেকগুলো পায়রা। মোটাসোটা ছাগলগুলো অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে খোয়াড়ে। সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে হৃষ্টপুষ্ট একপাল লাল-সাদা এবং মেটে রঙের গরু। পুকুরে সাঁতার কাটছে ধবধবে সাদা রাজহাঁস আর পাতিহাঁসের দল। বড়সড় আকারের মুরগিগুলো মাটিতে পোকা খুঁটে খাচ্ছে। নধরকান্তি একটি ঝুঁটিঅলা মস্ত লাল মোরগ

নজর কেড়ে নিল হেরনের। গর্বিত ভঙ্গিতে বার কয়েক ডানা ঝাঁপটাল ওটা। তারপর নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। পোকা খাবে।

কী দারুণ খামার আপনার! হেরন বলল জুলিয়ার বাবাকে।

এখানকার বাসিন্দারাও দারুণ! বোঝাই যায় এদের খুব যত্নআত্তি করেন আপনি।

আসলে খামারের বাসিন্দাদের দেখে জিভে জল এসে গেছে হেরনের। চোখের সামনে ভাসছে গরুর মাংসের ঝোল আর বনমোরগের রোস্ট।

ঠিকই বলেছেন আপনি, বললেন খামারবাড়ির গর্বিত মালিক রজার অগাস্টিন, দেখার চোখ আছে আপনার স্বীকার করতেই হয়। বাড়ি চলুন। আমার স্ত্রী আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

রজার অগাস্টিনের বাড়ির প্রতিটি কোণা থেকে উপচে পড়ছে প্রাচুর্য। বাড়ির বাইরে বড় বড় মাছ ধরার জাল ঝুলছে, বিরাট বস্তাভর্তি উল, সুতা কাটার জন্যে প্রস্তুত।

এটা আমাদের সবচেয়ে ভালো বৈঠকখানা, হেরনকে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন মিসেস রজার অগাস্টিন। পালিশ করা কাঠের টেবিল আয়নার মতো চকচকে। কোণায় একটি কাঠের আলমারি। ওটার পাল্লা খুললেন ভদ্র মহিলা। ভেতরে রূপার তৈরী প্রচুর

তৈজসপত্র। রজার অগাস্টিনের পরিবারের কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল হেরন, মনের চোখে দেখতে শুরু করেছে এই দিগন্তবিস্তৃত শস্যের মাঠ, ফলের বাগান ইত্যাদি সবকিছু একদিন তার হবে।

কে জানে, আপন মনে বলছে হেরন। একদিন হয়তো আমি সবকিছু বিক্রি করে টাকাটা নিয়ে আমেরিকা চলে যাব, ওখানে বিনিয়োগ করব । শুনেছি আজকাল ওই দেশে গেলে নাকি ফিরে যায় ভাগ্য।

ভবিষ্যৎ এখনই দেখতে পাচ্ছে হেরন। দেখছে সে আর রূপসী জুলিয়া মাল সামাল বোঝাই ওয়াগন নিয়ে আমেরিকার টেনেসি কিংবা কেনটাকির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। সঙ্গে ঈশ্বর চাহে তো তাদের ছেলেমেয়েরাও থাকবে।

তবে কল্পনায় ধনী, সুন্দরী নারীকে বিয়ে করা এক ব্যাপার আর বাস্তবে তার হৃদয় জয় করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

চার

হেরন পুরানো দিনের নাইটদের গল্প বইতে পড়েছে তাঁরা তাঁদের ভালোবাসার পাত্রীদেরকে রক্ষা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। তাঁরা লড়াই করতেন দানব আর ড্রাগনদের বিরুদ্ধে, বোঝা-পড়া করতে হতো জাদুকরদের সঙ্গে। পাথরের দেয়াল

টপকাতেন তাঁরা, লোহার গেট ভেঙে ঢুকে পড়তেন মাটির নিচের ঘরে যেখানে বেচারী মেয়েগুলো বন্দি হয়ে আছে।

আমার কাজটাও ওই নাইটদের মতোই কঠিন, আপন মনে নিজেকে শোনায় স্কুল মাস্টার। সুন্দরী জুলিয়ার হৃদয় জয় করতে হবে আমাকে। তবে মেয়েটি বড় অস্থিরমতি, যখন তখন বদলে ফেলে সিদ্ধান্ত। জানি না। ও সত্যি আমার ব্যাপারে সিরিয়াস নাকি স্রেফ খেলছে আমাকে নিয়ে।

নাইটদের মতো হেরনেরও শত্রুর অভাব নেই। তবে তারা ড্রাগন বা দানব নয়, রক্তমাংসের প্রতিদ্বন্দ্বী। খামারে অনেক তরুণ আছে যারা জুলিয়াকে বিয়ে করার জন্য পাগল। এরা একে অপরকে ঈর্ষা করে, বিশেষ করে রাফায়েল হেরনের মতো বহিরাগতদের প্রতি তাদের হিংসাটা বেশি। হেরন জানে জুলিয়ার মন জয়ের চেষ্টার কথা জানতে পারলে এরা সবাই তার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে পড়বে।

আমি সবসময়ই লড়াইর জন্য প্রস্তুত, এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন প্রায়ই চেঁচিয়ে বলে এ কথা। তার নাম আব্রাহাম ফার্নান্দেজ। দেখতে বেশ সুদর্শন বলে বন্ধুরা রোমিও বলে ডাকে। ওর গায়ে ষাঁড়ের মতো জোর ।

গাঁয়ের সবাই কালো, কোঁকড়ানো চুলের রোমিওকে চেনে। তার অনেক সাহস, মজাও করতে পারে বেশ। আড্ডা মারতে ভালোবাসে রোমিও, তাকে সবসময় দেখা যায় খড়ের

টুপি মাথায়, তাতে শেয়ালের লেজ ঝুলছে পেছন থেকে। রাতের বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে চলার সময় সবাই বুঝতে পারে দলবল নিয়ে কোথাও যাচ্ছে রোমিও ফার্নান্দেজ। কোথাও হট্টগোল বা মারামারি বাঁধলে সবাই জানে এর মূল হোতা রোমিও।

বেপরোয়া এই যুবক জানে না একটি মেয়ে তাকে ভালোবাসে। আর মেয়েটি অন্য কেউ নয়, জুলিয়া অগাস্টিন। মেয়েদের মন পাবার মতো গুণ নিজের আছে বলে মনে করে না রোমিও। ভল্লুকের মতোই সে কর্কশ। তবু জুলিয়া তাকে কেন পছন্দ করে, ঈশ্বর জানেন।

রোমিও ফার্নান্দেজকে জুলিয়া ভালোবাসে এরকম একটা কথা চাউর হয়ে যাবার পরে যারা জুলিয়াকে প্রেম নিবেদন করবে ভেবেছিল তারা সভয়ে কেটে পড়ল। দূর থেকেও রোমিওর ঘোড়া দেখলে তারা অন্য রাস্তা ধরে। রোমিওকে সবাই যমের মতো ডরায়।

হেরন জানত রোমিওকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। তবে সংগীত শিক্ষক হিসেবে জুলিয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ভালোভাবেই নিচ্ছে সে। আর জুলিয়ার বাবা-মাও খুশি হন হেরন বাড়ি এলে। সন্ধ্যাবেলা জুলিয়াকে নিয়ে হেরন খামার ঘুরতে বেরুলে তাঁরা আপত্তি করেন না।

দুজনে কী কথা বলে কে জানে। তবে হেরনের সবসময়ই চেষ্টা থাকে পাণ্ডিত্য আর বিদ্যার জোরে অস্থিরমতি জুলিয়াকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার। তার বিশ্বাস এ ব্যাপারে

সে বেশ খানিকটা এগিয়েও গেছে। জুলিয়াকে বিয়ে করে রজার অগাস্টিনের সম্পত্তির মালিক হবার স্বপ্ন সর্বক্ষণ দেখে চলেছে হেরন।

প্রতিবেশীরা একদিন লক্ষ করল আগের মতো আর রজার অগাস্টিনের বাড়ির বেড়ার বাইরে রোমিও ফার্নান্দেজের ঘোড়া বাঁধা থাকে না।

রাফায়েল হেরনের সাবধানে থাকা উচিত, বলাবলি করে তারা। কারণ রোমিও সহজে কাউকে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়।

সবাই জানে রোমিও আর হেরন একদিন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। রোমিও হাতহাতি লড়াইয়ের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে চায়।

স্কুল মাস্টারটাকে আমি দুই ভাঁজ করে ওর নিজের স্কুল ঘরের শেলফে রেখে আসব, ঘোঁত ঘোত করে বলে রোমিও ফার্নান্দেজ। তবে দু ভাঁজ হবার কোনো ইচ্ছে নেই হেরনের। রোমিওকে সে সুযোগ কখনোই দেবে না। তার সাথে চ্যালেঞ্জেই যাবে না হেরন। ফার্নান্দেজ স্কুল মাস্টারকে নিয়ে নানা ঠাট্টা মশকরা করে, তাকে রাগিয়ে তুলতে চায়। স্কুলের সামনে দলবল নিয়ে মাটি কাঁপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় রোমিও। গানের ক্লাস চলছে, দলবল নিয়ে বাইরে এমন চেঁচামেচি করে রোমিও, ক্লাস করাই মুশকিল। রাতের বেলা স্কুল ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে যায়। হেরন ভাবে ডাইনি কিংবা ভূত এসে অমন কাণ্ড করেছে।– জুলিয়ার সঙ্গে হেরনকে দেখলেই তাকে বিব্রত করার মওকা

খুঁজতে থাকে রোমিও। একবার সে কোত্থেকে হাড় জিরজিরে, খোস পাঁচড়ায় ভর্তি বুড়ো একটা কুকুর ধরে নিয়ে এলো। যখন হেরনের গানের ক্লাস শুরু হলো, কুকুরটাকে উস্কে দিল রোমিও। কুকুরের ঘেউ ঘেউর চোটে বারটা বেজে গেল ক্লাসের।

দেখতে দেখতে চলে এল গ্রীষ্ম। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখনো লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়নি। শরৎ এলো। শরতের এক চমৎকার বিকেলে হেরন তার স্কুল ঘরে, ডেস্কে বসে আছে। ডেস্ক বোঝাই গোপন জিনিসে, প্রায় সবই সে ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে আছে আধ খাওয়া পেয়ারা, পপ গান (ঢিল ছোঁড়ার নল) সহ প্রচুর বল।

ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। হেরন একটু আগে একজনকে বেত দিয়ে ধুমসে পিটিয়েছে বাঁদরামী করার জন্য। তাই কারো মুখে এখন টু শব্দটি নেই। সবার চোখ বইয়ের পাতায়। নিঃশব্দে পড়ছে। চমৎকার শান্তি পূর্ণ পরিবেশ।

কিন্তু শান্তি বিঘ্নিত হলো কোমরে চাকুর খাপ ঝোলানো এক লোকের আগমনে। সে জুতোয় শব্দ তুলে ক্লাসরুমে ঢুকল।

হেরন মাস্টার সাহেব, উঁচু গলায় বলল আগন্তুক, আপনাকে একটি পার্টিতে যাবার দাওয়াত দিতে এসেছি আমি। আপনার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি পার্টিটিকে মহিমান্বিত করে তুলবে, স্যার।

পার্টি? প্রশ্ন করল হেরন, কিন্তু কোথায়?

চমৎকার এক পার্টি, স্যার। পুনরাবৃত্তি করল লোকটা।

সে তো বুঝলাম বলল হেরন, কিন্তু দাওয়াতটা দিচ্ছে কে?

কেন, মাননীয় রজার অগাস্টিন সাহেব, জানাল আগন্তুক, আজ সন্ধ্যায় পার্টি, তার বাড়িতে। মনিবকে গিয়ে কী বলব আমি?

বলবে আমি যাব, চেঁচিয়ে উঠল হেরন। অবশ্যই হাজির থাকব পার্টিতে।

পাঁচ

ঠিক আছে বাচ্চারা, বলল স্কুল মাস্টার। আজকের মতো পড়া এখানেই শেষ। এখন তোমরা বাড়ি যেতে পার। ছুটি।

বাচ্চারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল অবাক দৃষ্টিতে। মাস্টার সাহেব কখনোই তাদেরকে এতো তাড়াতাড়ি ছুটি দেন না। বিরক্তিকর ক্লাসগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা স্কুলের বাইরে যেতে পারে না।

তবে আজ ব্যতিক্রম হলো। হঠাৎ ছুটি পেয়ে ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। তবে মাস্টার সাহেব আজ কারো বই গুছিয়ে দিলেন না। ওরা নিজেদের মতো হুড়োহুড়ি করে বইপত্র কোনোমতে ব্যাগে ঢুকিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়ল ক্লাস থেকে। মনের আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল বাড়ির দিকে।

হেরন পার্টিতে যাবার জন্য সেজেগুজে তৈরি হলো। আজ সে তার সবচেয়ে ভালো স্যুটটি পরেছে। আসলে স্যুট তার এই একটিই। ভাঙা একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্যুট পরতে এবং চুল আঁচড়াতেই পাক্কা আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। নিজেকে সে নাইট হিসেবে কল্পনা করছে। তাই সেজেগুজে না গেলে চলে?

আমার একটা ঘোড়া লাগবে, যে কৃষকের বাড়িতে লজিং থাকত তাকে বলল হেরন, আর একটা জিন অবশ্যই।

রডরিক রিপার নামের কৃষকটি সরু চোখে তাকাল হেরনের দিকে, আপনি বুলেটকে নিতে পারেন। তবে ওকে শক্ত হাতে সামাল দিতে হবে। কারণ ঘোড়াটা ভয়ানক দুষ্ট। মাথায় সবসময় কুবুদ্ধি গিজগিজ করছে। হেরন রিপারকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে সে খুব দক্ষ ঘোড়সওয়ার। যদিও জীবনে খুব কমই ঘোড়ার পিঠে চড়েছে হেরন। সে বুলেটের পিঠে চেপে বসল নতুন অভিযানে যাবার আনন্দ বুকে নিয়ে।

চলো হে, বুলেট, বলল সে। ঘোড়াটা বিষ দৃষ্টিতে, আড়চোখে দেখল স্কুল মাস্টারকে। তারপর ধীর পায়ে এগোল রাস্তা ধরে।

বুলেট প্রায় অচল একটা ঘোড়া। তার ঘাড়টা ছাগলের মতো, মাথাটা হাতুড়ির মতো। তার লেজে গেঁথে আছে অসংখ্য চোর কাটা, একটা চোখ আবার কানা। বুড়ো, অথর্ব দেখালে কী হবে ঘোড়াটা পাজির পা ঝাড়া।

সামনে চলো, তেজী ঘোড়া, বুলেটকে উৎসাহিত করার জন্য বলল হেরন।

ঘোড়া ও তার সওয়ারীকে জুটি হিসেবে মানিয়েছে ভালোই। হেরন ছোট রেকাব নিয়ে চলেছে, ফলে তার হাঁটু জোড়া ঠেকেছে জিনের মাথায়। হাড্ডিসার কনুই জোড়া লাগছে ফড়িংয়ের মতো। চাবুকটা বর্শার ঢঙে মাথার ওপরে উঁচিয়ে ধরা। ঘোড়া চলছে, হেরনের হাত জোড়া সেই সাথে ডানার মতো শরীরের দুপাশে ঝকি খাচ্ছে। ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে, সন্দেহ নেই।

শরতের চমৎকার সন্ধ্যা। বুনো হাঁসের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। পথ চলতে চলতে হেরন যথারীতি ভাবছে খাবারের কথা।

এ বছর কী চমৎকার আপেল ফলেছে, আপন মনে বিড়বিড় করছে। হেরন, এবারের কুমড়োগুলো দিয়েও দারুণ পাই বানানো যাবে।

কতগুলো মৌচাকের সামনে দিয়ে যাবার সময় ধোঁয়া ওঠা প্যান কেকের কথা মনে পড়তে জিভে জল এসে গেল তার। কল্পনায় দেখল জুলিয়া তার নরম হাত দিয়ে মধু ঢালছে কেকের উপরে।

রজার অগাস্টিনের খামারে যেতে হয় গাঁয়ের বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে। হাডসন নদীর শান্ত জলে পাশের জঙ্গলের কালো ছায়া। খামারে পৌঁছুতে পৌঁছুতে পাহাড়ের কোলে ডুব দিল সূর্য আকাশটাকে গোলাপী আর সোনালি রঙে রাঙিয়ে।

আপনার বাড়িতে খুব লোকজন দেখছি আজ, রজার অগাস্টিনকে উদ্দেশ্য করে বলল হেরন, মনে হচ্ছে শহরের সবাই হাজির হয়ে গেছে।

ভিড় তো থাকবেই, বললেন আমন্ত্রণকর্তা, যত ভিড় তত আনন্দ। সময়টাকে নিজের মতো করে উপভোগ করুন, মাস্টার সাহেব। পরে আমরা নাচ শুরু করব।

হেরন চারদিকে তাকাতে লাগল। তেলতেলে মুখের চাষারাও দাওয়াত পেয়েছে। তারা বাড়িতে তৈরি কোট আর বিরাট মাপের জুতো পরে এসেছে। এদের স্ত্রীদের সাজসজ্জা একেবারেই সাধারণ এবং অতি পুরানো ফ্যাশনের। রঙ বেরঙের ফিতে দিয়ে চুল বিনুনি করেছে তরুণীরা, মাথায় চাপিয়েছে খড়ের টুপি। ছেলেরা পনিটেল স্টাইলে মাথার পেছনে ঝুঁটি করে বেঁধেছে চুল। ওই সময় এ ফ্যাশনই চলত।

ওই যে রোমিও ফার্নান্দেজ আসছে! কেউ একজন বলল চেঁচিয়ে। পার্টির অভ্যাগতদের বেশিরভাগের মাথা ঘুরে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে। খটখট শব্দ তুলে প্রিয় ঘোড়া ডেয়ার ডেভিলের পিঠে সওয়ার রোমিও ফার্নান্দেজ ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল খামারবাড়িতে। তার ঘোড়াটা আস্তে চলতেই জানে না। দুরন্তগতি বলেই তাকে পছন্দ করে রোমিও। হেরন অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না। তার নজর তখন অন্য দিকে। না, পার্টির সুন্দরী মেয়েরা দৃষ্টি কাড়েনি হেরনের। সে লোভাতুর চোখে দেখছে টেবিল বোঝাই খাবার।

বড় বড় থালা বোঝাই কেক। আরো রয়েছে ডোনাট, মিষ্টি পিঠা এবং রুটি। আর রোস্ট, চপের অভাব নেই। দারুণ সুগন্ধ ছড়াচ্ছে খাবারগুলো। জিভে আসা জল বারবার গিলে ফেলছে হেরন।

নিন, মাস্টার সাহেব, জুলিয়ার মা এসে দাঁড়ালেন হেরনের পাশে। যত ইচ্ছা নিন। লজ্জা করবেন না।

কীভাবে, কোনটা দিয়ে যে শুরু করব বুঝতে পারছি না, মনে মনে বলল হেরন। সবগুলো খাবারই দারুণ। আপেল পাই নেব, রোস্ট নাকি চপ দিয়ে শুরু করব? শেষে ঠিক করল প্রতিটি খাবারই সে চেখে দেখবে। প্লেট বোঝাই করে ফেলল চপ, গরুর

মাংস, মুরগির রোস্ট, আগুনে ঝলসানো মাছ, কেক আর পাই দিয়ে। টেবিলের প্রতিটি প্লেট থেকে কিছু না কিছু খাবার নিজের প্লেটে তুলল সে।

দারুণ সুস্বাদু! বলল সে, আরেক গ্রাস পুরে নিল মুখে। চিবুচ্ছে। খাওয়ার মতো আনন্দ সে অন্য কিছুতে পায় না। খেতে খেতে চোখের মণি ঘোরাতে লাগল সে, খুব মজা পাচ্ছে এ তারই অভিব্যক্তির প্রকাশ।

একদিন, ভাবল হেরন, এসব কিছুই আমার হবে। আমি এ বাড়ির মালিক হব। তখন আর মাস্টারি করতে হবে না।

সবাই খেয়ে নিন, ঘোষণার সুরে বললেন বুড়ো বালটুস রজার অগাস্টিন, এরপরে শুরু হবে আমাদের নৃত্যপর্ব।

নাচের সময় বেহালা বাজাল ধূসর চুলো এক বুড়ো। এ এলাকায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়ে আসছে সে। পুরানো, জীর্ণ বেহালা বাজানোর সময় বাজনার তালে তার মাথা দুলতে থাকে। নতুন কোনো জুটি নাচ করতে সে পা ঠুকে উৎসাহ দেয়।

আমার সঙ্গে নাচবে? হেরন দুরু দুরু বুকে প্রস্তাব দিল জুলিয়াকে। উত্তেজনায় আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছে। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে জবাবের জন্য।

অবশ্যই। জবাব দিল জুলিয়া। হেরন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

হেরনের ধারণা সে গানের মতোই সুন্দর নাচতে পারে। নাচার সময় তার হাত আর পা কাঁপতে লাগল, মাথা আর নিতম্ব দুলতে লাগল বাজনার তালে। হাড্ডিসার শরীরটা ঘরের মধ্যে ঘূর্ণির মতো ঘুরছে, যেন এখনই ফিট হয়ে যাবে হেরন।

আজ রাতে সে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে নাচার সুযোগ পেয়েছে। এতো আনন্দ কোথায় রাখে হেরন। চোখের মণি ঘোরাচ্ছে সে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে। জুলিয়া জবাবে মিষ্টি হাসল, পিটপিট করল চোখ।

হেরন জুলিয়াকে নিয়ে নাচছে, সে দৃশ্য ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে দেখছে রোমিও ফার্নান্দেজ। হিংসায় বুক জ্বলে যাচ্ছে তার। নৃত্যরত জুটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে। হেরন এবং জুলিয়ার নাচের গতি যত উদ্দাম হয়ে উঠল, বুকের ভেতরে ঈর্ষার আগুনটা ততই ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল রোমিও ফার্নান্দেজের।

ছয়

নাচ শেষ হলে হেরন রজার অগাস্টিনসহ কয়েকজন বুড়োর সঙ্গে মিলিত আড্ডায়। তারা সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে গল্প করছেন। কয়েক বছর আগের সেই যুদ্ধে কে কী করেছেন তা নিয়ে স্মৃতিচারণ করছেন বুড়োরা।

আমি একাই একটা ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন প্রায় উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, ঊট দেখালেন এক বুড়ো। কিন্তু কামানটা হঠাৎ বিগড়ে গেল বলে আর পারলাম না।

আমি আমার তরবারি দিয়ে মাস্কেট বন্দুকের গুলি ফিরিয়ে দিয়েছি, গপ্পো ঝাড়লেন আরেকজন। তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন অন্যরা। বুড়ো রেগে মেগে বললেন এর প্রমাণ দেখাবেন। গুলির আঘাতে ছিদ্র হওয়া তরবারিটি তাঁর কাছে আছে।

বুড়োরা সবাই নিজেদের যুদ্ধের হিরো বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। তবে এ আড্ডা হঠাৎ করেই মোড় নিল ভূতের গল্পে। পাদ্রিশিবপুরের আশপাশে যারা থাকে মূলত তারাই এ গল্পের বক্তা, অন্যরা শ্রোতা। তবে সবাই জানে ওই এলাকায় অদ্ভুত, রোমহর্ষক ঘটনা ঘটছে।

সাদা পোশাক পরা এক মহিলাকে আপনারা কখনো কেউ দেখেছেন? জিজ্ঞেস করলেন এক বুড়ো। স্লিপিহলোর কাছে গোরস্তানে ঘুরে বেড়ায় সে। শীতের রাতে তার বিকট গলার চিৎকার শোনা যায় কখনো কখনো। তার মানে খারাপ একটা আবহাওয়া আসছে।

তারই পূর্বাভাস ওই চিৎকার। বছর কয়েক আগে ঝড়ের কবলে পড়ে মারা গেছে মহিলা।

আপনার সাদা পোশাক পরা মহিলাকে আমি দেখিনি, পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন এক বুড়ো, তবে মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ারকে দেখেছি।

আমিও, সায় দিলেন আরেকজন, পুরানো গির্জার পাশ দিয়ে মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছি।

বুড়ো ডি সুজার কী হয়েছিল জানেন? প্রশ্ন করলেন রজার অগাস্টিন।

তাঁর বুড়ো বন্ধুরা ডানে-বামে মাথা নাড়লেন। জানেন না কেউ।

সে এসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করত না। এক রাতে জলার ধারের রাস্তা ধরে সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। জলার ধারের গাছপালা এমন ঘন, সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না বলে দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে ওদিকটাতে। মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার তাকে তাড়া করে। ডি সুজা প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে, ঝর্ণার ওপরের সেতুতে। দেখে ঘোড়সওয়ার একটা কঙ্কাল হয়ে গেছে, বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ তুলে সে গাছের ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। ডি সুজার কাটা মাথাটা গড়িয়ে পড়ে ঝর্ণার জলে। নতুন এ গল্পটি কেউ

শোনেনি। সবাই বলাবলি করল ভূত-প্রেতে বিশ্বাস থাকলে ডি সুজাকে এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হতো না।

বোকা, মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, ভেসে এল একটি কণ্ঠ। ফিরে তাকালেন সবাই। রোমিও ফার্নান্দেজ।

সেই রাতে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরছি আমি, এমন সময় দেখতে পাই তাকে, বলে চলল সে, তাকে ঘোড় দৌড়ের প্রস্তাব দিই, বাজি ধরি আমার সঙ্গে দৌড়ে সে পারবে না। ডেয়ার ডেভিলের ওপরে বিশ্বাস ছিল আমার। ওর সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় জীবিত বা মৃত কোনো ঘোড়াই পারবে না। কিন্তু ওই সেতুর ওপরে যাবার পরে মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার হাল ছেড়ে দিল। আগুনের একটা গোল্লা তৈরি করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেরন গল্প শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল। সেও নিজের দুএকটি অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। জানাল স্লিপিহলোর রাস্তা ধরে হাঁটার সময় কী রকম অনুভূতি তার হয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে গেল পার্টি। এবার বাড়ি ফেরার পালা। চাষারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে উঠে পড়ল যে যার ঘোড়ার গাড়িতে। রওনা হয়ে গেল বাড়ি অভিমুখে। কয়েকটি মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল তাদের প্রেমিকরা। কৃষকদের গাড়ির চাকার আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে এলো, প্রেমিক-প্রেমিকাদের হাসির উচ্চকিত শব্দও এক সময় ক্ষীণ হয়ে এল। তারপর নেমে এল নৈশব্দ। নিঝুম হয়ে গেল

খামারবাড়ি। সবার শেষে বিদায় নিল হেরন। জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলার লোভে সে লক্ষ করেনি অনেক রাত হয়ে গেছে। তার ধারণা সে মেয়েটির হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

জুলিয়া হেরনকে কী বলেছে কে জানে, তবে দুঃসংবাদই হবে বোধহয়, কারণ খামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে খুবই করুণ চেহারা নিয়ে।

অস্থিরমতি জুলিয়া কি সারাটা সন্ধ্যা তাহলে তার সঙ্গে খেলা করেছে? রোমিও ফার্নান্দেজকে ঈর্ষান্বিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই কি সারাক্ষণ হেরনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেছে? ঈশ্বর জানেন এসব প্রশ্নের জবাব।

তবে জুলিয়া হেরনকে যে কোনো আনন্দ সংবাদ দেয়নি তা তার অন্ধকার, শুকনো মুখ দেখলে যে কেউ বলে দিতে পারত। সে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল গোলাঘরের দিকে, নিজের ঘোড়ার খোঁজে। বুলেট তখন ঘতর ঘতর নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

বিমর্ষ, দুঃখী হেরন যখন বাড়ির পথ ধরল, রাত তখন অনেক। সন্ধ্যা বেলায় যে প্রকৃতিকে দেখে বুকে খুশির দোলা লেগেছিল হেরনের, অন্ধকার সেই প্রকৃতি এখন গ্রাস করেছে। স্থির রাত। নদীর ওপার থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক শোনা গেল পরিষ্কার। আর তক্ষুণি রাজ্যের ভূত-প্রেতের গল্প ভিড় করে এল হেরনের স্মৃতিতে।

সর্বনাশ, এত রাত হয়েছে বুঝতেই পারিনি! আঁতকে উঠল হেরন। ঠিক তখনি প্রকাণ্ড, কালো একখণ্ড মেঘ ঢেকে দিল চাঁদ, গাঢ় করে তুলল আঁধার।

হেরন চলেছে গ্রামের সবচেয়ে অন্ধকার আর সুনসান অংশের দিকে। এক লোককে রাস্তার ধারে বড় একটা গাছে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। লোকটার আত্মা নাকি ওখানে ঘুরে বেড়ায়। সেই গাছের দিকেই এগোচ্ছে হেরন, বুক। শুকিয়ে কাঠ। মনে সাহস আনতে শিস বাজাল সে। তার শিস বাজানো শেষ হওয়া মাত্র কে যেন প্রত্যুত্তরে বাজাল শিস!

না, কেউ শিস বাজায়নি, মনকে প্রবোধ দিল হেরন। ওটা গাছের ডালে বাড়ি খাওয়া বাতাসের শব্দ। গাছের ডালে বাড়ি খেলে বাতাসে শিসের শব্দ ওঠে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো সেই বড় গাছটার নিচে সাদা কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার সামনে আসতে দেখল একটা গুঁড়ি পড়ে আছে। বজ্রপাতে দুভাগ হয়ে গিয়েছিল ওটা। চাঁদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে। বুকে। একটু সাহস পেল হেরন।

পরক্ষণে দারুণ চমকে উঠল গোঙানির শব্দে। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল হেরনের। নাহ্, খামোকাই ভয় পেয়েছে সে। দুটো ডালে বাতাসের বাড়ি লেগে অমন শব্দ হয়েছে। হেরন বড় গাছটা পার হয়ে গেল ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে। ঘটল না কিছুই।

সামনের রাস্তাটা আরো অন্ধকার, আরো গা ছমছমে। ছোট একটা নালা পার হয়ে যেতে হবে তাকে। লোকে বলে নালা বা খালটা ভুতুড়ে। সন্ধ্যার পরে কেউ এদিকে আসার সাহস পায় না। ওদিকে এগোচ্ছে হেরন, পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খেতে লাগল হৃদপিন্ড।

চলো, বুলেট, বলল সে ঘোড়াকে, জলদি চলো।

ঘোড়ার পাঁজরে লাথি কষাল হেরন তাকে জোরে ছুটতে ইঙ্গিত করে । কিন্তু বদমাশ ঘোড়া তার সওয়ারীর কথা মতো কাজ করল না, উল্টো রাস্তার পাশের একটা বেড়ার গায়ে আছড়ে পড়ল। তারপর বৈচি ফলের একটা ঝোঁপের দিকে ছুটল।

ঘোড়াটাকে বহু কষ্টে নালার কাছে নিয়ে এল হেরন। অকুস্থলে পৌঁছামাত্র ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল বুলেট। ঝাঁকুনির চোটে আরেকটু হলে ঘোড়ার পিঠ থেকে চিটকে পড়ে যাচ্ছিল হেরন।

কোনো মতে সুস্থির হয়ে জিনে বসেছে সে, কানে ভেসে এল একটা শব্দ। অন্ধকারে উঁকি দিল একটা ঝোঁপের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা কালো প্রকাণ্ড এক ছায়ামূর্তি। মূর্তিটি কে বা কী ধারণায় কুলালো না হেরনের। তবে এটুকু বুঝতে পারল দানব আকৃতিটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

সাত

প্রকাণ্ড এক কালো ছায়ামূর্তি দেখে ভয়ের চোটে হেরনের ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। এখন আর ছুটে পালাবার উপায় নেই। কী করবে সে?

ক্কে-কে তুমি? তোতলাচ্ছে হেরন।

জবাব দিল না ছায়ামূর্তি।

কে ওখানে? আবার কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল হেরন।

কোনো জবাব এল না। বুলেটের পাঁজরে লাথি কষাল হেরন। কিন্তু একগুঁয়ে ঘোড়াটা নড়ল না একচুল। চোখ বুজল হেরন, কর্কশ গলায় ধরল প্রার্থনা সংগীত।

একটা বিকট শব্দ হতে চোখ মেলে চাইল হেরন। রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে ছায়ামূর্তি। অন্ধকারেও হেরন বুঝতে পারল ঘোড়সওয়ার প্রকাণ্ডদেহী এবং তার বাহনটিও আকারে বিশাল। ছুটে আসতে শুরু করল সে স্কুল মাস্টারের দিকে।

জলদি ভাগ, বুলেট, অনুনয় করল হেরন। এতক্ষণে বুঝি দয়া হয়েছে বুলেটের, কিংবা ভয়ও পেতে পারে। ছুটল সে। পেছন পেছন কালো ঘোড়া।

হেরন ঘোড়ার গতি কমাল অনুসরণকারী তা পাশ কাটিয়ে যাবে সে আশায়। কিন্তু পেছনের জনের কোনো তাড়া নেই। সেও মন্থর করল গতি। হেরন আবার প্রার্থনা সংগীত গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখের ভেতরটা এমন শুকিয়ে গেছে কোনো আওয়াজ বেরুল না গলা থেকে। পেছনের ছায়ামূর্তি কোনো শব্দ করছে না, এটাই সবচেয়ে ভীত করে তুলেছে হেরনকে। ওটা নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে হেরনকে। তার চলার মধ্যে রয়েছে রহস্য আর অশুভ ইঙ্গিত।

ওরা ছোট একটা টিলায় উঠে এলো। পেছন ফিরে তাকাল হেরন। অনুসরণকারীকে এবার আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আকাশের পটভূমিকায় যেন ফুটে আছে তার আকৃতি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। হেরনের। দেখে ঘোড়সওয়ারের ধড়ের ওপর মুণ্ডু নেই! আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কাটা মুভুটা হাতে ঝুলিয়ে রেখেছে সে!

হেরন প্রচণ্ড জোরে লাথি কষাল বুলেটের পেটে। জোরে ছুটতে বলছে। আরোহীর ভয় সংক্রামিত হলো ঘোড়ার মধ্যেও। জানবাজি রেখে ছুটল সে। কিন্তু অশরীরীও তীব্র বেগে ছুটে আসতে লাগল। বাতাসের বেগে ছুটছে দুটি ঘোড়াই, খুরের আঘাতে ছিটকে যাচ্ছে পাথর আর মাটির ঢেলা। খুরের লোহার নলে লেগে জ্বলে উঠছে স্ফুলিঙ্গ।

পাগলের মতো ছুটছিল বলে হেরনের খেয়াল ছিল না কোথায় বা কোনদিকে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেল বুলেট তাকে সেই কুখ্যাত সেতুর কাছে নিয়ে এসেছে যেটা ভূত-

প্রেতের রাজ্য বলে জানে সবাই। বড় একটা টিলার ওপরে সেতুটা, এখানেই রয়েছে সেই পুরানো গির্জা। লোকে বলে মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ারকে এই গির্জার গোরস্তানে কবর দেয়া হয়েছে!

তীব্র আতঙ্কে ছুটছে বুলেট, ভয়ঙ্কর জিনিসটার কাছ থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে পেরেছে কিছুটা। আর ঠিক তখন হেরন টের পেল তার ঘোড়ার জিন আটকানোর বেল্টটি আলগা হয়ে গেছে!

হেরন চেষ্টা করল বেল্ট ধরতে, কিন্তু খুলে গেল ওটা, খসে পড়ল জিন। ভৌতিক ঘোড়া ওটাকে মাড়িয়ে দিল পা দিয়ে। জিন খুইয়েছি দেখলে রডরিক রিপার আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে! হায় হায় করে উঠল হেরন।

তবে জিন হারানোর চেয়েও গুরুতর সমস্যা তার সামনে। কারণ জিন ছাড়া ঘোড়ার পিঠে মোটেই সুস্থির হয়ে বসতে পারছিল না হেরন। একবার ডানে, আরেকবার বামে ঝাঁকুনির চোটে ছিটকে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এমন জোরে ঝাঁকুনি লাগছিল, হেরনের মনে হচ্ছিল শরীরের হাড়গোড় বুঝি একখানাও আস্ত থাকবে না।

কিন্তু সামনে কী ওটা? নদীর বুকে ঝলমল করছে তারা! টিলার ওপরে একটা গির্জা দেখতে পেল হেরন। তারপর চোখে পড়ল একটা সেতু। হেরনের মনে পড়ল ওই সেতুর কাছে এলেই অদৃশ্য হয়ে যায় মুন্ডুহীন প্রেত।

ওখানে পৌঁছুতে পারলেই আমি বেঁচে যাব প্রাণে, ভাবল হেরন। ঠিক তখন শুনতে পেল তার পেছনে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মস্ত কালো ঘোড়াটা। মনে হলো ঘোড়াটার গরম নিঃশ্বাস তার গায়ে লাগছে।

যাও, বুলেট, যাও। চেঁচিয়ে উঠল সে। হাড় জিরজিরে ঘোড়াটাকে আবার লাথি মারল।

লাফ মেরে সেতুতে উঠে পড়ল বুলেট। কাঠের তক্তায় ঘোড়ার খুরের প্রবল শব্দ উঠল। বিপরীত দিকে চলে এলো হেরন, তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। আশা করল এখনই দেখবে অগ্নিঝলক তুলে গায়েব হয়ে গেছে ঘোড়সওয়ার।

কিন্তু দেখল পিশাচটা তার রেকাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মাথাটা ছুঁড়ে মারল হেরনকে লক্ষ্য করে। হেরন ছুটে আসা মিসাইলটাকে ফাঁকি দিতে চাইল। কিন্তু পারল না। ভয়াবহ গতিতে ছুটে এল ওটা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল হেরনের খুলিতে! ঘোড়ার পিঠ থেকে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল হেরন। বুলেট, কালো ঘোড়া আর পিশাচ বাতাসে ঘূর্ণি তুলে চলে গেল তার পাশ কাটিয়ে।

আট

পরদিন বুড়ো বুলেটকে দেখা গেল তার মনিবের বাড়ির ফটকের বাইরে ঘাস চিবোচ্ছে। পিঠে জিন নেই। নাস্তার টেবিলে দেখা গেল না হেরনকে। দুপুরের খাওয়ার সময়েও তার খবর নেই। বাচ্চারা স্কুলে এলো। কিন্তু অনুপস্থিত তাদের মাস্টার।

রাফায়েল হেরনের হলোটা কী? অবাক রডরিক রিপার। আর আমার ঘোড়ার জিনই বা কোথায়?

প্রতিবেশীকে নিয়ে হেরনকে খুঁজতে বেরুল রিপার। ময়লা আবর্জনার মধ্যে বুলেটের স্যাডলের দেখা মিলল। ঘোড়ার খুরের ছাপ লক্ষ করে ওরা গির্জার ধারের সেতুতে চলে এল। ঝর্ণা বা জলাধারাটির তীরে পেয়ে গেল হেরনের টুপি। ওটার পাশে ছিটিয়ে আছে কয়েক টুকরো কুমড়ো। জলধারার আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজল দুই কৃষক। সন্ধান মিলল না হেরনের।

হেরনের ঘর খুঁজে অল্প কিছু জিনিস পাওয়া গেল। কয়েকটি জামা, একটা জং ধরা রেজার, খান কয়েক বই। একটি বইয়ের পেছনের পাতায় হেরন কবিতা লিখেছে জুলিয়াকে নিয়ে। রডরিক রিপার কবিতাসহ অন্যান্য বইপত্রগুলো পুড়িয়ে ফেলল।

আমি আর জীবনেও আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাব না, সিদ্ধান্ত নিল সে, লেখাপড়া শিখে কোনো লাভ নেই।

রোববারে গির্জায় সবাই রাফায়েল হেরনের রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যাবার ব্যাপারটি নিয়ে গল্পে মেতে উঠল। অনেকেই গেল সেতুর ধারে যেখানে টুপি আর কুমড়ো দেখে এসেছে রিপার। নানাজনে নানা গল্প ফাঁদল। তবে শেষে সবাই একমত হলো, হেরনকে মুন্ডুহীন ঘোড়সওয়ার ধরে নিয়ে গেছে।

.

এরপরে আর কেউ হেরনের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে কথা বলার সাহস পেল । গ্রামবাসী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল স্কুল, নিয়োগ করল নতুন শিক্ষক।

অনেক বছর পরে, বুড়ো এক কৃষক এসে বলতে লাগল বেঁচে আছে। রাফায়েল হেরন। সে দেশের দূরের এক অঞ্চলে চলে গেছে, ওখানে আরেকটা স্কুলে মাস্টারি করছে। হেরন নাকি আইন পড়েছিল, পরে সে আইনজীবীর পেশা বেছে নেয়, পত্রিকায় লেখালেখিও করে এক সময়ে, এক পর্যায়ে বিচারপতির পদেও তাকে বসানো হয়েছিল।

রাফায়েল হেরন নিখোঁজ হবার কিছুদিন পরে রোমিও ফার্নান্দেজ বিয়ে করে সুন্দরী জুলিয়াকে। তার হাবভাবে মনে হচ্ছিল হেরনের অদৃশ্য হয়ে যাবার আসল কারণ সম্ভবত সে জানে। কেউ টুকরো হয়ে যাওয়া কুমড়োর কথা বললেই সে হাসিতে ফেটে পড়ত।

তবে বুড়ো চাষাদের স্ত্রীরা দাবি করত তারা নাকি জানে আসল ব্যাপারটা। তারা নিশ্চিত ছিল হেরনকে কোনো মন্দ আত্মা ধরে নিয়ে গেছে। শীতের রাতে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে, অগ্নিকুণ্ডের সামনে গোল হয়ে বসে রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলত তারা।

পরিত্যক্ত স্কুল বাড়িতে–বলত তারা, হেরনের আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায়। গ্রীষ্মের রাতে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে শোনা যাবে করুণ সুরের প্রার্থনা সংগীত, গানটা প্রতিধ্বনি তুলে ভেঙে দেয় স্লিপিহলোর সুনসান নীরবতা।

–রাডিয়ার্ড কিপলিং

সাত

সত্যি তো, সেদিন ট্রেনে আমি কাকে দেখেছিলাম? এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। তাই প্রশ্নটার কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। শুধু জানি সেদিন ট্রেনের কামরায় যিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন তাঁর চেহারা অবিকল মি. ডুয়েরিং হাউসের মতো। অবশ্য নিহত মি. ডুয়েরিং হাউসের মৃতদেহটা তখন পড়েছিল একটা পরিত্যক্ত খড়ির খাদের মধ্যে–গাছের শুকনো ডালপালা আর পচা পাতার তলায়। পড়েছিল দশ সপ্তাহ ধরে। জায়গাটা ব্ল্যাকওয়াটার আর ম্যালিংফোর্ডের মাঝামাঝি। মি. ডুয়েরিং হাউস বেঁচে থাকতে যেভাবে কথাবার্তা বলতেন, যে ভঙ্গীতে চলাফেরা করতেন আমার সহযাত্রী ঠিক তেমনিই করেছিলেন। তাঁর চেহারারও অবিকল মি. ডুয়েরিং হাউসের মতো। সহযাত্রীর কাছ থেকে আমি যেসব কথাবার্তা শুনেছিলাম, তা অন্য কোনভাবে আমার জানার সম্ভাবনা নেই। মনে হয় হত্যাকারীকে যাতে আমি সনাক্ত করতে পারি সেজন্য মি. ডুয়েরিং হাউসের বিদেহী আত্মা আমাকে চালনা করে নামিয়েছিল জংশন স্টেশনের প্লাটফরমে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য, হত্যাকারী যাতে আইনের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য বিদেহী আত্মা দেহ ধারণ করেছিল কিছু সময়ের জন্য, সেই স্টেশনে আমি দেখেছিলাম অতীতের ছায়া, গ্যাস পোস্টের নিচেই রাইকসের সঙ্গে মি. ডুয়েরিং হাউসের দেখা হয়েছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা কথা বলেছিলেন কিছুক্ষণ, অপঘাতে মৃত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মা অতীতের সেই দৃশ্যটাই তুলে ধরেছিল আমার চোখের সামনে। যন্ত্রী আত্মা যন্ত্রের মতো ব্যবহার করেছে আমাকে। আমাকে দিয়েই সে লোকচক্ষুর সামনে প্রকৃত ব্যাপারটা তুলে ধরতে চেয়েছে এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা আছে এই রহস্যময় ব্যাপারের?

সিগারকেসের রহস্যের সমাধান হলো। অনুসন্ধানে জানা গেল আমি যে কামরায় উঠেছিলাম, সে কামরাটি কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করা হয়নি। আর এই কামরাতেই হতভাগ্য মি. ডুয়েরিং হাউস তাঁর শেষ যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। সিগারকেসটাকে তিনিই কামরায় ফেলে গিয়েছিলেন। আমি পাবার আগে কেউ-ই কেসটা লক্ষ করেনি। কামরাতেই পড়ে ছিল ওটা।

এখানে হত্যার বিস্তৃত বিবরণ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। যারা খুঁটিনাটি জানতে চান তারা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের টাইমস পত্রিকার পুরানো ফাইল এবং ওই পত্রিকায় প্রকাশিত অগাস্টাস রাইকসের স্বীকারোক্তি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে কোম্পানির একজন আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে রাইকস নতুন লাইন পাতা সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবরই রাখত। মি. ডুয়েরিং হাউস যে সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে যাবেন এ সংবাদটাও তার অজানা নয়। রাইকস ঠিক করেছিল মি. ডুয়েরিং হাউসকে ভুলিয়ে কোনো নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবে। রাইকস কোম্পানির একজন অফিসার, কাজেই তার সম্পর্কে মি. ডুয়েরিং হাউসের মনে কোনো সন্দেহই জাগবে না। নির্জন জায়গায় গিয়ে রাইকস মি. ডুয়েরিং হাউসের কাছ থেকে সত্তর হাজার পাউন্ড জোর করে ছিনিয়ে নেবে। তারপর অপহৃত সম্পদ নিয়ে নিজে পাড়ি দেবে আমেরিকায়। এদেশের পুলিশ কোনদিন ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। সে থাকবে ব্রিটিশ পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মি. ডুয়েরিং হাউস টাকা নিয়ে যাবার কদিন আগেই রাইকস ছুটি নেয়। ২৩ তারিখে আমেরিকাগামী একটি জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল। সেই জাহাজেই একটা সিট বুক করে সে। জাহাজের একজন খালাসীর কাছ থেকে একটা কার্তুজভরা রিভলবার সংগ্রহ করে ব্ল্যাকওয়াটার জংশনে অপেক্ষা করতে থাকে তার শিকারের জন্য।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে মি. ডুয়েরিং হাউস ট্রেন থেকে নামলেন। রাইকসের সঙ্গে দেখা হলো প্লাটফরমে- একটা গ্যাস পোস্টের কাছাকাছি। রাইকস বলল সে বোর্ডের কাছ থেকে একটা জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছে। মি. ডুয়েরিং হাউস তাকে চিনতেন, কিন্তু সে যে ছুটিতে রয়েছে তা বোধহয় তিনি জানতেন না আর জানলেই বা ওকে সন্দেহ করবেন কীভাবে? রাইকস তো রেল কোম্পানিরই একজন পদস্থ কর্মচারী।

রাইকস বলে সে ম্যালিংফোর্ডের মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা পথে মি. ডুয়েরিং হাউসকে তার গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। ডিরেক্টর সাহেব সরল বিশ্বাসে চললেন আন্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে। তাঁকে নির্জন জায়গায় নিয়ে এসে রাইকস অতর্কিতে তার মাথায় রিভলবারের নল দিয়ে আঘাত করে। এরকম আচমকা আঘাতের জন্য তৈরি ছিলেন না মি. ডুয়েরিং হাউস। টু শব্দটি না করে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাইকস হয়তো নরহত্যা করতে চায়নি। সে বোধহয় মি. ডুয়েরিং হাউসকে অজ্ঞান করে টাকার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন সে দেখল ডিরেক্টর মারা গেছেন, তখন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সে পোড় খাওয়া অপরাধী নয়। মৃতদেহটাকে সে টেনে নিয়ে গেল একটা খড়ি পাহাড়ের খাদের কাছে। জায়গাটা নির্জন–লোক চলাচলের পথ থেকে অনেক দূরে।

দেহটাকে খাদে ফেলে দিয়ে শুকনো ডালাপালা আর পাতা দিয়ে লাশটাকে ঢেকে দিল রাইকস। এসব কথা আজও অনেক লোকের স্মৃতিতে সজীব হয়ে রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, অপরাধ করার পরও অপরাধী এদেশ ছেড়ে যেতে সাহস করল না। স্বীকারোক্তিতে সে বলেছিল যে মি. দুয়েরিং হাউসকে খুন করার পরিকল্পনা তার ছিল না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাকে অজ্ঞান করে টাকার ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু আঘাত করার ফলে মি. ডুয়েরিং হাউসের মৃত্যু হওয়ায় রাইকস ঘাবড়ে গেল। সে ভাবল এখন পালিয়ে গেলে সমস্ত সন্দেহ এসে পড়বে তারই ওপর। নিছক ছিনতাইকারী হলে সে আমেরিকায় নিরাপদেই থাকত! কেন না তাকে নিয়ে দেশে কিছুদিন হৈচৈ হলেও তা ক্রমে ঝিমিয়ে পড়ত। কিন্তু সে যে নরহত্যা করে ফেলেছে। এখন দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েও তার নিস্তার নেই। পুলিশ দেশ বিদেশে তার খোঁজ খবর করবে। এক সময় তাকে গ্রেপ্তার করে হাজির করবে আদালতে। বিচারে নরহত্যার দায়ে তার হবে চরমদন্ড।

তাই আমেরিকাগামী জাহাজের টিকিট বাতিল করে দিয়ে ছুটি ফুরালেই রাইকস কাজে যোগ দিল। অন্যায়ভাবে পাওয়া সত্তর হাজার পাউন্ড সে লুকিয়ে রাখল। পরে সুযোগ এলে সে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভোগ করবে। ইতিমধ্যে সে শুনল মি. ডুয়েরিং হাউস নাকি রেল কোম্পানির সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। দোষটা ডিরেক্টরের ওপর পড়েছে শুনে রাইকস নিশ্চিন্ত হলো। সে ভাবতেই পারেনি এক অদ্ভুত অলৌকিক উপায়ে তার অপরাধ একদিন প্রকাশ হয়ে যাবে।

আট

রাইকস হত্যা করতে চেয়েছিল কি চায়নি এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? কিন্তু অপরাধের জন্য পুরো মূল্য দিতে হলো তাকে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওল্ড বেইলিতে তার ফাঁসি হলো।

যারা তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান তারা তাকে আজও যে কোনদিন দেখতে পারেন। না ঠিক তাকে নয়, তার মোমের তৈরি মূর্তিকে। মূর্তিটা যেন জীবন্ত। বেকার স্ট্রিটে মাদাম তুসোর প্রদর্শনীশালার একটি ঘরে নাম আতঙ্কের ঘর –আজও রাইকসের মোমের তৈরি মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। সে ঘরে রাইকসের মূর্তি নিঃসঙ্গ নয়। কয়েকজন বাছাই করা হত্যাকারীর সঙ্গে তার মূর্তি রয়েছে সেখানে। রাইকসের মূর্তির পরনে আঁটোসাঁটো টুইড সুট। এরকম একটা সুটই সে হত্যার দিন পড়েছিল। মূর্তির হাতে রিভলবার। এরকম একটা রিভলবার দিয়েই সে নরহত্যার মতো মহা অপরাধ করেছিল।

–লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা

হ্যারল্ড পারকিটের নিজের লন বা বাগান নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না। লনের ঘাস কাটার জন্য পাঁচ ডলার দিয়ে সে একটি ছেলে রেখেছিল। লনমোয়ার বা ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে ছেলেটি চমৎকার ঘাস কাটত। কিন্তু গত বছরে, অক্টোবরের মাঝামাঝিতে ঘটে গেল মারাত্মক এক দুর্ঘটনা। লনের ঘাস কাটার সেটা ছিল শেষ ঋতু। ঘাস কাটার যন্ত্র দিয়ে ঘাস কাটা হচ্ছে, এমন সময় কোত্থেকে প্রতিবেশী কাস্টনমেয়ারদের কুকুরটা ধাওয়া করে নিয়ে এল স্মিথদের বেড়ালটাকে। দিশেহারা বেড়াল তাল সামলাতে না পেরে, ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঘাস কাটা যন্ত্রের নিচে। মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল জানোয়ারটার শরীর।

ভয়াবহ এ দৃশ্য দেখে হারল্ডের মেয়ে এলিসিয়া এমন জোরে লাফিয়ে উঠল, হাতের আইসক্রিম ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল নতুন জাম্পারটা। তবে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো হারল্ডের বউ কার্লার। রক্ত সে এমনিতেই সইতে পারে না, চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা প্রাণীকে যন্ত্রের নিচে পড়ে কচুকাটা হতে দেখে দাঁত কপাটি লেগে গেল তার। অজ্ঞান হয়ে পড়ল কার্লা।

লনের ঘাস কাটা মাথায় উঠল হারল্ডের। বউকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। ওই বছর আর ঘাস কাটা হলো না। পরের বছর, জুলাইর মাঝামাঝিতে লনের ঘাস এমন বড় হয়ে উঠল যেন একটা জঙ্গল। ওই জঙ্গলে সুযোগ পেলেই লুকিয়ে পড়ল ডন স্মিথের চার

বছরের মেয়ে জেনি, যখনই তাকে সকালের নাস্তায় দুধ কিংবা দুপুরে স্পিনাচ খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করা হলো।

জুলাইর শেষের দিকে একদিন, বারান্দায় বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছে হারল্ড, নজর আটকে গেল পাস্ট টাইম কলামে। ওখানে লেখা : বাগানের ঘাস কাটা হয়। ন্যায়সঙ্গত দামে। ৭৭৬-২৩৯০।

হ্যারল্ড ফোন করল এ নাম্বারে। ভেবেছিল আবেগশূন্য গলার কোনো মহিলার গলা শুনবে, চেঁচিয়ে ডাকছে তার ছেলেকে। বদলে ভেসে এল প্রাণবন্ত, পেশাদার একটি কণ্ঠ, প্যাস্টোরাল গ্রিনারি অ্যান্ড আউটডোর সার্ভিসেস... আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি?

হ্যারল্ড ফোন রেখে দিল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। বারান্দায় গিয়ে বসল। রেডিও ছেড়ে তাকিয়ে রইল লনের দিকে। কার্লা মেয়েকে নিয়ে তার মার বাসায় গেছে। বাড়িতে একা হারল্ড। মা-মেয়ে ফিরে আসার আগে প্যাস্টোরাল গ্রিনারির লোকটা এসে লন সাফ করে দিয়ে গেলে বেশ হয়।

বিয়ারের ক্যান খুলল হারল্ড। পান করল। ছুঁড়ে ফেলে দিল ক্যান। লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে তাকিয়ে রইল অলস চোখে। ঝিমুনি এসে গেল ওর।

আধঘণ্টা পর ডোর বেলের শব্দে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল হারল্ডের। চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো। গেল দরজা খুলতে। ঘাসের ছাপঅলা ডেনিস ওভারঅল পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে। একটা টুথপিক চিবুচ্ছে। লোকটা মোটা। জীর্ণ, নীল ওভারঅল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভুড়ি। হারল্ডের মনে হলো লোকটা পেটের মধ্যে বাস্কেটবল লুকিয়ে রেখেছে।

বলুন? জিজ্ঞেস করল হারল্ড পারকিট, এখনও ঘুম যায়নি চোখ থেকে।

দাঁত বের করে হাসল লোকটা, মুখের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় টুথপিকটা ঠেলে নিয়ে গেল জিভ দিয়ে। লোকটার গা থেকে ঘাস, মাটি আর তেলের অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে।

প্যাস্টোরাল পাঠিয়েছে আমাকে, উৎফুল্ল গলা তার, খ্যাচখ্যাচ করে কুঁচকি চুলকাল। আপনিই বোধহয় ফোন করেছিলেন, না? দাঁত বের হয়েই আছে।

অ। লনের ব্যাপারে আপনি এসেছেন? হারল্ড বোকা বোকা চোখে চেয়ে আছে।

জি, আমি। লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসল। আমি লনমোয়ার ম্যান।

হ্যারল্ড একপাশে সরে দাঁড়াল। লোকটা চট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। লিভিংরুম এবং কিচেন পার হয়ে চলে এল পিছনের বারান্দায়।

পিছনের লনের দশা তো একেবারে ছ্যাড়াব্যাড়া, হারল্ড বলল লোকটাকে। অনেকদিন ঘাসটাস কাটা হয়নি কিনা।

ও নিয়ে আপনি কি ভাববেন না, ভায়া, চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বলল লোকটা। ঘাস যত লম্বা হবে ততই ভাল। এখানকার মাটি খুবই উর্বর। বলে এক লাফে বাড়ির ভিতরে আবার ঢুকে পড়ল সে। পা বাড়াল সামনের হলঘরে। ভুরু কুঁচকে তাকে দেখল হারল্ড। তারপর বসল একটা চেয়ারে। ঝিমুতে লাগল আবার। হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ছুটে গেল হারল্ডের। লাফ মেরে উঠল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল চেয়ার। এক ছুটে চলে এল সদর দরজায়। তাকাল। বাইরে একটা লঝঝড়ে সবুজ রঙের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে লেখা প্যাস্টোরাল গ্রিনারি ইনক। বিকট গর্জনের আওয়াজ এবার বাড়ির পেছন দিক থেকে আসছে। ওদিকে ছুটল হারল্ড। পেছনের বারান্দায় এসে জমে গেল মূর্তির মতো।

মোটা লোকটা সঙ্গে যে লাল রঙের ঘাস কাটার যন্ত্রটি নিয়ে এসেছিল ওটা নিজে নিজে চলছে। কেউ ঠেলছে না ওটাকে। যন্ত্রটার পাঁচ হাতের মধ্যে কেউ নেই। হারল্ড পারকিটের পিছনের লনের ঘাস সাফ করে চলেছে ওটা। রীতিমতো চিৎকার ছাড়ছে যন্ত্রটা, নীল তেলতেলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বাতাসে কাটা ঘাসের টকটক গন্ধ।

তবে হারল্ডকে আতঙ্কিত করে তুলেছে লনমোয়ার ম্যান।

লোকটা পরনের সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলেছে। গায়ে সুতোগাছিটিও নেই। পাখির খাবার রাখা হয় যে পাত্রে, লনের মাঝখানে, ওটার ওপর জামাকাপড়গুলো ভাজ করে রাখা। সারা গায়ে ঘাস মাখা, ন্যাংটো লোকটা ঘাস কাটার যন্ত্রের হাত পাঁচেক পিছনে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। কচমচ করে ঘাস চিবুচ্ছে সে। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে সবুজ রস, ফোলানো পেট বেয়ে নামছে। যন্ত্রটা মোড় ঘোরার সময় লোকটা অশ্লীল ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠছে।

থামো! চেঁচিয়ে উঠল হারল্ড পারকিট। থামো বলছি!

কিন্তু লোকটা হারল্ডের কথা শুনেছে বলে মনে হলো না। কচমচ করে ঘাস চিবিয়েই চলেছে।

এমন সময় ছুঁচোটাকে দেখতে পেল হারল্ড। ঘাস কাটার যন্ত্রের সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কে বোধহয় লোপ পেয়ে গেছে বুদ্ধি, কোথায় যাবে বুঝে উঠতে পারছে না। থরথর করে কাঁপছে। লোকটাও দেখতে পেল প্রাণীটাকে। বিকট, জান্তব একটা চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। পরমুহূর্তে যন্ত্রটা হামলা চালাল ছুঁচোটার ওপর। ধারাল ফলার আঘাতে শতখণ্ড হয়ে গেল ছুঁচো। লোকটা ওদিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হলো আবার।

লনমোয়ার ম্যান হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ঘাস খেতে খেতে। আতঙ্কে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হারল্ড। দেখছে লোকটার বিরাট ভূঁড়ি বেলুনের মতো ফুলে উঠছে। সে হাত বাড়িয়ে ছিন্নভিন্ন ছুঁচোর লাশ টেনে নিল। ঘাস চিবানোর মতো ছুঁচো চিবাতে লাগল এবার।

আর সহ্য করতে পারল না হারল্ড। হড়হড় করে বমি করে দিল। দুনিয়া হঠাৎ ধূসর হয়ে এল, বুঝতে পারল চেতনা হারাচ্ছে। বারান্দায় দড়াম করে পড়ে গেল সে....

.

কেউ ধরে ঝাঁকাচ্ছে ওকে। কার্লা। হয়তো বাসন মেজে রাখেনি হারল্ড কিংবা ময়লার ঝুড়ি পরিষ্কার করেনি। তাই রেগে গেছে কার্লা। দুঃস্বপ্ন দেখছিল হারল্ড। ঝাঁকির চোটে দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এল সে। চাইল চোখ মেলে। প্রথমেই দেখতে পেল একজোড়া শ্বদন্ত। কিন্তু কার্লার তো শ্বদন্ত নেই। তাছাড়া এই দাঁত দুটিতে লোমও গজিয়েছে-সবুজ লোম। দেখতে অনেকটা ঘাসের মতো।

ওহ, মাই গড! বলল হারল্ড।

আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, ভায়া। কানে ভেসে এল লনমোয়ার ম্যানের গলা। ঝুঁকে আছে সে হারল্ডের উপর, লোমঅলা দাঁত বের করে হাসছে। ওর ঠোঁট এবং থুতনিতেও লোম ঝুলছে। সারা মুখেই লোম। চারদিক পুরো নিস্তব্ধ। ঘাস কাটার যন্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসল হারল্ড। তাকাল নিশ্চল যন্ত্রের দিকে। লনের সমস্ত ঘাস চমৎকারভাবে হেঁটে ফেলা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখার আর দরকার নেই। লনমোয়ার ম্যানের দিকে ফিরল হারল্ড। লোকটা এখনও নগ্ন, ঠোঁটের কোনা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে সবুজ রস।

এসব কী? কাতর গলায় জানতে চাইল হারল্ড।

লনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেখাল লোকটা। এটা? বেশ, এটা নতুন একটা জিনিস যা করার জন্য বস চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারছি, ভায়া। আমাদের কাজের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছি, আমাদের অন্যান্য কাজগুলো করার জন্য টাকার জোগাড়ও চলছে। মাঝে মাঝে আপনার মতো দুএকজন বোকাসোকা খদ্দের পেয়ে যাই। বস সবসময়ই স্যাক্রিফাইস করতে রাজি।

হ্যারল্ড কিছু বলল না। মাথায় একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে– স্যাক্রিফাইস। মনশ্চক্ষে দেখতে পেল বিবর্ণ লাল ঘাস কাটার যন্ত্রটি থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে ছুঁচোর খণ্ডিত দেহ।

ধীরে ধীরে সিধে হলো সে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়োদের মতো। মনে পড়ল এলিসিয়ার ছড়ার একটা লাইন। অস্ফুটে বলল, ঈশ্বর ঘাসের মঙ্গল করুন।

লনমোয়ার ম্যান তার আপেল রঙা উরুতে চাপড় বসাল। ঠিক বলেছেন, ভায়া। আপনার কথাটা আমি লিখে রাখব অফিস ফাইলে, অফিসে গিয়েই।

আচ্ছা, খিড়কির দুয়ারে পা বাড়াল হারল্ড, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফোঁটাল। আপনি বরং অফিসে চলে যান। আমি একটু ঘুমাব–

শিওর, বাডি, বলল লনমোয়ার ম্যান, ভারী শরীর নিয়ে সিধে হলো। হারল্ড লক্ষ করল লোকটার পায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের মাঝখানে অনেকটা চেরা, দেখাচ্ছে পশুর খুড়ের মতো।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা দেখে চমকে যায় সকলেই, বলল লোকটা।

আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, ধূর্ত চোখে পরখ করল সে হারল্ডকে। বস নতুন প্রতিভার অন্বেষণ করছেন সবসময়ই।

বস? অস্পষ্ট গলায় শব্দটি পুনরাবৃত্তি করল হারল্ড।

প্যান। প্যান হলেন বস। বলে হেসে উঠল লনমোয়ার ম্যান, তারপর এক লাফে নেমে পড়ল লনে। বিকট গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির চারপাশে গড়িয়ে যেতে লাগল।

প্রতিবেশীরা-- হারল্ড বলতে গেল, ওকে হাত তুলে বাধা দিল লনমোয়ার ম্যান, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের কোণে।

বাড়ির সামনে এসে নেকড়ের মতো গর্জন ছাড়ল লনমোয়ার ম্যান।

ওদিকে তাকাল না হারল্ড, ঘরে ঢুকল সে। এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে, থাবা মেরে তুলল রিসিভার। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ডায়াল করল ।

সার্জেন্ট হল, বলল ওপাশের কণ্ঠ।

মুক্ত কানে একটা আঙুল ঢুকিয়ে হারল্ড বলল, আমার নাম হারল্ড পারকিট। আমার ঠিকানা ১৪২১ ইস্ট এন্ডিকট স্ট্রিট। আমি ফোন করেছি... কী বলবে হারল্ড? বলবে প্যান নামে এক লোকের অধীনে কাজ করতে এসেছে জানোয়ারের খুড়অলা পায়ের একটা লোক, সে হারল্ডের লনের দফারফা করছে?

বলুন, মি. পারকিট?

আমি অশস্নীল শরীর প্রদর্শনের অভিযোগ করতে চাই।

অশস্নীল শরীর প্রদর্শনের অভিযোগ? পুনরাবৃত্তি করল সার্জেন্ট হল।

হ্যাঁ। এক লোক এসেছে আমার লন পরিষ্কার করতে। সে পুরো ন্যাংটো। আপনি দয়া করে এখানে কাউকে পাঠাবেন?

ঠিকানা কী বললেন? ১৪২১ ওয়েস্ট এন্ডিকট? জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট হল।

ইস্ট! চেঁচিয়ে উঠল হারল্ড। ফর গডস শেক–

আপনি বলছেন সে পুরো নগ্ন? তার পুরুষাঙ্গও দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যারল্ড কথা বলতে চাইল। কিন্তু বলতে পারল না। ঘাস কাটার যন্ত্রটা আবার চালু হয়েছে। শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, যেন গর্জন করে ফাটিয়ে ফেলবে দুনিয়া।

আপনি কী বলছেন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না, বলল সার্জেন্ট। আপনার ফোনের লাইনের বোধহয় কোনো সমস্যা হয়েছে–

দড়াম শব্দে খুলে গেল সামনের দরজা।

চরকির মতো ঘুরল হারল্ড। লনমোয়ার ম্যানের ঘাস কাটার প্রকাণ্ড যন্ত্র দরজা দিয়ে ঢুকছে ভেতরে। পিছনে লনমোয়ার ম্যান। এখনও নগ্ন। ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। মাথার বেসবল ক্যাপটা একটা আঙুলের ডগায় রেখে বনবন করে ঘোরাচ্ছে লোকটা।

কাজটা ঠিক করলেন না, ভায়া, বলল সে ভসনার ভঙ্গিতে।

হ্যালো, হ্যালো, মি. পারকিট–

ঘাস কাটার যন্ত্রটাকে সামনে বাড়তে দেখে আতঙ্কিত হারল্ডের অবশ হাত থেকে খসে পড়ল টেলিফোন। কার্লার নতুন মোহাক কার্পেট কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে ওটা।

সাপ যেন সম্মোহন করেছে ব্যাঙকে, সেই দৃষ্টিতে হারল্ড তাকিয়ে আছে। যন্ত্রটার দিকে। ওটা কফি টেবিলটাকে নিখুঁতভাবে টুকরো করে ফেলল। চেয়ারের উপর দিয়ে লাফিয়ে পিছন দিকে চলে এল হারল্ড, চেয়ারটাকে শরীরের সামনে ঢালের মতো ধরে পিছু হটতে লাগল রান্নাঘরের দিকে।

এতে কোনো লাভ হবে না, ভায়া, উদাস গলায় বলল লনমোয়ার ম্যান। খামোকা জিনিসপত্র আরও নষ্ট হবে। আপনি যদি শুধু একটু দেখিয়ে দিতেন আপনার সবচেয়ে

ধারাল ছুরিখানা কোথায় রাখেন। আপনার এই স্যাক্রিফাইসটা তা হলে যন্ত্রণাহীন হতে পারত...।

হ্যারল্ড লোকটার গায়ে ছুঁড়ে মারল চেয়ার। সে তখন দরজায় ছিটকিনি লাগাচ্ছে। ঠাস করে লোকটার গায়ে বাড়ি খেল চেয়ার। ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল লনমোয়ার ম্যান। হারল্ড বারান্দায় স্ক্রিন ডোর দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল, নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। শুনল পিছনে হুংকার ছাড়ছে হিংস্র লোকটা। ছুটে আসছে। লনের উপর দিয়ে তীর বেগে ছুটল হারল্ড। পিছনে ধাওয়া করল লনমোয়ার ম্যান। লোকটা কতটুকু পিছনে আছে দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল হারল্ড এবং নিজেই নিজের পায়ে বেঁধে পড়ে গেল ধপাশ করে।

শেষমুহূর্তে হারল্ড দেখল ঘাস কাটার যন্ত্রটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ধারাল ব্লেডগুলো যেন লোকটার শ্বদন্ত, হিংস্র ভঙ্গিতে হাসছে। যন্ত্রের পিছনে লনমোয়ার ম্যান। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

.

পুরো নরক একটা, শেষ ছবিটি ভোলা হলে মন্তব্য করল লেফটেন্যান্ট গুডউইন। সাদা পোশাক পরা দুই লোকের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। তারা হাতের ঝুড়ি নিয়ে লন ধরে হাঁটা দিল।

ঘণ্টা দুই আগে লোকটা বলেছিল তার লনে কে এক নগ্ন লোক এসে হামলা করেছে।

তাই নাকি? জিজ্ঞেস করল পেট্রলম্যান কুলি।

হ্যাঁ। ক্যাস্টনমেয়ার নামে এক লোকের ধারণা ওই লোকটা আর কেউ নয়, হারল্ড পারকিট নিজে। হতে পারে, কুলি। এটা ঘটাও বিচিত্র নয়।

স্যার?

প্রচণ্ড গরমে হয়তো লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মাথার তালুতে টোকা দিল লেফটেন্যান্ট গুডউইন। সিজোফ্রেনিয়া।

জি, স্যার। বলল কুলি।

লোকটার শরীরের বাকি অংশ কোথায়? জানতে চাইল এক সাদা কোট।

বার্ডবাথে। বলল গুডউইন।

বার্ডবাথ! বিস্ময় সাদা কোটের কণ্ঠে।

হুঁ। বলল গুডউইন। ট্রেলম্যান বার্ডবাথের দিকে তাকাল। সাথে সাথে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

সেক্স ম্যানিয়াক, বলল লেফটেন্যান্ট গুডউইন। কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিন্ট? গম্ভীর গলায় জানতে চাইল কুলি।

ফুলপ্রিন্টের কথা জানতে চাইছ নিশ্চয়। নতুন কাটা ঘাসের দিকে তাকাল গুডউইন।

গলা দিয়ে ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কুলির।

লেফটেন্যান্ট গুডউইন পকেটে হাত ঢোকাল, পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরল। পৃথিবী মাথা পাগলা, উন্মাদ লোকে ভর্তি। এ কথা ভুলে না, কুলি। প্রচুর সিজোফ্রেনিক আছে। ল্যাবের ছেলেটা বলল কেউ পারকিটকে তার লিভিংরুমে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ঘাস কাটার যন্ত্র হাতে। ভাবতে পারো?

না, স্যার। বলল পেট্রলম্যান কুলি।

গুডউইন হারল্ড পারকিটের তকতকে লনের দিকে তাকাল। তারপর বাড়িটি একপাক ঘুরে দেখার জন্য পা বাড়াল। তাকে অনুসরণ করল কুলি। তাদের পিছনে, বাতাসে ভেসে রইল নতুন কাটা ঘাসের মিষ্টি একটা গন্ধ।

–স্টিফেন কিং

সেই মেয়েটি

বাড়িটাকে কোনোদিনই পছন্দ হয়নি আমার। আজ যখন বাড়িটার কথা ভাবছি তখনও মনে হচ্ছে না অ্যান কোনোদিন বাড়িটাকে পছন্দ করতে পেরেছে। তবে বাড়িটা মোটামুটি ভালোই, যদিও প্রথম দিনেই আমরা দুজনই সেখানে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছি।

সেটা ছিল আগস্ট মাসের উজ্জ্বল একটি দিন। আগের সপ্তাহে আমরা অন্তত কুড়িটা বাড়ি দেখেছি। তখন আমরা সুসজ্জিত একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম; আর নিজস্ব একটি আলাদা বাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছিলাম। খুব বেশি টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। বাড়িটা দেখেই মনে হলো, এজেন্ট ভদ্রলোক বাড়িটার দাম বলতে গিয়ে নিশ্চয় ভুল করেছে। অন্তত বাইরেটা দেখলে মনে হয় বাড়ির দাম যা চাওয়া হয়েছে তার চেয়ে। বেশি হওয়াই উচিত।

বললাম, বাড়িটা বেশ ভালই, তবে ছাদটা যেন কেমন দেখতে।

অ্যান সন্দিগ্ধ গলায় বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখতে তো ভালই লাগছে। যদিও বাড়িটা এমন সাধারণ না হলেই ভাল হত।

বাড়িটা সত্যি সাধারণ। ২৬ নম্বর ব্রায়ারফিল্ড অ্যাভেনিউ-এর বাড়িটা শহরতলীর অন্য সব বাড়ির মতোই; সামনে টিউডর আমলের নকল পাশকপালি লাগানো আর ঢালাই–

লোহার একটি বিশ্রি ফটক। কোনো গ্যারেজও নেই। অবশ্য এটুকু ছাড়া বাড়িটার আর তেমন দোষ চোখে পড়ল না।

অ্যান বলল, পাশের বাড়িটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। ঠিক আমার মনের মতো।

বিচলিত বোধ করলাম। ২৬ নম্বর বাড়ির অন্য অংশটাই ২৪ নম্বর। দুটো বাড়ি মোটামুটি একই রকমের।

অ্যান বলল, না, না, ওটা নয়। ওই পাশের বাড়িটা।

ও পাশের বাড়িটা এখানকার সাদামাটা পরিবেশের তুলনায় সত্যি অনেক আকর্ষণীয়। ভিক্টোরীয় ছাদের গঠন, লম্বা জানালা, গম্বুজ। বাগানের গাছগুলো অযত্নে বেড়ে উঠেছে। দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক দিন খালি পড়ে আছে।

হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তবে বড় বড়। মেরামত করতে অনেক টাকা ঢালতে হবে।

অ্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। ও গাড়ি থেকে নামল। বেশ তো, ২৬ নম্বর বাড়িটাই দেখা যাক।

যে লোকটি ফটক খুলে দিল সে আমার বয়সী; ফ্যাকাসে চেহারা, চোখে চশমা, গায়ে সবুজ কার্ডিগান। মনে হলো আমার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা সে দেখতেই পায়নি, অথবা দেখতে চায়নি। বলল, আমার নাম ট্যাপলো। আর আপনি নিশ্চয়ই–

ডেভিড টার্নার। ইনি আমার স্ত্রী।

ঠিক আছে। ভেতরে আসুন।

হলে ঢুকলাম। অ্যান আবহাওয়া সম্পর্কে কি যেন বলল, কিন্তু ট্যাপলো তার দিকে ফিরেও তাকাল না। হঠাৎ বলে বসল, বাড়িটা ভাল। মনে হয় আপনাদের পছন্দ হবে। এটা বৈঠকখানা।

একজোড়া মেষের মতো ট্যাপলোর সঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। ভেতরটা বাইরের মতো নিতান্ত সাধারণ। খুব সম্প্রতি কিছুটা সাজানো হয়েছে। ট্যাপলোই বলল ওয়্যারিংটা নতুন। আসবাবপত্র এবং কার্পেট নতুন বলেই মনে হলো। অ্যানের মুখ দেখেই বলে দেয়া যায় বাড়িটা দেখে সে মোটেই খুশি হয়নি, কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালই লাগল, আর বেশ সস্তাও বটে। দামটা যদি ঠিক-ঠাক বলা হয়ে থাকে, এবং বাড়িটার যদি গোপন কোনো ত্রুটি না থাকে, তাহলে কথাটা পাকা করে ফেলাই ভাল। দরকার হলে পরে আমরা এটা বিক্রি করে দিয়ে একটা আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ি কিনতে পারব।

রান্নাঘরে পৌঁছে আমাদের যাত্রা শেষ হলো। ট্যাপলো আমার দিকে ফিরে বলল, দামটাও ন্যায্য বলেই আমার ধারণা। আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা আমি তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাই। আমার চোখে মুখে নিশ্চয়ই একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়েছিল, কারণ সে তখনই বলে উঠল, বাড়িটার যে কোনো সমস্যা আছে তা কিন্তু নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমরা- আমি মাত্র ছমাস এ বাড়িতে বাস করেছি, আর বাড়িটা তৈরি করাও হয়েছে বেশ মজবুত ভাবে। প্রতিবেশীরাও ভদ্র। রাস্তাটাও ভাল। এটা একটা আদর্শ বাড়ি।

বুঝলাম অ্যানের আগ্রহ বেড়েছে। বাড়িটা তাকে খুশি না করুক, ট্যাপলো করেছে। তার স্বভাবই ওইরকম কোনো বস্তুর চাইতে মানুষের প্রতি টান বেশি।

ট্যাপলো তার সহানুভূতিটা ধরতে পারল। একটু কেশে বলল, কয়েক সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রী মারা গেছেন। স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক... কাজেই বুঝতে পারছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। একটু থেমে যোগ করল, ঠিক আছে। তাহলে ওই কথাই রইল । ভাল কথা, ওই দামের মধ্যেই কার্পেটগুলো পাচ্ছেন। আর রাতে ব্যবহারের জন্য। হিটারগুলোও।

আমি পরিষ্কার বলে দিতে পারি, ট্যাপলোর স্ত্রীর কথা জানবার জন্য অ্যানের মন তখন উশখুশ করছে। সংকোচের সঙ্গেই সে প্রশ্ন করল, অনেক–অনেকদিনের অসুখ বুঝি?

কী বললেন? না, না, মোটেই তা নয়। খুবই আকস্মিক–অপ্রত্যাশিত। এই প্রথম তার মুখে হাসি দেখলাম। জোর করা হাসি, তবু হাসি তো বটে। তিনি এ বাড়িতেও মারা যাননি, আপনারা সে ভয় করবেন না। বাড়িটা ভুতুড়েও নয়। সে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, এটা ভুতুড়ে বাড়ি নয়।

এবার অ্যানের বিচলিত হবার পালা। কোনোরকমে একটু হেসে সে জানালার কাছে গেল। বলল, আরে, দেখ, বাগানটা দেখ। বাগানের কথা তো আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

ট্যাপলো বলল, ভুলটা আমারই। সেজন্য ক্ষমা চাইছি। পিছনের দরজাটা খোলা হলো। তার পিছন পিছন আমরাও বাইরে গেলাম।

বাগানটা লম্বা ও সরু; এবং বাড়িটার মতোই সাধারণ। লনটার দিকে এখনই নজর দেওয়া দরকার; একেবারে শেষ প্রান্তের সজি বাগানটার অবস্থাও তথৈবচ। অ্যানের খুব বাগানের শখ। তাই আমি ট্যাপলোকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম, আর সে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা ওষধি গাছের সারি সে খুব ভাল করে দেখছে।

ট্যাপলো বলল, এখানে একটা ভাল বাগান করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

করলে ভালই হতো, কথার পিঠে কথা বললাম।

খোলা হাওয়ায় খাবারের স্বাদই বেড়ে যায়, মন্তব্য করল ট্যাপলো।

আমাদের কথা এর বেশি এগোল না। অ্যানের দিকে তাকালাম। সে বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের গম্বুজওয়ালা ভিক্টোরীয় বাড়িটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার দীর্ঘ চুলের রাশি সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

বললাম, ওই বাড়িটা আমার স্ত্রীর বেশ পছন্দ হয়েছে। ওটা তো খালি, তাই না?

ট্যাপলো জবাব দিল না। সে তাকিয়ে আছে অ্যানের দিকে। তার মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি।

আবার শুধালাম, ওই বাড়িটা। ওটা কি খালি?

ট্যাপলো আমার দিকে মুখ ফেরাল। ওই বাড়িটা? হ্যাঁ, ওটা খালি। একটু কেশে তাড়াতাড়ি বলল, আপনার স্ত্রীর ভিতরে আসা উচিত। বেশ ঠান্ডা পড়েছে... সে থামল। মৃদু হাসল। অগাস্টের রৌদ্রস্নাত দিনে মোটেই ঠান্ডা ছিল না। সে আবার বলল, আমি দুঃখিত। আপনি যেন কি বলেছিলেন? ও, হ্যাঁ, বাড়িটার কথা। কিন্তু দেখতেই তো

পাচ্ছেন, দেয়ালটা খুবই উঁচু; তাছাড়া বাড়িটা শিগগিরই ভেঙে ফেলা হবে; নতুন বাড়ি বানানো হবে।

ট্যাপলোলা বলতে লাগল, অবশ্য তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। আধ ডজন আধুনিক ধরনের বাড়ি তৈরি হবে বা ওইরকমই একটা কিছু। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই সব কিছু করা হবে। তার চেহারা আগের মতোই নির্বিকার।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। অ্যান তখনও পাশের বাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলাম। মনে হলো, দোতলার একটা জানালার দিকে সে তাকিয়ে আছে। জানালাটা বেশ বড় বড় কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে অদ্ভুত একটা বর্ডার টানা হয়েছে। উল্লেখ করার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

ডাকলাম, অ্যান! এবার আমাদের ফিরতে হবে।

একটু নিরবতা। তারপর অ্যান প্রথমে ধীর পায়ে, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। সে এলে বললাম, এবার আমাদের যেতে হবে। এমনিতেই মি. ট্যাপলোর অনেক সময় নষ্ট করেছি।

মোটেই না, ট্যাপলো বলল। সে একদৃষ্টিতে অ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে।

অ্যান শুধাল, পাশের বাড়িটাতে কেউ থাকে কি? আমি জানি ওটা খালি, কিন্তু–

কিন্তু কী? ট্যাপলো বলল।

অ্যান হাসল। জানালায় কাকে যেন দেখলাম। কে যেন জানালায় দাঁড়িয়েছিল আর সেই মহিলা–

মহিলা? ট্যাপলো বলল। আপনি বলছেন মহিলা?

অ্যান তার দিকে তাকাল। না, অবশ্য এটা আমার কল্পনাও হতে পারে। বাড়িটা তো খালি। একতলার জানালাগুলো কাঠ মেরে আটকে দেয়া হয়েছে। তবু–

আমি বললাম, হয় তো কোনো ভবঘুরে হবে। অথবা কোনো অনধিকার প্রবেশকারী, ওরকম খালি বাড়িতে লোকজন ঢুকে পড়তেই পারে।

ট্যাপলো বলল, না। দরজাগুলো তক্তা দিয়ে এঁটে দেয়া হয়েছে। কেউ ঢুকতে পারবে না।

অ্যান বলল, তাহলে তো মিটেই গেল। হয়তো চোখে ভুল দেখেছি।

ঠিক তাই। বলে ট্যাপলো হঠাৎ মুখ ঘোরাল। আমরাও তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। হল থেকেই আমরা বিদায় নিলাম। বলে এলাম বাড়ির ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা এজেন্টকে জানিয়ে দেব। গাড়িতে ওঠার আগে অ্যান একটি কথাও বলল না।

তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল, একটা কিছু আমি নিশ্চয় দেখেছি। জানালায় কেউ একজন ছিল।

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। বেশ তো, তুমি না হয় জানালায় কাউকে দেখেছ। তাতে কি হলো? বাড়িতে কেউ ছিল, ব্যস মিটে গেল।

অ্যান আবার বলল, একটি মেয়েকে দেখেছি। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আমি তার দিকে ঘুরে তাকালাম। আচ্ছা, এটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?

অ্যান ভুরু কুঁচকে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু না, ও কিছু না। তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তা কেন হবে? তুমি নিশ্চয়ই এটাকে গুরুতর মনে করছ। তা না হলে কথাটা বলতেই না।

বাদ দাও। এখন বাড়ি চলো।

আমি কঠিন গলায় বললাম, তুমি যতক্ষণ এ ব্যাপারে জানালার ওই মেয়েটির ব্যাপারে সব কথা না বলছ, ততক্ষণ আমি যাব না।

আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না।

আগে তো বলো। তারপরে দেখা যাবে।

অ্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বেশ, তাহলে শোনো। মেয়েটি দেখতে একদম সাদামাটা। লাল চুল। কিন্তু মুখটা... অ্যান শিউরে উঠল। বেশ ঠান্ডা পড়েছে, তাই না?

তার হাতে হাত রাখলাম। মোটেই ঠান্ডা পড়েনি। কথা ঘুরিয়ো না। মুখের কথা কী বলছিলে?

মুখ-মুখটা বিবর্ণ, সন্ত্রস্ত। তার চোখ... সে যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছিল। মনে হলো দেখ, আমি হলফ করে বলতে পারি, সে আমার কাছে সাহায্য চাইছিল। সাহায্যের জন্য মিনতি জানাচ্ছিল। কোনো কিছু থেকে তাকে উদ্ধার করতে বলছিল। অ্যান মাথা নাড়ল। হয়তো এসবই আমার কল্পনা। কিন্তু তাকে এমন মরিয়া লাগছিল...

কী বলব বুঝতে পারছি না। অ্যান সেরকম কল্পনাপ্রবণ মেয়ে নয়। আমার বিশ্বাস সে জানালায় কাউকে দেখেছে, কিন্তু বাকিটা....। ট্যাপলো বলেছে বাড়িটা খালি, আর দরজা ভেঙে কেউ বাড়িটাতে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু বাগানে তার আচরণও তো খানিকটা বেখাপ্পা ছিল।

হালকাভাবে বললাম, রোদে তোমার ভিরমি লেগেছে।

ঠাট্টাটা কাজে লাগল না। অ্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

জানতাম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কাজেই এসব ভুলে যাওয়াই ভাল। ধরে নাও এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। ঠিক আছে?

অ্যাজ ইওর উইশ। আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম।

অ্যান বলল, বেশ। এসব কথা আমরা ভুলেই যাব। এবার বাড়ি চল। আমার একটু ড্রিংক দরকার।

মদ্যপান আমারও প্রয়োজন। গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলাম। চললাম নিজ আবাসে।

বাড়ি ফিরে বাড়িটা নিয়ে অনেক কথা হলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, বাড়িটা কেনা হবে। যদিও বাড়িটা আমাদের কারোরই খুব পছন্দ নয়, তবু দাওটা হাতছাড়া করতে চাই না। দরকার হলে পরে আর একটা ভাল বাড়ি কিনে নেব।

নতুন বাড়িতে প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ কোনো অঘটন ঘটল না। বাড়িতে নতুন করে কিছু করারও ছিল না। কেবল ঘরের যে রংয়ের পরিকল্পনা ট্যাপলো করেছিল সেটা আমাদের পছন্দ হয়নি; দুএকটা ঘর নতুন করে সাজানোও হলো। এটুকু ছাড়া আর কোনো অদল-বদলই হলো না।

বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে ২৪ নম্বরের পাশের বাড়ির দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হলো। এর আগে তারা আমাদের এড়িয়েই গেছে। দুটো বাগানের মাঝখানে বেড়ার দুদিক থেকে মাঝে মধ্যে কিছু কথা হয়েছে মাত্র, কিন্তু কোনো না কোনো ছুতোয় তারা বাড়িতে ঢুকে গেছে। মধ্যবয়সী দম্পতি–তাদের নামটাও জানা হয়নি– শীঘ্রই অবসর গ্রহণে উন্মুখ। একদিন নানা কথায় ভুলিয়ে সেই নাম না জানা মিসেসের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম এবং কথা প্রসঙ্গে ট্যাপলোদের কথাটাও তুললাম।

নামটা শুনেই মিসেসের মুখ কঠিন হয়ে গেল, তবে একটু পরেই অনেকটা সহজভাবেই তাদের সম্পর্কে দুএকটা কথা বলল। অবশ্য নতুন তথ্য বিশেষ কিছু ছিল না। ট্যাপলো দম্পতি খুবই সুবিবেচক প্রতিবেশী ছিল, শান্তশিষ্ট, ভদ্র। কিন্তু কিছুদিন পরেই ট্যাপলোর বউয়ের ব্যবহার কেমন যেন হাস্যকর মনে হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানে দাঁড়িয়ে

থাকত, বিড়বিড় করত, কাঁদত। আর কিছুদিন পরেই... নাম না জানা মিসেস আর কিছু বলতে চাইল না। চুল্লিতে রান্না চাপিয়ে এসেছে, তক্ষুণি সেটা নামাতে হবে। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেই সে বলে গেল, কী লজ্জার কথা, মিসেস ট্যাপলো এমন সুন্দর মেয়ে, লাল চুলো....

এই বাক্যালাপের কথা অ্যানকে জানালাম না। বলা দরকারও মনেও হয়নি। জানালায় দেখা সেই মুখের প্রসঙ্গ যত না ওঠে ততই মঙ্গল। ওটাকে আমরা দুজনেই ভুলে যেতে চাই।

নাম না জানা মিসেসের সঙ্গে কথাবার্তার কয়েকদিন পরে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি অ্যান বাগানে। পুরানো বাড়িটার জানালার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার দুই চোখে ভয় ও হতাশা! লক্ষ্য করে আমি চমকে দুজনের জন্য পানীয় নিলাম। অ্যানের শরীর তখন কাঁপছে।

একটু পরে বললাম, তুমি আবার ওকে দেখেছ, তাই না?

হ্যাঁ, সে অস্ফুট গলায় জবাব দিল।

সেই একই মুখ? একই মেয়ে?

হ্যাঁ।

নাম না জানা মিসেসের দেয়া বিবরণ মনে পড়ে গেল, বললাম, মাথায় লাল চুল, তাই না?

হ্যাঁ।... দেখ, আমি খুবই দুঃখিত। ... আমি জানি কথাগুলো বোকার মতো শোনাচ্ছে...

আমি জোর গলায় বললাম, না, না, বোকার মতো কেন হবে? ও বাড়িতে নিশ্চয় কেউ বাস করে।

তা কী করে হবে? বাড়ি তো তালাবন্ধ। আর্তস্বরে বলে অ্যান। সে আমার সাহায্য চায়। আমাকে তার দরকার...।

বাজে কথা। তোমাকে তার দরকার হবে কেন?

অ্যান কাঁধ ঝাঁকাল। আমি জানি, সে আমাকে চাইছে।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললাম, বেশ তো, তাহলে চলো, গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কী। লাল চুলওয়ালা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেই আসি।

অ্যান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বলল, এটা হয়তো আমার কল্পনা। হ্যাঁ, নিশ্চয় কল্পনা।

বেশ তো, চলো না। ওখানে গিয়ে সন্দেহ মিটিয়ে আসি। বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাত ধরে সে গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাল। আমার আচরণ তোমার কাছে হাস্যকর লাগছে না তো? এই সব যা তা দেখা। ভ্রান্তদর্শন।

বললাম, না, আমি মোটেই তা মনে করি না। জানালায় তুমি কাউকে দেখেছ। তার মানে ওখানে কেউ থাকে। আর কোনোরকম সাহায্যের যদি তার দরকার থাকেই তাহলে তো সাহায্য করাই কর্তব্য। চলো।

বাড়িটার নাম দ্য লরেলস। ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা ভাঙাচোরা ও আগাছায় ভর্তি; ফটকের দশাও তেমন ভালো নয়। পৌঁছে দেখি, সামনের দরজাটা তালাবন্ধ, আর রঙিন কাঁচের পাল্লার উপর তক্তা মেরে দেয়া হয়েছে। জানালায় দেখা নারী যে এই দরজা দিয়ে ঢোকেনি সেটা সহজেই বোঝা যায়। বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। বাগানটা ঝোঁপ জঙ্গলে ভর্তি; এখানে ওখানে আবর্জনার স্তূপ, পরিত্যক্ত বাড়িতে যেরকম হয়ে থাকে। এক তলার জানালাগুলো মজবুতভাবে বন্ধ করা হয়েছে। পিছনের দরজাটাও সামনের দরজার মতোই বন্ধ।

আবার সামনের দরজায় ঘুরে এসে অ্যানের দিকে ফিরে বললাম, দেখ, তোমার সেই রহস্যময়ী বান্ধবীটি এক তলা দিয়ে ঢুকেছে বলে তো মনে হয় না। হয় তো জলের পাইপ বেয়ে উঠে দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

অ্যান চটে গেল। ঠাট্টা করছ? তুমি তো আগাগোড়াই আমাকে অবিশ্বাস করছ। বেশ তো, তাহলে সবটাই আমার কল্পনা। না হয় আমি মিথ্যা বলেছি। তোমার যা খুশি তাই মনে করতে পার। সে মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

তাড়াতাড়ি তার পিছু নিলাম। আমি কী ভাবব বলে তুমি আশা কর? তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করি। তুমি জানালায় কাউকে দেখেছ। কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলে বাড়িটা বন্ধ। তাহলে সে ঢুকল কোথা দিয়ে?

ততক্ষণে আমরা আমাদের বাড়ির ফটকে পৌঁছে গেছি। অ্যান ফটক খুলে কোনো কথা না বলেই দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। ওর পেছন পেছন হলে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ধীরে ধীরে বললাম, তোমার বিশ্বাস জানালায় কাউকে দেখেছ। কিন্তু ও বাড়িতে কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অ্যান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? আমি একটা হাঁদা?

আমি জানি না। আমি জানি না। বৈঠকখানায় ঢুকে একটা গ্লাস নিয়ে বসলাম। অ্যান দোতলায় উঠে গেল। সে সন্ধ্যায় আর নিচে নামল না।

অবশ্য রাতে নেমে এল। রাত তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙতে দেখি অ্যান বিছানায় নেই। বাথরুমে নেই, একতলায়ও নেই। গোটা বাড়ির কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে কোথায় গেছে। পিছনের শোবার ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে বাগানে তাকালাম। সেখানে চাঁদের আলোয় অ্যান দাঁড়িয়ে আছে; একদৃষ্টিতে পাশের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেই থেকেই অ্যান কেমন যেন বদলে গেল। হাসিখুশি চটপটে মেয়েটি ধীরে ধীরে কেমন চুপচাপ, চাপা স্বভাবের মানুষ হয়ে গেল। আমি তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, হাত বাড়ালে সরে যায়। এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি, যেন জানালায় দেখা নারীর কথায় সে ভুলেই গেছে; কিন্তু আমি তো জানি প্রতিদিন সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই সে। সোজা বাগানে চলে যায়। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসি তখন সে রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মুখের ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝতে পারি সেই নারীকে সে আবার দেখতে পেয়েছে। রাতে বিছানায় সে আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে অন্ধকারে জেগে থাকে। যখনই জাগি দেখি সে নেই। সে কোথায় গেছে তা নিয়ে এখন আমি ভাবি না। আমি জানি।

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে বাধ্য মেয়ের মতোই সে আমার সঙ্গে গেল। কিন্তু ডাক্তার যে ওষুধ খেতে দিল তাতে কোনোই পরিবর্তন হলো না। হয় তো সে ওষুধ সে খায়ইনি। বললাম, চলো এখান থেকে চলে যাই, আর বাড়িটা বিক্রি করে দিই, কিন্তু তার তীব্র আপত্তিতে চুপ করে গেলাম। আম বাগানে গিয়ে কী দেখে সেটা জানবার জন্য দুএকবার বাগানে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়েও থেকেছি। সেই নারীকেও দেখতে চেয়েছি। কিন্তু ধূলিমলিন কাঁচের উপর আলো ও গাছপালার ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। কী করব বুঝতে পারছি না। আমার এত ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী স্ত্রী যেন ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তারপর, একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি ঘর খালি। পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে গেলাম। কিন্তু বাগানও জনশূন্য। সে কোথায় গেছে তার কোনো সূত্র যদি পাওয়া যায় এই আশায় বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোথাও কিছু পেলাম না। টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছুটে নিচে গেলাম, নিশ্চয় অ্যান কোনো বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফোন করছে, হয়তো সেখানেই ডিনারের জন্য বান্ধবী আটকে দিয়েছে; অথবা শহরে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়েছে। কিন্তু টেলিফোন করেছে অন্য লোকে–আমার ভাই; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা শেষ করলাম।

ঘণ্টা বেজেই চলল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। আবার বাগানে গিয়ে দ্য লরেলস-এর দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হলো, অ্যান ওখানেই গেছে। ছুটে রান্নাঘরে গেলাম, সেখান থেকে হলে সশব্দে দরজা ও ফটক বন্ধ করে আমাদের বাড়ি ও দ্য লরেলস-এর

মাঝখানের কয়েক গজ জায়গা ছুটে পার হয়ে গেলাম। অন্ধকার জানালাগুলো অন্ধের চোখের মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাঙা সিঁড়ি ও কাঠ লাগানো দরজায় যাবার পথে বার কয়েক হোঁচট খেলাম। কেন যাচ্ছি, কিসের আশায় যাচ্ছি তাও জানি না। শুধু এটুকু নিশ্চিত জানি যে সে ওই বাড়িতে আছে, আর তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সামনের দরজাটা খোলা দেখে আমার বিস্মিত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমি অবাক হইনি। দরজাটা কেন খোলা, আর কে খুলেছে সে কথা একবারও না ভেবে ওপাশের অন্ধকার, ধুলোভর্তি হলঘরে ঢুকে পড়লাম। সিঁড়ির ওপরের স্কাই লাইট দিয়ে আসা একটা আবছা আলো হলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের দুই পাশের বন্ধ দরজাগুলোর দিকে কোনরকম নজর না দিয়েই আমি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। একবার কান পাতলাম। কিছুই শুনতে পেলাম না। নিস্তব্ধতার একটা শ্বাসরোধকারী কালো কম্বল যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে; আমার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কোথাও নেই। দোতলার চাতালে পৌঁছে একবার থামলাম। তবু কোনো শব্দ নেই। আমার ডান দিকে একটা বারান্দা চলে গেছে; সেটা ধরে এগিয়ে গেলাম।

শেষ প্রান্তে একটা দরজা, তার ফাঁক দিয়ে রূপোলি আলোর একটি রেখা বারান্দায় এসে পড়েছে। থামলাম, আমি জানতাম, অ্যান সেই দরজার অপর দিকে, আর এই প্রথম আমি তাকে ডাকলাম, অ্যান! অ্যান! তুমি কোথায়? কোনো উত্তর এল না। একটা শব্দ পর্যন্ত নেই। ধীরে ধীরে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ইচ্ছা হলো, ছুটে যাই, এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলি, অ্যানকে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে আসি। কিন্তু তার

সঙ্গে আর কে আছে তা তো আমি জানি না। দরজার কাছে পৌঁছে আবার থামলাম। আস্তে একটু ধাক্কা দিলাম। দরজাটাও আস্তে ভিতরের দিকে খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু-একটা মাকড়সার জাল অথবা হাওয়া এসে আমার গালে লাগল। ঘরের মধ্যে তাকালাম। আমার মুখোমুখি একটা জানালা। রঙিন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি বিচিত্র পাড় বসানো একটা মস্ত বড় জানালা।

ঘরের মধ্যে অ্যান একা। আর কেউ নেই, কোনো লাল চুলের মেয়ে নয়, কিছু নয়। শুধু অ্যান। ধুলোভর্তি মেঝেতে সে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। লম্বা চুলের রাশি তার মুখের উপর ছড়ানো। চুলের গোছা একপাশে সরাতেই দেখলাম সে হাসিমুখেই মারা গেছে।

একটি যুবক দম্পতি আজ বাড়িটা দেখতে এসেছে। আমারই

বয়সী, বরং একটু বেশি লাজুক। বাড়িটা দেখে তারা বেশি কিছু বলল, তবে মনে হলো যে তাদের পছন্দ হয়েছে বাড়ি। পছন্দ হবারই কথা। বাড়িটা ভাল, পরিবেশটাও ভাল। আর কোনোরকম অযৌক্তিক দামও আমি চাইনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটা বিক্রি করে দিতেই আমি চাই; তাদের শুধু বললাম, এ দামে যদি তারা এর চাইতে ভাল বাড়ি পান তবে তাদের ভাগ্য ভাল বলতেই হবে।

অবশ্য বাগানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো। পাশের পুরানো বাড়িটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে আমার কাছে জানতে চাইল, ও বাড়িতে কে থাকে। আমি যখন বললাম যে বাড়িটা খালি পড়ে আছে তখন সে ভুরু কুঁচকে বলল, সে শপথ করে বলতে পারে যে দোতলার একটা জানালায় সে কাউকে দেখেছে। মেয়েটার মাথায় লম্বা চুল।

–ল্যান্স শালওয়ে

হ্যারি

ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আমাকে ভীত করে তোলে। রোদ। ঘাসের উপরে গাঢ় ছায়া। সাদা গোলাপ। কোঁকড়ানো লাল চুলের শিশু। আর একটা নাম– হ্যারি। কত সাধারণ একটা নাম!

ক্রিস্টিন যখন প্রথম নামটা বলল আমাকে, আমার গা শিউরে উঠেছিল।

ওর বয়স পাঁচ, মাস তিনেক বাদে ভর্তি হবে স্কুলে। এক সুন্দর, উষ্ণ বিকেলে বরাবরের মতো বাগানে খেলা করছিল ক্রিস্টিন। দেখলাম ঘাসের উপর পেট দিয়ে শুয়ে আছে ও, ফুল ছিঁড়ে মালা গাঁথছে মনের আনন্দে। ওর ম্লান লাল চুলে রোদ ঝলসাচ্ছে, ত্বক আশ্চর্য সাদা লাগছে। যেন গোলাপি। একটা আভা ফুটে বেরুচ্ছে শরীর থেকে। বড় বড় নীল চোখ জোড়া গভীর মনোযোগের কারণে ঈষৎ বিস্ফারিত।

হঠাৎ সাদা গোলাপের ঝাড়ের দিকে চোখ তুলে চাইল ক্রিস্টিন। ঝোঁপটার ছায়া পড়েছে ঘাসে। হাসল মেয়েটা।

হ্যাঁ, আমি ক্রিস্টিন, বলল ও। সিধে হলো। ধীর পায়ে হেঁটে এগোল ঝোঁপের দিকে। পরনের নীল সুতির স্কার্টটা উরু ছুঁয়েছে। দ্রুত লম্বা হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

থাকি মাম্মি আর ড্যাডির সাথে, পরিষ্কার গলা শোনা গেল ওর। তারপর একটু বিরতি দিয়ে, কিন্তু ওরাই আমার মাম্মি আর ড্যাডি।

ঝোঁপের ছায়ার মধ্যে এখন ক্রিস্টিন। যেন আলোর পৃথিবী থেকে ঢুকে পড়েছে আঁধারে। কেমন অস্বস্তি লাগল আমার, জানি না কেন, ডাক দিলাম ওকে।

ক্রিস্টিন, কী করছ তুমি?

কিছু না, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল কণ্ঠটি।

ঘরে এসো। বাইরে অনেক রোদ।

বেশি রোদ না।

ঘরে এসো, ক্রিস।

ও বলল, আমাকে এখন যেতে হবে। বিদায়, বাড়ির দিকে পা বাড়াল মন্থর ভঙ্গিতে।

ক্রিস, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

হ্যারি ভাইয়া।

হ্যারি ভাইয়া কে?

হ্যারি ভাইয়া।

ও আর কিছু বলল না। আমি ওকে দুধ খাওয়ালাম, ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত পড়ে শোনালাম বই। শুনতে শুনতে বাগানের দিকে চোখ ফেরাল ক্রিস্টিন। হেসে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পরে স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।

আমার স্বামী জিম বাড়ি ফেরার পরে ওকে রহস্যময় হ্যারি ভাইয়া সম্পর্কে বললাম। হেসেই উড়িয়ে দিল সে আমার কথা।

তোমার সঙ্গে দুষ্টুমি শুরু করেছে ও। বলল জিম।

মানে?

বাচ্চারা কল্পনায় এরকম নানান সঙ্গী-সাথী জোগাড় করে। কেউ কেউ তাদের পুতুলের সঙ্গে কথা বলে। ক্রিস্টিনের তো আবার পুতুল-টুতুলের প্রতি কোন কালেই আগ্রহ ছিল

না। ওর ভাই-বোন নেই, নেই সমবয়সী কোন বন্ধু। তাই কল্পনায় একজনকে নিজের সাথী করে নিয়েছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

কিন্তু নির্দিষ্ট কোন নাম কেন বেছে নেবে ও?

ত্যাগ করল জিম। বাচ্চারা এরকম কত কিছুই তো করে। এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কোন মানে হয় না।

না, ঠিক দুশ্চিন্তা নয়। ওর প্রতি আরেকটু খেয়াল রাখার প্রয়োজন বোধ করছি। ওর আসল মায়ের চেয়েও বেশি।

জানি আমি। কিন্তু ক্রিস্টিন ঠিকই আছে। ও চমৎকার একটি মেয়ে। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী। এর সমস্ত ক্রেডিট তোমার।

তোমারও।

ইনফ্যাক্ট, আমরা বাবা-মা হিসেবে মন্দ নই।

এবং খুব বিনয়ী। বলে দুজনে হেসে উঠলাম একসাথে। ডজম আমার কপালে চুমু খেল। আমার মন শান্ত হলো ।

তবে পরদিন সকাল পর্যন্ত।

আজও প্রখর রোদ চমকাচ্ছে ছোট বাগানটিতে, সাদা গোলাপ ঝাড়ের গায়ে। ক্রিস্টিন পা মুড়ে বসেছে ঘাসে, চোখ ঝাড়ের দিকে। হাসছে। হ্যালো, বলল সে। জানতাম তুমি আসবে...কারণ তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার বয়স কত? ...আমি পাঁচে পা দিয়েছি...আমি বাচ্চা মেয়ে নই। আমি শিগগিরি ইশকুলে ভর্তি হব, নতুন ড্রেস পরব। নীল জামা। তুমি ইশকুলে যাও?...তারপর কী করো? এক মুহূর্ত নিরব থাকল সে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, শুনছে, আলাপচারিতায় মগ্ন।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে গা হিম হয়ে এল আমার। বোকার মতো কিছু ভেবে বোসো না। অনেক বাচ্চারই কাল্পনিক সঙ্গী থাকে। নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিছুই ঘটছে না, তুমি কিছুই দেখছ না বা শুনছ না এমন ভাব করলেই হয়। নির্বোধের মতো কিছু করে বোসা না।

কিন্তু আমি ডাক দিলাম ক্রিস্টিনকে দুধ খাওয়ার জন্য। সাধারণত এত তাড়াতাড়ি ওকে দুধ খাওয়াই না আমি।

তোমার দুধ রেডি, ক্রিস। চলে এসো।

এক মিনিট, জবাব শুনে অবাক লাগল। ও দুধ খেতে খুব পছন্দ করে চকলেট ক্রিম বিস্কিট দিয়ে। ডাকলেই চলে আসে।

এখুনি আসো, সোনা, বললাম আমি।

হ্যারি ভাইয়াকে নিয়ে আসি?

না! চিৎকারটা এতই কর্কশ শোনাল যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

গুডবাই, হ্যারি ভাইয়া। তোমাকে নিয়ে যেতে পারছি না বলে স্যরি। কিন্তু আমাকে এখন দুধ খেতে যেতে হবে। বলে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল ক্রিস্টিন।

হ্যারি ভাইয়াকে কেন দুধ খেতে ডাকলে না? রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে বসল আমার মেয়ে।

হ্যারিটা কে সোনা?

হ্যারি আমার ভাই।

কিন্তু ক্রিস্টিন, তোমার তো কোন ভাই নেই। ড্যাডি আর মাম্মির একটাই মাত্র সন্তান, একটি মাত্র মেয়ে, আর সে হলে তুমি। হ্যারি তোমার ভাই হতে পারে না।

হ্যারি আমার ভাই। ও আমাকে তাই বলেছে। দুধের গ্লাসে মুখ নামাল ও, চুমুক দিল। মুখ তুলল উপরের ঠোঁটে দুধের সাদা রেখা নিয়ে। তারপর থাবা মেরে তুলে নিল বিস্কিট। যাক হ্যারি অন্তত ওর খিদে নষ্ট করতে পারেনি।

দুধ খাওয়া শেষ হলে আমি বললাম, আমরা এখন শপিং করতে যাব, ক্রিস। আমার সঙ্গে যাবে?

না। আমি হ্যারি ভাইয়ার সঙ্গে থাকব।

তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।

হ্যারি ভাইয়া যেতে পারবে?

না।

চুল আঁচড়ানোর সময় লক্ষ করলাম আমার হাত কাঁপছে। আজকাল ভীষণ ঠান্ডা লাগছে ঘরে। যেন শীতল একটা ছায়া ঘিরে আছে বাড়িটাকে সূর্যালোক আড়াল করে। সুবোধ

বালিকাটির মতো আমার সাথে বেরিয়ে পড়ল ক্রিস্টিন। তবে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ঘুরে হাত নাড়ল সে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে।

এ ঘটনা জিমকে জানালাম না আমি। বললে আগের দিনের মতো লেকচার শুনিয়ে দেবে সে আমাকে। কিন্তু ক্রিস্টিনের হ্যারি ভাইয়ার ফ্যান্টাসী দিনের পর দিন চলতে লাগল, সেই সাথে চাপ বাড়ল আমার। স্নায়ুতে। গ্রীষ্মের লম্বা দিনগুলো এখন আমার চোখে বিষের মতো, চাতকের মত অপেক্ষা করছি ধূসর মেঘভর্তি আকাশ আর বৃষ্টির জন্য। বাগানে ক্রিস্টিনের গলা শুনলেই আজকাল কেঁপে উঠি আমি। হ্যারি ভাইয়ার সাথে সে বিরামহীন বকবক করে চলে।

এক শুক্রবারে জিম সবকিছু শোনার পরে মন্তব্য করল, আমি তোমাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি কল্পনায় ও তার একজন সঙ্গী খুঁজে নিয়েছে।

ওর ভাষাও বদলে যাচ্ছে, বললাম আমি। খানিকটা আঞ্চলিক টানে কথা বলে। খাইয়াম, দিবাম ইত্যাদি।

লন্ডনের প্রতিটি বাচ্চাই আঞ্চলিক টানে কথা বলে। কেউ কম, কেউ বেশি। স্কুলে যাবার পরে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশে তো ওর উচ্চারণ আরও বাজে হয়ে উঠবে।

আমরা তো এভাবে কথা বলি না। এরকম উচ্চারণ ও শিখল কোত্থেকে? আর কার থেকে ও এ উচ্চারণ শিখবে ওই ইয়েটা ছাড়া..হ্যরির নামটা মুখে এল না আমার।

দুধঅলা, দারোয়ান, ক্লিনার-আরও নাম শুনতে চাও?

চাই না, তিক্ত একটা হাসি দিয়ে চুপ হয়ে গেলাম আমি।

তবে, বলল জিম। আমি কিন্তু ওর উচ্চারণে কোন টানের প্রভাব লক্ষ করিনি।

আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে ওভাবে উচ্চারণ করেও না। শুধু বলে ওর-ওর সঙ্গে কথা বলার সময়।

অর্থাৎ হ্যারি। এই হ্যারির ব্যাপারে আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে। চলো, একদিন খুঁজে দেখি সত্যি এ নামে কেউ আছে কিনা?

না! আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। ও কথা আর মুখেও এনো না। ওটা আমার দুঃস্বপ্ন। আমার জীবন্ত দুঃস্বপ্ন। ওহ্। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

বিস্মিত দেখাল ওকে। এই হ্যারি দেখছি তোমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে!

আসলেই তাই। সারা দিনরাত আমাকে অনর্গল শুনতে হচ্ছে হ্যারি ভাইয়া ওটা, হ্যারি ভাইয়া এটা, হ্যারি ভাইয়া অমুক বলেছে?

হ্যারি ভাইয়া তমুক ভাবছে। হ্যারি ভাইয়াকে এটা দিই?

হ্যারি ভাইয়াকে নিয়ে আসি? তুমি অফিসে থাকো বলে এ যন্ত্রণা তোমাকে সইতে হয় না। কিন্তু এটার সঙ্গে আমাকে বাস করতে হচ্ছে। আমি আমি ভয় পাচ্ছি, জিম। ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর।

তোমার মানসিক বিশ্রামের জন্য কী করা দরকার জানো?

কী?

ক্রিসকে নিয়ে কাল ডা. সালামের কাছে যাবে। উনি এ শহরের সেরা সাইকিয়াট্রিস্ট। ক্রিসের সাথে উনি কথা বলুন।

ক্রিস কি অসুস্থ–মানে মানসিক ভাবে...?

আরে না! তবে প্রফেশনাল অ্যাডভাইসটা এখন দরকার।

পরদিন ক্রিস্টিনকে নিয়ে গেলাম ডা. ওয়েবস্টারের কাছে। ওকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে ডাক্তারের কাছে হ্যারির ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম। সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, তারপর বললেন, এটা একটা অদ্ভুত কেস, মিসেস জেমস। তবে অস্বাভাবিক নয়। কাল্পনিক সঙ্গী কোন কোন বাচ্চার কাছে এমন বাস্তব হয়ে ওঠে যে বাবা মার আত্মা শুকিয়ে যায় ভয়ে। এরকম ঘটনা বহু দেখেছি। আপনার মেয়েটি বোধহয় একা থাকে, তাই না?

ওর কোন বন্ধু নেই। আমরা নতুন এসেছি ওই এলাকায়। তবে স্কুলে যেতে শুরু করলে আর বন্ধুর অভাব হবে না।

ও স্কুলে যাবার পরে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে যখন মিশতে থাকবে, দেখবেন ফ্যান্টাসিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি শিশুরই সমবয়সী সঙ্গী সাথী দরকার। না পেলে সে নিজেই কোন সঙ্গী আবিষ্কার করে বা বানিয়ে নেয়। বয়সী কিংবা বুড়োরা যেমন আপন মনে নিজেদের সাথে কথা বলে। এর মানে এই নয় যে তারা পাগল। কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়। বলেই এমনটা করে। শিশুরা আরও বেশি প্র্যাকটিকাল। নিজে নিজে কথা বলার চেয়ে কল্পনায় কোন সঙ্গী সে তৈরি করে। আমার মনে হয় না এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু আছে।

আমার স্বামীও তাই বলেছে।

ঠিকই বলেছেন তিনি। তবে ক্রিস্টিনকে যেহেতু নিয়ে এসেছেন, ওর সঙ্গে একটু কথা বলি। তবে আমাদের আলাপচারিতায় আপনার না থাকলেও চলবে।

আমি ওয়েটিংরুমে গেলাম ক্রিস্টিনের কাছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, হ্যারি ভাইয়া অপেক্ষা করছে।

কোথায়, ক্রিস? শান্ত গলায় প্রশ্ন করলাম।

ওই তো। গোলাপের ঝাড়ের ধারে।

ডাক্তার তার বাগানে গোলাপ ঝাড় বানিয়েছেন। তাঁর বাসা এবং চেম্বার একসাথে।

ওখানে কেউ নেই। বললাম আমি। ক্রিস্টিন কটমট করে তাকাল আমার দিকে। ডা. ওয়েবস্টার তোমার সাথে কথা বলবেন, সোনা। ওর চাউনিতে এমন কিছু একটা ছিল, কথা বলার সময় গলা কেঁপে গেল আমার। ওনাকে তো তুমি চেনোই। চিকেন পক্স থেকে সেরে ওঠার পরে তোমাকে ক্যাডবেরি খেতে দিয়েছিলেন, মনে নেই?

মনে আছে। বলল ক্রিস্টিন। সোৎসাহে পা বাড়াল ডাক্তারের চেম্বারের দিকে। আমি অস্থিরচিত্তে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওদের অস্পষ্ট গলা ভেসে আসছে।

ডাক্তার খিক খিক করে হাসলেন। ক্রিস্টিন জোর হাসিতে ফেটে পড়ল। ডাক্তারের সাথে যেরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছে আমার সঙ্গে সেভাবে কখনও বলে না।

ওরা ঘর থেকে বেরুল। ডাক্তার বললেন, আপনার মেয়ের কোন সমস্যা নেই। ওর মনটা শুধু কল্পনায় ভরা। একটা কথা মিসেস জেমস, ওর সঙ্গে হ্যারির ব্যাপারে আলোচনা করুন। আপনার উপরে যেন সে আস্থা রাখতে পারে। আপনি ওর এই ভাইটির ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন, শুনেছি আমি। তাই ক্রিস্টিন হ্যারি সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। হ্যারি কাঠের খেলনা বানাতে পারে, তাই না, মামণি?

হ্যাঁ। হ্যারি ভাইয়া কাঠের খেলনা বানাতে পারে।

সে লিখতে পড়তেও জানে, না?

হ্যাঁ। এছাড়া সাঁতার কাটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, ছবি আঁকে। হ্যারি ভাইয়া সব পারে। ও খুব ভাল ভাই। ক্রিস্টিনের ছোট্ট মুখখানা জ্বলজ্বল করে উঠল।

ডাক্তার আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। হ্যারি ওর কাছে খুব ভালো একটা ভাই। ক্রিস্টিনের মত তার চুলের রঙও লাল, তাই না?

হ্যারি ভাইয়ার চুল আমার চেয়েও লাল আর কোঁকড়ানো। ড্যাডির মতোই প্রায় লম্বা তবে একটু শুকনা। গর্বের সুর ক্রিস্টিনের কণ্ঠে। মাম্মি, তোমার সমান লম্বা হ্যারি ভাইয়া। ওর বয়স চোদ্দ। বলেছে বয়সের তুলনায় ও নাকি বেশি লম্বা হয়ে গেছে। এ কথার মানে কী?

বাড়ি যাবার পথে মাম্মি তোমাকে এ কথার মানে বুঝিয়ে দেবেন বললেন ডা.ওয়েবস্টার। এখন বিদায়, মিসেস জেমস। দুশ্চিন্তা করবেন না। ও আবোল তাবোল যা বলে বলুক। গুডবাই, ক্রিস্টিন। হ্যারিকে আমার ভালবাসা দিয়ো।

ও তো ওখানে, ডাক্তারের বাগানের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ক্রিস্টিন। আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

গলা ছেড়ে হাসলেন ডাক্তার। এদেরকে সংশোধন করা সম্ভব নয়, তাই না? আমি এক আদিবাসী মায়ের কথা জানি যার বাচ্চারা কল্পনায় গোটা একটি আধিবাসী দল আবিষ্কার করে বাড়িতে নানারকম পূজা-অর্চনা শুরু করে দিয়েছিল। সেদিক থেকে আপনি ভাগ্যবতী, মিসেস জেমস!

নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। মনে প্রাণে আশা করলাম ক্রিস্টিন স্কুলে যেতে শুরু করলে তার মাথা থেকে হ্যারির ভূতটা নেমে যাবে।

ক্রিস্টিন আমার আগে আগে ছুটে চলেছে। এমনভাবে পাশ ফিরে তাকাচ্ছে যেন সঙ্গে কেউ আছে। একটি ভয়ঙ্কর সেকেন্ডের জন্য আমি ফুটপাতে ওর ছায়ায় পাশে আরেকটি লম্বা, সরু ছায়া দেখতে পেলাম–কোঁকড়ানো চুলের মাথার কোন ছেলের ছায়া। পরের মুহূর্তে ওটা উধাও। ছুটে গিয়ে ক্রিস্টিনের হাত চেপে ধরলাম। বাকি রাস্তাটা আর মুঠো ছাড়লাম না।

আমাদের বাড়িটিতে যথেষ্ট নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু এ গরমেও বাড়িটি আশ্চর্য রকম ঠান্ডা। আমি আর এক মুহূর্তের জন্যও ক্রিস্টিনকে চোখের আড়াল হতে দিলাম না। ও আমার চোখের সামনেই আছে, কিন্তু বাস্তবে যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার বাড়িতে আমার বাচ্চা ক্রমে অচেনা একজনে পরিণত হচ্ছে।

ক্রিস্টিনকে দত্তক নেওয়ার পরে এই প্রথম সিরিয়াসভাবে প্রশ্নগুলো মাথায় এল আমার : কে ও? কোত্থেকে এসেছে ও? ওর আসল বাবা-মা

কে? যাকে আমি মেয়ে হিসেবে হিসেবে দত্তক নিয়েছি এর প্রকৃত পরিচয় কী? কে ক্রিস্টিন?

আরেকটি হপ্তা গেল। সারা হপ্তা শুধু হ্যারির গল্পই শুনতে হলো। স্কুলে যাবার আগের দিন ক্রিস্টিন জানাল সে স্কুলে যাবে না।

অবশ্যই যাবে। বললাম আমি। তোমার স্কুলে ভর্তি হবার বয়স হয়েছে। ওখানে তোমার বয়সী অনেক বন্ধু পাবে।

হ্যারি ভাইয়া বলেছে সে যেতে পারবে না।

স্কুলে হ্যারিকে দরকার হবে না তোমার। সে– ডাক্তারের উপদেশ মনে পড়ে গেল, অনেক কষ্টে গলার স্বর শান্ত রাখলাম। –মানে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য তার বয়স অনেক বেশি। ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে চোদ্দ বছরের একটা বুড়ো ছেলের খুবই অস্বস্তি লাগবে।

আমি হ্যারি ভাইয়াকে ছাড়া স্কুলে যেতে পারব না। আমি হ্যারি ভাইয়ার সঙ্গে থাকব। ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল ও। ক্রিস, কান্না বন্ধ করো! বন্ধ করো বলছি! ঠাস্ করে ওর হাতে সজোরে চড় বসিয়ে দিলাম। সাথে সাথে থেমে গেল কান্না। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। বড় বড় নীল চোখ জোড়া বিস্ফারিত এবং ভয়ঙ্কর ঠান্ডা। বড়দের মতো ভীতিকর চাউনি। ছমছম করে উঠল গা।

ক্রিস্টিন বলল, তুমি আমাকে ভালবাস না। হ্যারি ভাইয়া আমাকে ভালবাসে। ও আমাকে চায়। বলেছে ওর সঙ্গে আমি যেতে পারি।

এসব কথা আমি আর শুনতে চাই না!

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, পরক্ষণে নিজের উপরে রাগ হলো ছোট একটা বাচ্চার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করার জন্য। আমার বাচ্চা হাঁটু-গেড়ে বসে পড়লাম আমি। দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাকুল গলায় ডাকলাম, ক্রিস, সোনা। এসো।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে। আমি তোমাকে ভালবাসি। বললাম আমি। তুমি স্কুলে গেলে আমি খুব খুশি হবো।

স্কুলে গেলে হ্যারি ভাইয়াকে পাব না।

অন্য অনেক বন্ধু পাবে।

আমি অন্য কাউকে চাই না। শুধু হ্যারি ভাইয়াকে চাই। আবার চোখ ছাপিয়ে জল এল। আমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে। আমি ওকে জোরে জড়িয়ে ধরলাম।

তুমি ক্লান্ত,মা। চলো, ঘুমাতে যাবে।

মুখে জলের শুকনো দাগ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ক্রিস্টিন।

তখনও দিনের আলো ছিল। আমি জানালার ধারে গেলাম পর্দা ফেলে দিতে। বাগানে সোনালি ছায়া আর রোদের লম্বা ফালি। তারপর, আবার স্বপ্নের মত, সাদা গোলাপ ঝাড়ের পাশে ছায়া ফেলল লম্বা, পাতলা একটি শরীর। পাগলিনীর মতো ঝট করে জানালা খুলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, হ্যারি! হ্যারি!

কোঁকড়ানো চুলের মাথাসহ ছায়াটা দেখলাম যেন এক মুহূর্তের জন্য। তারপর আর কিছু নেই।

রাতে জিমকে ক্রিস্টিনের কথা বললাম। সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। বেচারী। স্কুলে যাবার সময় সব বাচ্চাই এরকম কান্নাকাটি করে। একবার স্কুলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে হ্যারির কথাও ভুলে যাবে।

হ্যারি চায় না ও স্কুলে যাক।

অ্যাই! তুমিও দেখছি হ্যারিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ।

কখনও কখনও করি।

বুড়ো বয়সে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস? ঠাট্টা করল জিম।

হ্যারি ভূত–প্রেত নয়, বললাম আমি। একটা কিশোর মাত্র। যার কোন অস্তিত্ব নেই শুধু ক্রিস্টিরে কাছে ছাড়া। আর ক্রিস্টিন কে?

ওভাবে বলছ কেন? কঠিন শোনাল জিমের কণ্ঠ। ক্রিস্টিনকে দত্তক নেয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ও আমাদের আপন সন্তানের মতো বেড়ে উঠবে। আমরা ওর অতীত নিয়ে মাথা ঘামাব না। কোন দুশ্চিন্তা করব না। কোন রহস্য নিয়ে ভাবব না। আমরা ভাবব ক্রিস্টিন আমাদের রক্ত মাংসের সন্তান। অথচ তুমি এখন প্রশ্ন তুলছ ক্রিস্টিন কে! ও আমাদের মেয়ে-এ কথাটা ভুলে যেয়ো না।

জিমকে আগে কখনও এভাবে রেগে উঠতে দেখিনি। তাই পরদিন ক্রিস্টিন স্কুলে থাকার সময় কী করব সে ব্যাপারটা গোপন করে গেলাম ওর কাছে।

পরদিন সকালে ক্রিস্টিনকে চুপচাপ আর গম্ভীর দেখলাম। জিম ওর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করে মন ভালো করে দিতে চাইল। কিন্তু সেদিকে পাত্তা না দিয়ে ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় বলল, হ্যারি ভাইয়া চলে গেছে।

হ্যারিকে তোমার দরকার নেই। তুমি এখন স্কুলে যাবে। বলল জিম।

ক্রিস্টিন ওর দিকে সেই ঘৃণামিশ্রিত বড়দের মতো চাউনি দিল।

স্কুলে যাবার পথে মেয়ের সঙ্গে কোন কথা হলো না আমার। খুব কান্না পাচ্ছিল। তবু যে ওকে স্কুলে নিয়ে যেতে পারছি তাই যথেষ্ট। ওকে আমি হারিয়ে ফেলছি এরকম বিচিত্র অনুভূতি জাগল মনে। প্রতিটি মায়েরই হয়তো তার বাচ্চাকে প্রথম স্কুলে নিয়ে যাবার সময় এরকম অনুভূতি হয়। স্কুলে ভর্তি হওয়া মানে শিশুর শৈশবকালের সমাপ্তি, বাস্তব জীবনে প্রবেশ। জীবনের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অচেনা দিকের সাথে পরিচয়। স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ওকে বিদায় চুম্বন করে বললাম, তুমি আজ স্কুলের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে, ক্রিস। তিনটার সময় ছুটি হলে তোমাকে নিতে আসব।

আচ্ছা, মাম্মি, আমার হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও। নার্ভাস চেহারায় অন্যান্য বাবা-মাদের সাথে ভয় আর দুশ্চিন্তা নিয়ে বাচ্চারা স্কুলে আসতে শুরু করেছে। সুন্দর চুলের, সাদা সুতির স্কার্ট পরা এক সুন্দরী তরুণী হাজির হলো স্কুল গেটে। নতুন বাচ্চাদের জড়ো করে ওদের নিয়ে। স্কুল অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় তার মুখে সহানুভূতির হাসি ফুটল। আমরা ওর ঠিক মতো যত্ন নেব।

ক্রিস্টিনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না জেনে হালকা হয়ে গেল মন। এবার আমার গোপন অভিযানে বেরিয়ে পড়া চলে। বাসে উঠে পড়লাম। নামলাম বিশালাকৃতির, বিষণ্ণ চেহারার বিল্ডিংটির সামনে। চার বছর আগে জুবেরকে নিয়ে একবার এসেছিলাম এ দালানে। এরপর আর আসার দরকার হয়নি। বিল্ডিং-এর টপ ফ্লোরে গ্রেথর্ন অ্যাডপশন সোসাইটির অফিস। আমি পাঁচতলায় উঠে এলাম। রঙচটা, পরিচিত দরজায় কড়া

নাড়লাম। এক মহিলা, আগে কখনও দেখিনি, ভিতরে আসতে বলল আমাকে। মিসেস ক্লিভারের সাথে দেখা করতে পারি? আমি মিসেস জেমস।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

না। তবে ব্যাপারটা খুব জরুরি।

আচ্ছা, দেখছি। বলে ভিতরের ঘরে ঢুকল সে। একটু পরেই ফিরে এল।

মিসেস ক্লিভার আপনাকে যেতে বলেছেন, মিসেস জেমস।

মিসেস কিভার রোগা, লম্বা, ধূসর চুলের হাসি মুখের এক মহিলা। তাঁর চেহারা থেকে করুণা ঝরে পড়ছে, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিসেস জেমস, কতদিন পরে দেখা! ক্রিস্টিন কেমন আছে?

ভাল আছে, মিসেস ক্লিভার। আপনার সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে আসি। আমি জানি দত্তক সন্তানদের জন্মবৃত্তান্ত আপনারা গোপন রাখেন। কিন্তু ক্রিস্টিনের আসল পরিচয় জানা আমার খুবই দরকার।

দুঃখিত, মিসেস জেমস, শুরু করলেন তিনি। আমাদের নিয়ম আছে...

প্লীজ, গল্পটা আগে শুনুন। তারপর বুঝতে পারবেন কেন ক্রিস্টিনের জন্ম নিয়ে তথ্য চাইছি।

হ্যারির ঘটনা বললাম তাঁকে।

সব শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, খুব অদ্ভুত ঘটনা। খুবই অদ্ভুত। মিসেস জেমস, এই প্রথম আমি নিয়ম ভাঙছি। ক্রিস্টিনের জন্ম শহরতলীর এক হত দরিদ্র এলাকায়। ওদের সংসারে ছিল চার সদস্য, বাবা, মা, ভাই ও ক্রিস্টিন।

ভাই?

হ্যাঁ। তার যখন চোদ্দ বছর তখন ঘটনাটা ঘটে।

কী ঘটেছিল?

গোড়া থেকে বলি। বাবা-মা ক্রিস্টিনের জন্ম হোক তা চায়নি। তিনতলা একটা জরাজীর্ণ বিল্ডিংয়ের চিলেকোঠার ঘিঞ্জি ঘরে গাদাগাদি করে বাস করত গোটা পরিবার। ওখানে অতি স্বল্প আয়ের লোকজন বাড়ি ভাড়া করে থাকত। সেই ভবনের চিলেকোঠার ঘরে তিনজনেরই ঠিক মতো শোয়ার জায়গা হত না, আর একটা বাচ্চা যোগ হওয়ায় খুবই

মুশকিলে পড়তে হয়েছিল ক্রিস্টিরে বাবা-মাকে। মা-টা ছিল পাগলাটে টাইপের, মোটাসোটা, নোংরা আর অত্যন্ত অসুখী একজন মানুষ। মেয়ের প্রতি তার কোন আগ্রহই ছিল না। তবে ভাইটি প্রচণ্ড ভালবাসত তার বোনকে। স্কুল বাদ দিয়ে বোনের দেখাশোনা করত।

একটা গুদাম ঘরে স্বল্প বেতনে কাজ করত বাপ। ও দিয়ে সংসার চলত না। তারপর একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। অনেকদিন অসুস্থ ছিল বলে চাকরিটাও হারায়। ওই গুমোট ঘরে দিনের পর দিন স্ত্রীর গঞ্জনা আর ক্ষুধার্ত বাচ্চার কান্না সহ্য করতে হয়েছে তাকে অসুস্থ শরীরে। আমি এ সমস্ত তথ্য পেয়েছি প্রতিবেশিদের কাছ থেকে। শুনেছি ভয়ানক দুঃসময় যাচ্ছিল ওদের। এত দারিদ্র সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছিল বেকার বাপের জন্য।

তারপর একদিন খুব ভোরে, ওই বাড়ির নীচতলার এক মহিলা দেখতে পায় তার জানালার পাশ দিয়ে কী যেন একটা উপর থেকে পড়ল। পরক্ষণে দড়াম করে শব্দ, মহিলা বাইরে এসে দেখে চিলেকোঠার পরিবারের ছেলেটি পড়ে আছে মাটিতে। ক্রিস্টিনকে জড়িয়ে রেখেছে সে। ছেলেটির ঘাড় ভেঙে গেছে। মারা গেছে সে।

মহিলার ডাকাডাকিতে ওই বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা জেগে ওঠে। পুলিশ আর ডাক্তারকে খবর দিয়ে তারা চিলেকোঠায় যায়। ভেতর থেকে তালা বন্ধ দরজা ভেঙে ঢুকতেই তীব্র

গ্যাসের গন্ধ ধাক্কা মারে তাদের নাকে। যদিও জানালা খোলা ছিল। স্বামী আর স্ত্রীকে বিছানায় মৃত পড়ে থাকতে দেখে তারা। স্বামী একটা চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিল :

আমি আর পারলাম না। আমার পরিবারকে খুন করতে যাচ্ছি আমি। এ ছাড়া কোন রাস্তা নেই।

পুলিশ বলেছিল পুরুষ লোকটা পরিবারের সবাই যখন ঘুমাচ্ছিল ওই সময় দরজা-জানালা বন্ধ করে গ্যাস চালিয়ে দেয়। তারপর শুয়ে পড়ে স্ত্রীর পাশে এবং অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ছেলেটি যেভাবে হোক জেগে গিয়েছিল। দরজা খোলার চেষ্টাও বোধহয় করেছিল। দুর্বল শরীরে পারেনি। শেষে জানালা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ে আদরের বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

এক বছর বয়সী ক্রিস্টিন কেন গ্যাসে আক্রান্ত হয়নি এটা একটা রহস্য। হয়তো বেডক্লথ দিয়ে মাথা ঢাকা ছিল তার। ভাইয়ের বুকের সাথে মাথা চেপে ঘুমিয়েছে-ভাইয়ের সঙ্গেই ঘুমাত সে। যাহোক, বাচ্চাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে এই হোমে। এখানে আপনি আর জিম সাহেব ওকে প্রথম দেখলেন...নিঃসন্দেহে ওটা সৌভাগ্যের দিন ছিল ক্রিস্টিরে জন্য।

ওর ভাই তাহলে বোনকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেছে? বললাম আমি।

হ্যাঁ। খুব সাহস ছিল ছেলেটার।

কী নাম ছিল ভাইয়ের?

দেখছি, ফাইলের স্তূপ থেকে একটা ফাইল বের করলেন মিসেস ক্লিভার। চোখ বুলাতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, পরিবারটির নাম। জোনস পরিবার। আর চোদ্দ বছরের ছেলেটির নাম ছিল হ্যারি জোনস।

তার মাথায় কোঁকড়ানো লাল চুল ছিল? বিড়বিড় করলাম আমি।

তা বলতে পারব না, মিসেস জেমস।

কিন্তু ওটা হ্যারি। ছেলেটার ডাকনাম হ্যারি। কিন্তু এর অর্থ কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

অর্থ আমিও বুঝতে পারছি না। তবে আমার ধারণা ক্রিস্টিনের মনের গভীর অবচেতনে হ্যারির স্মৃতি রয়ে গেছে। তার শৈশবের সাথী। আমরা ভাবি শিশুদের স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর নয়, কিন্তু অতীতের অনেক কথাই তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে গেঁথে থাকে। ক্রিস্টিন এই হ্যারিকে আবিষ্কার করেনি, এর স্মৃতি তার মনে পড়ে যাচ্ছে। তাই তাকে সে একটা

জ্যান্ত রূপ। দিয়েছে। আমার কথা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই এমন অদ্ভুত যে অন্য কোন ব্যাখ্যা মাথায় আসছে না।

ওরা যে বাড়িতে থাকত সেটার ঠিকানা পেতে পারি?

মিসেস ক্লিভার ঠিকানা দিতে রাজি নন। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে শেষে দিতেই হলো। আমি ১৩, কানভাররোর ঠিকানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বাড়িটি খুঁজে পেলাম। শহরের শেষ মাথার বাড়িটি জনমানবশূন্য মনে হলো। নোংরা এবং ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তবে একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলাম। ছোট একটা বাগান আছে বাড়ির সামনে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবুজ ঘাস। তবে ছোট্ট বাগানের এক জায়গার অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য গ্রাস করতে পারেনি বিষণ্ণ রাস্তার পাশের বাড়িগুলো-সাদা গোলাপের একটা ঝাড়। ঝলমল করছে গোলাপগুলো। চমৎকার সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

ঝোঁপের পাশে দাঁড়িয়ে চিলেকোঠার জানালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি।

একটা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলাম, এইহানে কী চান?

নিচতলার জানালা দিয়ে উঁকি মেরেছে এক বুড়ি। মাথায় শনের মত সাদা চুল। পরনে ময়লা, ছেঁড়া কাপড়।

ভেবেছিলাম বাড়িটি খালি, বললাম আমি।

খালি থাকবারই কতা ছিল। এইহানে আমি ছাড়া কেউ থাহেও না। আমারে ওরা বাইর করবার পারে নাই। আমার কোতাও যাইবার জায়গা নাই। ঘটনা ঘটবার পর অন্য মাইনষেরা ভয় পাইয়া বাড়ি ছাইড়া পালায়। তারপর আর কেউ এই বাড়ি ভাড়া লইবার আয় নাই। এইটা বলে হানাবাড়ি।

একটু বিরতি দিল সে। তারপর লাল টকটকে চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। আমি ওরে আমার জানলার পাশ দিয়া ছিটকা পইড়া যাইতে দেখছি। ঐ যে গোলাপ ঝাড়টা দেখছেন, ঐহানে পইড়াছিল সে ঘাড় মটকাইয়া। তয় ও এহনও ফিরা আসে। আমি অরে দেখতে পাই। বইনরে না পাওয়া পর্যন্ত সে কোথাও যাইব না।

শিউরে উঠি আমি। কে-কার কথা বলছেন আপনি?

বুড়ি বলল, হ্যারি। মাথা ভর্তি কোঁকড়াইন্যা লাল চুল। শুটকা। খুব জিদ্দি। তয় পোলাড়া খুব ভাল আছিল। বইনডারে জান দিয়া ভালবাসত। ঐ গাছের ধারে ছোড বইনরে নিয়া খেলত। মরছেও ঐহানেই। কিন্তু সত্যই কি মরছে?

ফ্যাকাসে, কোঁচকানো আঙুলের ফাঁক দিয়ে উন্মাদিনীর দৃষ্টিতে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, শিরশির করে উঠল গা। পাগল মানুষ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়। কেউ এদের করুণা করে, কেউ ভয় পায়। আমি বিড়বিড় করে বললাম, আ-আমি যাই।

উত্তপ্ত ফুটপাত দিয়ে দ্রুত পা চালালাম। কিন্তু পা জোড়া ভয়ানক ভারি আর অসাড় মনে হলো, যেন দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে হাঁটছি। সূর্য প্রচন্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাথার উপরে। কিন্তু টের পাচ্ছি না যেন। সময় এবং স্থান জ্ঞান হারিয়ে ছুটছি আমি।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতে রক্ত হিম হয়ে এল আমার। ঘড়িতে দেখলাম তিনটা বাজে। তিনটার সময় আমার স্কুল গেটে থাকার কথা, ক্রিস্টিনের জন্য। আমি এখন কোথায়? এখান থেকে স্কুল কত দূরে? রাস্তায় কোন বাস বা ট্যাক্সিও নেই। বাস কোথায় পাব? পথচারীদের পাগলের মত এসব প্রশ্ন করতে লাগলাম। তারা আমার দিকে ভীত চোখে দেখছে, যেন ওই বুড়ির মত চেহারা আমার। ওরা নিশ্চয় আমাকে পাগল ঠাউরেছে। অবশেষে সঠিক বাসটি পেয়ে গেলাম।

ধুলো আর গরমে অস্থির আমি বুকে দারুণ ভয় নিয়ে অবশেষে স্কুলে। পৌঁছালাম। এক দৌড়ে পার হলাম খেলার মাঠ। ক্লাসরুমে সাদা স্কার্ট পরা সেই তরুণী শিক্ষিকা বইপত্র গোছাচ্ছে।

ক্রিস্টিন জেমসকে নিতে এসেছি। আমি ওর মা। দুঃখিত, দেরি হয়ে গেছে। কোথায়?

ক্রিস্টিন জেমস? –কোঁচকাল তরুণী, তারপর কলকল করে বলল, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লাল চুলের ছোট্ট, সুন্দর মেয়েটি। ওর ভাই এসেছিল ওকে নিতে, মিসেস জেমস। দুজনের চেহারায় অদ্ভুত মিল দেখলাম। তবে বোনকে সে যে খুব ভালবাসে তা তার আচরণ দেখেই বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা আপনার স্বামীরও কি তার বাচ্চাদের মতো লাল চুল?

ওর ভাই- কী বলল? অস্পষ্ট গলায় জানতে চাইলাম।

কিছুই বলেনি। প্রশ্ন করলেও শুধু হেসেছে। এতক্ষণে ওরা বোধহয় বাড়ি পৌঁছে গেছে। আপনি ঠিক আছেন তো?

হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আমি গেলাম।

পা পুড়ে যাওয়া উত্তপ্ত রাস্তার পুরোটাই দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম আমি।

ক্রিস্টিন! কোথায় তুমি? ক্রিস! ক্রিস্টিন! মাঝে মাঝে এখনও শুনতে পাই আমার সেই আর্তনাদ ঠাণ্ডা বাড়িটির দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে। ক্রিস্টিন! ক্রিস্টিন! কোথায় তুমি? জবাব দাও! ক্রিস্টিন! তারপর, হ্যারি! ওকে নিয়ে যেয়ো না! ফিরে এসো! হ্যারি! হ্যারি!

উন্মত্তের মতো বাগানে ছুটলাম আমি। প্রখর রোদ ধারাল ফলার মতো আঘাত হানল। ধবধবে সাদা গোলাপগুলো ভীষণভাবে জ্বলজ্বল করছে। স্থির বাতাস। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমি বুঝি ক্রিস্টিনের খুব কাছে চলে এসেছি। যদিও ওকে দেখতে পেলাম না। তারপর আমার চোখের সামনে নাচতে শুরু করল গোলাপগুলো, রঙ বদলে হয়ে উঠল লাল। রক্ত লাল। বৃষ্টিস্নাত লাল। মনে হলো আমি লালের মাঝ দিয়ে কালোর মাঝে ঢুকে পড়েছি, তারপর শুধুই শূন্যতা–প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি।

.

মারাত্মক হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমি। বেশ কয়েক দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলো আমাকে। ওই সময় জিম আর পুলিশ মিলে বেহুদাই খুঁজেছে ক্রিস্টিনকে। ব্যর্থ এ প্রচেষ্টা চলল মাস কয়েক ধরে। মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনা নিয়ে স্থানীয় খবরের কাগজে নানান গল্প ছাপা হলো। তারপর এক সময় থিতু হয়ে এল উত্তেজনা। পুলিশ ফাইলে আরেকটি অমীমাংসিত রহস্য জমা হলো।

শুধু দুজন মানুষের জানা থাকল আসল ঘটনা। পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে বাস করা এক পাগলি বুড়ি আর আমি। বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু আজও ভয়টা গেঁথে আছে আমার মনে।

ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আমাকে ভীত করে তোলে। রোদ। ঘাসের ওপর গাঢ় ছায়া। সাদা গোলাপ। কোঁকড়ানো লাল চুলের শিশু। আর একটা নাম হ্যারি। কত সাধারণ একটা নাম!

–রোজমেরি টিম্পারলি